আমার

Acknowledgments for the Japanese illustrations are gratefully made to Kyoto National Museum, Benri-do (Kyoto), Mr. Fumikazu Yamanaka (Osaka), Mainichi Newspapers (Tokyo), Asahi Shimbun (Tokyo), Hakone Art Museum (Hakone) and the Consulate-General for Japan (Calcutta)

জাপানে

অন্নদাশঙ্কর রায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রী সুপ্রিয় সরকার
এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৬৫

ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রচ্ছদ ও চিত্রণশিল্পী : শ্রী ধ্রুবজ্যোতিঃ সেন

মুদ্রক : শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

এ কাহিনী কেবল জাপানের নয়, কেবল ১৯৫৭ সালের শরৎকালের নয়, কেবল আমার নয়, একসঙ্গে এই তিন দেশকালপাত্রের। সেইজন্যে এর নাম "জাপান" নয়, এর নাম "জাপানে"। এ শুধু ভ্রমণকাহিনী নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী।

ঘটনা যখন ঘটে তখন ঠিক বুঝতে পারা যায় না কেন ঘটছে বা কেন ঘটল। বুঝতে সময় লাগে। অপ্রত্যাশিতরূপে জাপানে নীত হয়ে প্রতিদিন আমি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, কে আমাকে এখানে এনেছে, কেন এনেছে। জাপান থেকে ফিরে সাগরময়ের নির্বন্ধে "জাপানে" লিখতে বসে দিনের পর দিন মাসের পর মাস অবাক হয়ে চিন্তা করেছি, কে আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে। বছর ঘুরে গেছে। এতদিন পরে একটু একটু করে ঠাওর হচ্ছে জীবনবিধাতার উদ্দেশ্য। "রত্ন ও শ্রীমতী" লিখতে লিখতে কলম কেবলি থেমে যাচ্ছিল। মন বলছিল সত্যই যথেষ্ট নয়, সৌন্দর্যও চাই। কেবল বহিঃসৌন্দর্য নয়। অন্তঃসৌন্দর্য। সৌন্দর্যের দীক্ষা যে পূর্বে কোনো দিন হয়নি তা নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ সৌন্দর্য অভিষেক জাপানে গিয়েই হলো।

পূর্বস্থরী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করি।

অনেকের কাছে আমি ঋণী। যাঁর কাছে সব চেয়ে বেশী তিনি অধ্যাপক শিনিয়া কাম্নগাই। পদে পদে তাঁর সাহায্য চেয়েছি ও পেয়েছি। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ছবিগুলির জন্যে ঋণস্বীকার অন্যত্র করেছি। পাদ-পূরণের পুতুলগুলির নাম বড় হরফে ও ধাম ছোট হরফে ছাপা হয়েছে। প্রচ্ছদপটের মুখোশচিত্রণ কাবুকি নাট্যের।

২০শে জানুয়ারি ১৯৫৯ অন্নদাশঙ্কর রায়

অবলোকিতেশ্বর

হোরিয়ুজি মন্দিরের মুরাল চিত্র

(সপ্তম শতাব্দী)

। এক ।

কিয়োতোর উপকণ্ঠে উদ্যানবেষ্টিত তেনরিয়ুজি মন্দির। সার বেঁধে আসন পেতে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসেছি আমরা নানান দেশের শ' দুই লেখকলেখিকা। ভোজ নয় তো ভোজবাজি। সৌন্দর্যের ভোজ। সবাই আমরা অভিভূত।

আমার দক্ষিণ পার্শ্ববর্তিনী পাকিস্তানী লেখিকা তাঁর দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী ফরাসী লেখকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। লেখক তথা বৈজ্ঞানিক। মধ্যবয়সী। গম্ভীর। জানতে চাইলুম জাপান কেমন লাগছে। সাধারণ শিষ্টাচারী প্রশ্ন। প্রত্যাশা করিনি অসাধারণ কোনো উত্তর। কিন্তু উত্তর যা পেলুম তা চমকে দেবার মতো।

ভদ্রলোক মুখ বাড়িয়ে আমার চোখে চোখ রাখলেন। আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়েছিল। বন্দী স্বরকে মুক্ত করে উচ্ছ্বসিত ইংরেজীতে বললেন, **"I don't know why I have been wasting my life in Paris. It is so stupid."**

তার পর শেষের শব্দটির উপর ঝোঁক দিয়ে আবার বললেন, "সো স্টুপিড।"

শুনুন কথা! এ কালের কামরূপ যে প্যারিস, যেখানে যাবার জন্যে দুনিয়ার লোক সতৃষ্ণ, সেই প্যারিসের ভাগ্যবানকেও জাদু করেছে জাপান। আমি তো তাঁর মতো কপাল নিয়ে জন্মাইনি। কী আর কহিব আমি!

আমারও চোখে মায়াকাজল লেগেছে। তা বলে আমি আবেগভরে বলব না যে জাপানে না থেকে আমার জীবন অপচয় করছি। এই আট ন' দিনে আরো অনেকের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি যে প্রতীচ্যতমের উপর প্রাচ্যতমের আকর্ষণ তীব্রতম। এক কালে তো পশ্চিমের লোকের ধারণা ছিল নীতির দিক দিয়ে নিপ্পন নাকি ইউরোপের য়্যান্টিপোডিস। ভলতেয়ার সে ধারণা খণ্ডন করলেও এখনো সেটা নির্মূল হয়নি।

তা ছাড়া যার চোখ আছে তার চোখে পড়বেই জাপান হচ্ছে সৌন্দর্যের দেশ। সৌন্দর্যের সাক্ষ্য অশনে বসনে আসনে বাসনে গৃহসজ্জায় গৃহনির্মাণে পথে ঘাটে দোকানে পসারে উদ্যানে উপবনে পাহাড়ে হ্রদে নিসর্গে। জাপানীদের সৌন্দর্যসাধনা কেবল চারুকলায় ও কারুকলায় নিবদ্ধ নয়। সেইজন্যে কলাবতীর দেশ না বলে সৌন্দর্যের দেশ বললুম।

তবে এ কথাও ঠিক যে প্রতীচ্যের অঞ্জনরঞ্জিত নেত্রে প্রাচ্যের এই সুচিরলুক্কায়িত দীপপুঞ্জ কলাবতীর দেশই বটে। গেইশা শব্দের আক্ষরিক অর্থ কলাবতী। কলাবিস্তারী। সে কালের রেশ এ কালেও পুরো মিলিয়ে যায়নি।

এই কলাবতীর দেশে ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছি আমরা তিন দেশের সাহিত্যকলাবন্ত আর প্রথমে ঠেকেছি তোকিয়োর বিমানঘাটে। তার সাত আট দিন পরে কিয়োতো স্টেশনে। গোড়ায় আমাদের সংখ্যা ছিল এক শ' ছেষট্টি জন পরদেশী, তার সঙ্গে এক শ' তিরাশি জন জাপানী। সবশুদ্ধ প্রায় সাড়ে তিন শ' প্রতিনিধি নিয়ে আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. কংগ্রেস। আহ্বায়ক জাপানের পি. ই. এন. ক্লাব। এর আগে ইউরোপে ও আমেরিকায় বাৎসরিক অধিবেশন হয়েছে যুদ্ধের সময়টা বাদ দিয়ে আটাশ বার। এটা হলো ঊনত্রিংশ অধিবেশন। এশিয়ায় প্রথম।

পরদেশীদের মধ্যে সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী ফরাসীরা। ছেচল্লিশ জন। তার পর মার্কিনরা। আঠারো জন। তার পর ইংরেজরা। তেরো জন। তার পর আমরা ভারতীয়রা। ন' জন। কোরীয়রাও ন' জন। অন্যান্যদের সংখ্যা আরো কম। পাকিস্তান থেকে তিন জনের আসার কথা ছিল। এসেছেন দু' জন। তাঁদের একজন বাঙালী মুসলমান। বাঙালী হিসাবে আমার দোসর। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত যোগ দিয়ে তাঁদের দুইকে তিন করলেন। অতএব বলা যেতে পারে ভারতপাকিস্তান উপমহাদেশ থেকে আমরা বারো জন।

ফরাসীরা কেবল যে দলে ভারী তাই নয়, আমাদের সভাপতি স্বয়ং ফরাসী আকাদেমির সদস্য আঁদ্রে শাঁসঁ (André Chamson)। ইনি মিস্ত্রালের প্রদেশ প্রোভাঁসের সন্তান। কবিতা লেখেন স্বভাষায়। উপন্যাস লেখেন ফরাসীতে। দৈবাৎ বেলজিয়ামের একখানি কবিতাপত্রিকায় এঁর ফোটো দেখেছিলুম জাপান যাত্রার মুখে। তাই চিনতে পারলুম মানুষটিকে যেই দেখলুম ইম্পিরিয়াল হোটেলের লবিতে। বললেন, "এইমাত্র এসে পৌঁছেছি। এখনো মাথা ঘুরছে। সব কিছু ঘুরছে।"

ওঁরা ফরাসীরা আকাশ থেকে নামলেন আমাদের পরের দিন তোকিয়োর হানেদা বিমানবন্দরে। আস্ত একখানা বিমান চার্টার করে এলেন ওঁরা।

সঙ্গে করে নিয়ে এলেন অন্য কোনো কোনো দেশের ও তিনিধিদের। ফরাসীদের এক রাত আগে এসে আমরা ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছিলুম। আমার তো আশঙ্কা ছিল সী সিকনেসের মতো এয়ার সিকনেস হবে। হলো না। শুনেছিলুম কানে তালা লাগবে। লাগল না। পথে টাইফুন আসবে। এলো না। এয়ার পকেটে পড়ে বিমান হাজার হাজার ফুট নামবে আর উঠবে। নামল আর উঠল এক বার কি দু' বার।—কলকাতা থেকে তোকিয়ো চার হাজার মাইল আকাশ পথ সাড়ে সতেরো ঘণ্টায় পার হলুম। যেন ভেসে গেলুম নিস্তরঙ্গ স্রোতে। সাধারণত বিশ হাজার ফুট উঁচুতে। এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের স্থপারকনস্টেলেশন। ভারতের পয়লা নম্বর পাইলট। নাম শুনেই ভয় ভেঙে যায়। গিলডার একটি মনে রাখবার মতো নাম। পার্শী। শুনেছি মন্ত্রীপুত্র। মন্ত্রীপুত্র না হলে রাজ-পুত্রদের কলাবতীর দেশে ভেলায় করে নিয়ে যাবে কে!

শরমের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে এরোপ্লেনে উড়তে আমার ভয় করত। না করবেই বা কেন? কথায় কথায় দুর্ঘটনা। আমি যেদিন দমদম থেকে উড়ি সেই দিনই সিউড়ির কাছে কোথায় দুর্ঘটনা ঘটে আর আমি সে খবর শুনেই বিমানে উঠি। তার দু'দিন কি তিন দিন পরে দমদম বিমানঘাটেই ঠায় বসে দু' দু'জন আরোহী প্রাণ হারান। আন্তর্জাতিক পেন কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান ও কলাবতীর দেশে ভেলায় চড়ে ভেসে যাবার ভেসে আসবার আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য তাই আমাকে উল্লসিত বা উন্মত্ত করেনি। তা ছাড়া আমার নিয়ম নয় হাতের কাজ ফেলে রেখে কোনো কিছু গ্রহণ করা। তা সে যত বড় সম্মান বা স্থযোগ হোক না কেন। "রত্ন ও শ্রীমতী" মাঝখানে অসমাপ্ত রেখে স্বর্গে যেতেও আমার ঈপ্সা ছিল না। তাই জাপানের মতো ভূস্বর্গে যাবার নিখরচায় নিমন্ত্রণ নিতেও কুণ্ঠিত হয়েছি।

তবু যেতে হলো সোফিয়া ওয়াডিয়ার টানে ও লীলা রায়ের ঠেলায়। লীলা রায়ের মতে এরোপ্লেনে না উঠলে আমার এরোপ্লেনে ওড়ার ভয় ভাঙবে না। তাঁর সে ভয় ছেলেবেলা থেকে নেই। আমার কেন থাকবে? ভেবে দেখলুম স্ত্রীর চোখে কাপুরুষ কিংবা না-পুরুষ হওয়া ভালো নয়। তার চেয়ে আসমানে ওড়া শ্রেয়। আর সোফিয়া ওয়াডিয়ার মতে আমাকে বাদ দিয়ে প্রতিনিধিমণ্ডলী পূর্ণ করা যায় না। এটা হয়তো তাঁর অন্ধবিশ্বাস। বিশ

বছরের উপর একসঙ্গে পেন ক্লাবের কাজ করে আসছি। সুতরাং মায়া মমতাও হতে পারে। মনকে বোঝালুম সোফিয়া ওয়াডিয়া ও কমলা ডোঙ্গরকেরী অত দূর দেশে যাচ্ছেন। তাঁদের একজন এস্‌কর্ট চাই। নিয়তিও বোধ হয় এই চায়। পরে বোঝা গেল নিয়তি কী চেয়েছিল। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

আসল কথা "রত্ন ও শ্রীমতী"র তৃতীয় ভাগ নিয়ে এমন সমস্যায় পড়েছিলুম যার সমাধান তিন মাস ভেবেচিন্তেও পাইনি। এক এক সময় মনে হচ্ছিল দিই ঘোষণা করে যে দ্বিতীয় ভাগেই সমাপ্তি। এ রকম একটা সন্ধিক্ষণে জাপানযাত্রার নিমন্ত্রণ হয়তো বিধাতার ইঙ্গিত। জীবনের আরো কয়েকটা মাস ও ভাবে মাটি না করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করা সঙ্গত। লেখার পক্ষে দেখাও তো দরকারী। ত্রিশ বছর আগে সেই যে ইউরোপে যাই তার পর ভারতের বাইরে আর কোথাও পা দিইনি। সিংহল বাদ। অথচ বাল্যকাল থেকে বরাবর আমার বিশ্বাস দেশে দেশে আমার ঘর আছে, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয় আছে। একবার বেরোতে পারলেই হয়। জাতি বা বর্ণ, ভাষা বা ধর্ম, কিছুই আমার কাছে বাধা নয়। আমি যে কেবল ভারতের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছি তাই নয়, ধরিত্রীর কোলে জন্মেছি। জন্মস্বত্বে গোটা পৃথিবীটাই আমার আপনার। তাকে বুঝে নেব কী করে, যদি দেশান্তরে না যাই?

যখন মনঃস্থির করলুম যে যাব তখন কংগ্রেসে কী বলব তা ভাবতে ও লিখতে সময় দিলুম। পনেরো মিনিটের বক্তৃতা। তার জন্যে পনেরো দিনের খাটুনি। নইলে ভারতের আজকের দিনের মনের ছবি ঠিক ঠিক আঁকা যেত না। পেন কংগ্রেসের জন্যেই আমার জাপানযাত্রা। যার জন্যে যাওয়া তার জন্যে প্রস্তুতি আগে। তার পরে জাপানের জন্যে প্রস্তুতি। ফলে জাপানী ভাষা একেবারেই শেখা হলো না। সেটা সাংঘাতিক ত্রুটি। ইংরেজী দিয়ে কাজ চলে যায় বটে, কিন্তু ভাব করা যায় না সকলের সঙ্গে। বিশেষত সাধারণ মানুষের সঙ্গে। এমন কি অসাধারণদের সঙ্গেও।

হাতে যে ক'টা দিন ছিল জাপান সম্বন্ধে পড়ে কাটিয়েছি। রাতের পর রাত জেগেছি। বেশীর ভাগ বই জোগাড় করে দিলেন শান্তিনিকেতনের জাপানী অধ্যাপক শিনিয়া কাসুগাই। আমার চেয়ে তাঁরই উৎসাহ বেশী। পেন কংগ্রেসের দশদিন পরে আমার দশহরা হবে এটা তিনি শুনতে নারাজ।

আমাকে থাকতেই হবে আরো দশ দিন বা পুরো এক মাস। বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাবে না সে কথা শুনলেও তিনি মানবেন না। জাপানীরা আমার ভার নেবেন, আমাকে বক্তৃতার বিনিময়ে সম্মানী দেবেন। দেখলুম ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। এক মাসের ভিসা চাইলুম। কনসাল জেনারল তাকানো মহাশয় দিলেন ছ' মাসের ভিসা। ওঁদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো ওঁরা আমাকে সহজে ফিরতে দেবেন না। দ্বিতীয় মাসের জন্যে একটা নিমন্ত্রণও এসে পৌঁছল। কী করে বলি যে অক্টোবরস্য ষষ্ঠ দিবসে কোনো বছরই আমি মেঘদূতের যক্ষ হতে রাজী হইনি! তার আগেই আমাকে রামগিরি থেকে অলকায় ফিরতে হবে। শান্তিনিকেতনের শিনিয়া কাসুগাই ও শোগো কোয়ানো মহাশয়রা আমার জন্যে প্রোগ্রাম তৈরি করতে বসলেন। কলকাতার দুই জাপানী প্রধান আমার খাতিরে চা পার্টি দিলেন।

বিদেশযাত্রাকে যথাসম্ভব অপ্রীতিকর করা এখনকার সরকারী রীতি। সে সব কথা সকলেই জানেন। কে না ভুক্তভোগী! যদি বাইরে গিয়ে থাকেন বা যেতে চেয়ে থাকেন। ভাগ্যক্রমে আমার পাশপোর্ট আগে থেকে করা ছিল। সেইজন্যে আমার ঝঞ্ঝাট অল্পের উপর দিয়ে গেল। তা হলেও শেষ দিনটি পর্যন্ত জানতুম না হাতে কত টাকা নিয়ে যাব। তার আগের দিন পর্যন্ত জানতুম না আমার টিকিট হয়েছে কি না। বিমানে স্থান পাব কি না। একটার পর একটা ভাবনা ঘুচল। না ঘুচলে খুব আফসোস করতুম না। বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম যে যাওয়া হলো না। আমাকে সারা দিন এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে যাত্রার দিন আমি ভাববার অবকাশ পাইনি সত্যি যাওয়া হচ্ছে কি না। দমদমের পথে রওনা হয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটে পাওয়া গেল নতুন স্যুট। না গরম না ঠাণ্ডা। ও স্যুট না পরলে আমি জাপানে কষ্ট পেতুম।

অগাস্টের শেষে কেউ জাপান যায় কখনো? যেতে হয় মে মাসে চেরিফুলের মরসুমে। অথবা অক্টোবর মাসে চন্দ্রমল্লিকার মরসুমে। মাঝ-খানের চার মাস চতুর্মাস্যা। আমাদের দেশেরই মতো বৃষ্টি বাদল। তার উপর টাইফুন। তা ছাড়া হপ্তায় হপ্তায় ভূমিকম্প তো আছেই। সেটা অবশ্য যে কোনো মাসে হতে পারে। "ও কিছু নয়। একটু নড়ে চড়ে বসবেন।" আশ্বাস দিয়েছিলেন জাপানী বন্ধুরা। তবে টাইফুনের বেলা যা বলেছিলেন তাতে আশ্বাসের চেয়ে বিশ্বাস বেশী। একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই

ত্রাণ পাওয়া যায়। নইলে আমাদের বিমানের সাধ্য কী যে চীন সাগরের টাইফুনের সঙ্গে কুস্তি লড়ে! নিরাপদে তোকিয়ো পৌছনোর পর ইম্পিরিয়াল হোটেলের ভূমিকম্পরোধী দাবানে বসে নিশ্চিন্ত আরামে খবরের কাগজ খুলে দেখি টাইফুন রওনা হয়েছে। ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে গত বারের টাইফুনের নামকরণ হয়েছিল A দিয়ে। এবারকার টাইফুনের নামকরণ B দিয়ে। মেয়েলি নাম হওয়া চাই। তাই কাগজে লিখেছে "Bess" আসছে। দিনের পর দিন ঐ আসছে। ঐ আসছে। তোকিয়োতে সাত দিন থেকে কিয়োতো যাই। সেই দিন ভাবগতিক দেখে মনে হলো, ওমা, এলো বুঝি! পরের দিন কাগজে দেখি এসে চলে গেল নামমাত্র বুড়ি ছুঁয়ে। কোথায় যেন ঘরবাড়ী উড়ে গেছে, মানুষ মারা গেছে। ভাগ্যিস আমাদের বিমান তার পথে পড়েনি।

বিমানের নাম "রানী অফ ইন্ড্।" বম্বে থেকে এলেন সোফিয়া ওয়াডিয়া, কমলা ডোঙ্গরকেরী, ইংরেজী। তাঁদের সঙ্গে উমাশঙ্কর জোশী, গুজরাতী। বিনায়ক কৃষ্ণ গোকক (Gokak), কন্নাড। এম আর জম্বুনাথন, তামিল। কলকাতায় যোগ দিলুম আমি। আমার সঙ্গে কে আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ইংরেজী। ইউনেস্কো থেকে নিমন্ত্রিত। হংকং-এ উঠলেন সচ্চিদানন্দ বাৎস্যায়ন, হিন্দী। তোকিয়োতে অপেক্ষা করছিলেন প্রভাকর পাধ্যে, মরাঠী। এমনি করে আমরা হলুম ন'জন। আগে থেকে স্থির হয়েছিল দু'জনকে দেওয়া হবে সম্মানিত অতিথির মর্যাদা, দু'জনকে দেওয়া হবে অফিসিয়াল প্রতিনিধির মর্যাদা এবং অন্যান্য দেশের সম্মানিত অতিথি ও অফিসিয়াল প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্র রাখা হবে ইম্পিরিয়াল হোটেলে। অবশিষ্টরা থাকবেন অবশিষ্টদের সঙ্গে দাই'ইচি হোটেলে ও শিবা পার্ক হোটেলে। সুতরাং তোকিয়োতে গিয়ে আমরা ছত্রভঙ্গ হলুম। একসঙ্গে রাত কাটানো শুধু আকাশপথে। পাশাপাশি আয়েঙ্গার ও আমি। সামনের সারিতে গোকক ও জম্বুনাথন। কয়েক সারি সামনে সোফিয়া ওয়াডিয়া ও কমলা ডোঙ্গরকেরী। যাতায়াতের পথ ছেড়ে দিয়ে সেই সারিতেই উমাশঙ্কর। সবাই আমরা টুরিস্ট। প্লেনে আরো অনেকে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মার্কিন মহিলা ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড। জাপান থেকে ইনি শান্তিনিকেতন হয়ে সিংহলে গেছলেন। কলকাতা হয়ে জাপানে ফিরছেন। এই আমাদের দ্বিতীয় দর্শন।

বিমানে উঠে আমি নিজের জায়গা ছেড়ে অন্যের খবরদারি করছি দেখে তিনি ছুটে এলেন। আমাকে ধরে এনে বসিয়ে দিলেন আমার আসনে। চামড়ার পটি দিয়ে বাঁধলেন। প্লেন যখন ভুঁই ছেড়ে আসমানে হাউইয়ের মতো ওঠে তার আগে কিছুক্ষণ উটপাখার মতো দৌড়য়। সেই অবসরে আপনার আসনের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে না বাঁধলে কে যে কার গায়ে ছিটকে পড়বে তার ঠিক নেই। ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড আমাকে শাসন না করলে সেদিন হয়তো আমি আচমকা বলের মতো লাফিয়ে হাত পা ভাঙতুম, শুধু নিজের নয় পরেরও। কিন্তু কেমন করে যে আমার ভয়ডর চলে গেল, প্লেন ষোল সতেরো হাজার ফুট উচ্চে স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখা গেল ফরফর করে বেড়াতে। ভিতর থেকে বোঝবার উপায় নেই কত উর্ধ্বে আমরা। প্রেসারাইজড প্লেন। মনে হচ্ছে যেন দমদমেই বসে আছি। কাঁপছে না, দুলছে না, টলছে না, চলছে কি চলছে না। উড়ছে যে সে বোধটাই নেই। অথচ তার গতিবেগ ঘণ্টায় আড়াই শ' মাইলের মতো। চার চারটে ইঞ্জিন মিলে তাকে ঝড়ের মতো ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। ঝড়ের মতো গর্জন আসছে কানে। তাই তুলো গুঁজতে হচ্ছে। তা হলে আর গল্প করে সুখ নেই। রাত দশটার সময় কেই বা চাইবে গল্প করতে!

আর কাউকেই তেমন উৎসাহী পেলুম না যে আসমানে আড্ডা দিয়ে নিশিপালন করবে। ওটা কোজাগরী পূর্ণিমাও নয়, শিবরাত্রিও নয়। তা ছাড়া অমন করে টহল দিয়ে ফেরাটা সৎ দৃষ্টান্ত নয়। সবাই যদি অনুসরণ করে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। ওটা জাহাজের ডেক নয়। ক্যাবিন। শান্ত হয়ে বসে বাইরে চেয়ে দেখলুম দমদমের লাল আলো নীল আলো কখন মিলিয়ে গেছে। মিটি মিটি শাদা আলো কলকাতা সূচনা করছে। আকাশেও মিটি মিটি তারা। বিরাট এক বিহঙ্গ পক্ষবিস্তার করে উড়ে চলেছে আকাশে। বহু দূরে বহু পেছনে বহু নিম্নে পড়ে আছে কলকাতা। কয়েক মিনিট পরে সেও হারিয়ে গেল আঁধারে। একটু একটু করে মনে পড়তে থাকল যাঁরা আমাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁদের এক এক জনকে। স্ত্রীকে আর ছোট ছেলেকে আর ছোট মেয়েকে ওরা ঢুকতে দিয়েছিল ভিতরে। কিন্তু বিমানের থেকে থাকতে বলেছিল তফাতে। তাদের দিকে শেষ চাউনি ফেলে হন হন করে যখন এগিয়ে গেলুম তখন ব্যথাবোধ আমার ছিল না। একটু

একটু করে জাগল। দিনের পর দিন কেটে গেছে প্রস্তুতিতে। মাশুলঘর থেকে ছাড়া না পাওয়া তক ঝামেলার অন্ত হয়নি। একটার পর একটা বাধা এসেছে, আর মিটে গেছে অল্প আয়াসে। কিন্তু কল্পনা করেছি সব চেয়ে মন্দটা। কত খারাপ হতে পারে সেইটেই ভেবেছি। বৃথা ভেবেছি। অকৃপণ আনুকূল্য পেয়েছি অজানা অচেনার। মাশুলঘরেও আমার বন্ধুর অভাব হয়নি। আর যাঁরা কষ্ট করে দমদম অবধি এসেছিলেন তাঁদের প্রীতি আমার পাথেয়। দুর্গাদাসবাবু, গোপালদাসবাবু, কানাই, সাগর, সুরজিৎ এবং আরো কয়েকজন বান্ধব। তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

যে যার আসনটাকে পিছনে ঠেলে নামিয়ে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে শুলেন ও কম্বল মুড়ি দিয়ে বালিশে মাথা চাপলেন। এয়ারকণ্ডিশন্ড ক্যাবিন, তবু শীতের আমেজ ছিল। ইতিমধ্যে গরম জলে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে গেছে, তা দিয়ে হাত মুখ মুছে সাফসুতরো হয়ে নেওয়া গেছে। জিব শুকিয়ে যাবে বলে চিবোতে দিয়েছে লবঙ্গ এলাচ দালচিনি লজেঞ্চ চিউয়িং গাম যার যা রুচি। কফি বা শীতল পানীয় দিয়েছে গলা ভিজিয়ে নিতে। আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘরটা অন্ধকার করে নিদ্রার আয়োজন করা গেল। মনে হলো সকলেরই ঘুম এলো। এলো না শুধু আমার। নতুন জায়গায়, লোকজনের মেলায়, চলন্ত যানে, অবিরাম আওয়াজে এমনিতেই আমার ঘুম আসে না। রাত্রে স্নান না করলে কিছুতেই আসে না। প্লেনে তার উপায় ছিল না। অন্তত টুরিস্ট শ্রেণীতে। তা ছাড়া অর্ধশয়ান হয়ে নিদ্রিত হওয়া আমার তো অসাধ্য। পরের দিন শুনলুম ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড মেজের উপর চাদর পেতে শুয়েছিলেন। প্রথম সারির সামনে ততখানি জায়গা ছিল।

রাত তিনটের সময় ব্যাঙ্কক। প্লেন থেকে নামিয়ে দিল যারা নামতে চায় তাদেরকে। যারা নামতে চায় না তাদেরকেও। আমার তো সবে ঘুম লেগে আসছিল। লাগতে না লাগতে ভাঙল। বিমানবন্দরে তখন তেজালো আলোর রোশনাই। রাতকে দিন করেছে। পাশপোর্ট জমা দিয়ে রেস্টোরাণ্টে বসে চা খেয়ে পাশপোর্ট তুলে নিয়ে বেশ কিছু হাঁটাহাঁটি করে আবার ওঠা গেল বিমানে। হলো একরকম পরিবর্তন। বোধ হয় এর দরকার ছিল। আবার উটপাখীর দৌড়। ঈগলপাখীর উড়ন। আমাদের বন্ধন ও বন্ধন-মোচন। বলতে ভুলে গেছি যে প্লেন যখন ব্যাঙ্ককে নামল ও থামল তখন

আরেক দফা বাঁধন পরা ও বাঁধন খোলা হয়েছিল। ক্রমে এটা গা সওয়া হয়ে এলো। চেপে বসে থাকলেই যথেষ্ট হতো। চামড়ার পটি পড়ে থাকত। যাক, ব্যাঙ্কক ছেড়ে যে যার জায়গায় আবার ঘুম জুড়ে দিলেন। আমার ভাঙা ঘুম আর জোড়া লাগল না। মাঝখান থেকে আমার ঠাণ্ডা লেগে সর্দি। ব্যাঙ্ককের হাওয়ায় কি না কে জানে। পরের দিন সর্দির চিকিৎসা করলেন ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড। আমার গৃহিণী নাকি তাঁকে বলেছিলেন আমাকে দেখতে শুনতে।

ভোর হলো। কখন এক সময় হোঁস হলো সমুদ্রের উপর দিয়ে চলেছি। অতিক্রম করেছি ইন্দোচীন। এবার আসছে হংকং। চেয়ে দেখলুম সমুদ্রের জল বিশ হাজার ফুট নিচে শান্ত নিথর। ঢেউ খেলানো নয়, চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো চুল। সমান। সমতল। সমুদ্রের ফেনার মতো রাশি রাশি শাদা মেঘ জলের উপর ভাসছে। যেন ব্যবধান নেই। আবার বিমানের সমান্তরাল সমোচ্চ মেঘও ছিল নভস্তলে। সুদূর দিগন্তে। যোজনের পর যোজন জল আর মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই। আর কিছু থাকে তো সূর্য। অত উঁচুতে পাখী কোথায়!

ব্যাঙ্ককের মতো হংকং-এও নামতে হলো। দিনের বেলা বলে শহর ও তার আবেষ্টন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। পাহাড় আর সমুদ্র মিলে হংকংকে পরম সুদৃশ্য করেছে। আমাদের কিন্তু সময় ছিল না যে বিমানবন্দরের বাইরে গিয়ে বেড়িয়ে আসি। বুদ্ধিমানের মতো মুদ্রা বিনিময় করে নেওয়া গেল। বিধিনিষেধ নেই। তবে হিসাবে ঠকতে হয় না যে তা বলা কঠিন। অল্প কিছু মুখে দিয়ে সাড়ে এগারোটা নাগাদ আবার উড্ডয়ন। উড়তে উড়তে স্বস্থানে বসে ইতিপূর্বে প্রাতরাশ করা গেছে। এবার মধ্যাহ্নভোজন। বন-ভোজনের মতো আকাশভোজন। সমুদ্র দেখতে দেখতে।

ম্যাজিক কার্পেটে বসে আরব্য উপন্যাসের মতো চলেছি। এত ধীরে ধীরে যে চলার মতো লাগছে না। লাগল কখন? না যখন ফরমোজার অরণ্য উপকূল একটু একটু করে নজরে এলো আর নজর থেকে সরে যেতে থাকল। এর পরে আসবে জাপান। মাঝখানে ছোটখাট কয়েকটা দ্বীপ। তেমন একটা দ্বীপে দেখলুম জনমানব নেই, গাছপালা নেই। খাঁ খাঁ করছে। দ্বীপ অদৃশ্য হলো। আবার সেই অকূল পাথার। এক আধ বার এক আধটা

জাহাজ চোখে পড়ল। বেচারি জাহাজ! বেচারা জাহাজের যাত্রী! এরই মধ্যে আমি বিমানের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলুম। আমার চিরপ্রিয় জাহাজের উপর আমার অনুরাগ শিথিল হয়েছিল।

বিমানে বসেই সকালবেলার তাজা খবরের কাগজ পেয়েছিলুম। হংকং-এর দৈনিক। এ ছাড়া পড়তে পাওয়া যায় বাঁধানো সাপ্তাহিক ও মাসিক। নানা দেশের। মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে লিখিত বার্তা আসে। আমরা এখন কোথায়? কত উঁচুতে। টেম্পারেচার কত? এমনি যত রকম জ্ঞাতব্য। চোখ বুলিয়েই হস্তান্তর করতে হয়। কানে তুলো গুঁজলেও কানাকানি ক্রমে সুগম হয়ে আসছিল। সহযাত্রীর সঙ্গে তো গল্প করা চলছিলই, কোথাও কোনো আসন খালি দেখলে সেখানে গিয়ে আড্ডা দেওয়াও চলছিল। ঠাঁই বদল করতে করতে হঠাৎ এক সময় শুনতে পাই, ফুজি পর্বত।

জাপানের দেবতাত্মা ফুজি। সামনের ক্যাবিন থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বসলুম আমি সেখানে গিয়ে। দর্শন করলুম দেবতাত্মাকে। আমার জাপান-দর্শন ফুজিদর্শনে শুরু হলো। ফুজির ছবি কত বার দেখেছি। জাপানীরা ফুজি আঁকতে অক্লান্ত। সেই ফুজি আমার নয়নে উদিত। সেও ধীরে ধীরে অস্ত গেল। অস্ত গেল তিরিশে অগাস্টের সূর্য। ঈষৎ অন্ধকারে দৃষ্টি নত করে দেখি জাপানের উপকূল। অসমতল। বন্ধুর। অনাবাদী। বন্য। তার পর মিটি মিটি আলো দেখা গেল। গ্রাম। উপনগর। অবশেষে তোকিয়োর সীমানা। হানেদা বিমানবন্দর। নীল লাল আলো। বিরাট ক্ষেত্রায়তন। এশিয়ার বৃহত্তম। নামতে নামতে দৌড়তে দৌড়তে আমাদের কলপাখী থামল। আমার প্রাণপাখী গুঞ্জন করে উঠল, বেঁচে আছি।

হিরোশিমা হারিকো

॥ দুই ॥

আমার ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে কয়েক মিনিট। আর জাপানের ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বেজে কয়েক মিনিট। আমার সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় চুরি গেছে। চুরি আরম্ভ হয়েছে ব্যাঙ্কক থেকে। ব্যাঙ্ককে যখন নামি তখন ভারতে রাত তিনটে নয়, দেড়টা। তেমনি হংকং-এ যখন নামি তখন ভারতে বেলা সাড়ে দশটা নয়, সাতটা। মধ্যাহ্নভোজন যখন করি তখন ভারতে দুপুর বারোটা নয়, সকাল সাড়ে আটটা। আর আসমানে বসে শেষবার যখন চা পান করি তখন ভারতে বিকেল চারটে নয়, সাড়ে বারোটা। শুক্রবার।

মায়া শতরঞ্চ থেকে বাস্তব রাজ্যে ফিরে আসতে খুব যে ভালো লাগছিল তা নয়। আকাশেরও একটা আকর্ষণ আছে। প্রবল আকর্ষণ। তা নইলে পাখী নিত্য নিত্য ওড়ে কেন? মানুষ কতকাল ধরে আকাশচারী হবার স্বপ্ন দেখে এসেছে। এতকাল পরে সে স্বপ্ন সত্য হলো। বিমানবিহার যখন নিরাপদ হবে, ব্যাপক হবে, সাধ্যে কুলোবে তখন আমিও পাখী হব। বিমানে ওড়ার পর জাহাজে চড়তেও মন যায় না, রেলে চড়তে তো রীতিমতো অনিচ্ছা জাগে। হাওড়া স্টেশন থেকে রেলপথে রওনা হয়ে থাকলে পৌছে থাকতুম আমি হানেদায় নয়, বিন্ধ্যাচলে। তোকিয়োতে নয়, এলাহাবাদে। ধুলোতে আর ধোঁয়াতে আর ঝাঁকানিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে থাকত। তবে অনবরত গর্জন শুনে কান অতিষ্ঠ হতো না। আরব্য উপন্যাসের মায়াসতরঞ্চে এ বালাই ছিল না।

তাই মাটিতে পা দিতে আরো ভালো লাগছিল। এলেম নতুন দেশে। তারও ছিল এক দুর্বার উত্তেজনা। কবে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি তার নাম। রুশজাপানী যুদ্ধ যে বছর হয় সেই বছর আমার জন্ম। জাপানের জয়গরবে আমরাও গরবী হয়েছিলুম। দেখছ তো! এশিয়া হারিয়ে দিল ইউরোপকে! হুঁ হুঁ! ইঙ্গমহাপ্রভু! তোমারও দিন আসছে। হারবে একদিন আমাদের হাতে। আমার প্রিয় কুকুরছানার জাপানী নাম রাখা হয়েছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "জাপানী ফানুষ" পড়ে মোহ লেগেছিল। আর মায়া লেগেছিল সেই মা হারা মেয়েটির উপর যে আয়নায় তার মায়ের মুখ দেখেছিল। বড় হয়ে আমার মেজ ভাই জাপানে গেল শিক্ষার্থী হয়ে।

ফিরে এসে জাপানের প্রশংসায় গদগদ হলো। বড় হতে হতে আমি কিন্তু পূবমুখো না হয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে উঠি। তখন আমেরিকার কথা ভাবি, ইউরোপের কথা পড়ি। পূবদিকে তাকাইনে। শিষ্য যদি হতে হয় তবে জাপান যার শিষ্য হয়েছে তারই শিষ্য হব, জাপানের নয়। তার পর যখন দেখলুম জাপান ফাসিস্টদের সঙ্গে জুটেছে তখন মন বিগড়ে যায়। যখন পার্ল হারবারে হানা দিয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে তখন শিউরে উঠি। যখন বর্মা অবধি আসে তখন ভয় পাই। যখন পরমাণু বোমার মার খায় তখন তার জন্যে কাতর হই, বোমারুকে অভিশাপ দিই। সে বোমা আমাদেরও গায়ে লাগে। সে মার আমাকে পশ্চিমের প্রতি বিরূপ করে। ওরা কি মানব না দানব!

পরমাণু বোমার মার খেয়েও জাপান হার মানবে না, এই ছিল আমার প্রার্থনা ও বিশ্বাস। আমি সে সময় সারাদিন কেবল জাপান সম্বন্ধে পড়েছি আর তার অপরাজেয় আত্মা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছি। বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করেছি, জাপান কখনো রণে ভঙ্গ দিতে পারে না। ওরা তেমন জাতই নয়। বন্ধু ব্যঙ্গ করে বললেন, পরমাণু বোমার সঙ্গে চালাকি! যেদিন খবর এলো জাপান বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে সেদিন আমারও মাথা হেঁট হয়ে গেল। ছিল এশিয়াতে একটিমাত্র সত্যিকার স্বাধীন দেশ। সেও পরাধীন হলো। পরে ভেবে দেখেছি যে দেশ স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্যবাদী হয়েছে, পররাজ্য গ্রাস করেছে, বিনা যুদ্ধঘোষণায় পার্ল হারবার ধ্বংস করেছে ধর্ম তার পক্ষে নয়। সে লড়ে যাবে কিসের জোরে! যুদ্ধ তো শুধু গায়ের জোরে হয় না। তার সঙ্গে ন্যায়ের জোর থাকা চাই। জাপানের মরাল কেস দুর্বল ছিল। নয়তো সে মারে মারে জর্জর হতো, তবু পরাজয় স্বীকার করত না।

"স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।" রবীন্দ্রনাথ তার ঘরে গিয়ে তাকে ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে এসেছিলেন। সে কর্ণপাত করেনি। যা হবার তা তো হবেই। আমি তাই পশ্চিমের দিকে পিঠ ফেরালেও জাপানের দিকে মুখ ফেরাইনি। কেবল ভারতের কথাই ভেবেছি, ধ্যান করেছি। সদ্য স্বাধীন এই দেশটির পুনর্গঠনে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছি। বিদেশে যাবার ইচ্ছা আমার হয়নি। আগে পরিচয় দেবার মতো গর্ব করবার মতো কিছু হোক। যে দেশ এখনো দুই খণ্ডে বিভক্ত ও ছিন্নমস্তার মতো আপনার রক্ত আপনি পান করতে উন্মুখ

তাকে দুই নামে নামাঙ্কিত করলেই কি সে দুই আত্মার অধিকারী হবে? যতদিন না সে একাত্ম হয়েছে ততদিন আমাদের বাইরে না যাওয়াই ভালো, যদি যাই তবে হৈ চৈ না করাই কর্তব্য।

তবু দেখছি কেমন করে এসে পড়লুম জাপানে। হানেদার বিমানবন্দরে। একটার পর একটা বেড়া টপকিয়ে ঘোড়ার মতো ছুটতে ছুটতে ঠেকে গেলুম যেখানে সে হলো মাশুলঘর নয়, টীকা নিয়েছি কি না পরখ করার ফাঁড়ি। ভিড় আর কিছুতেই সরে না। কী ব্যাপার! আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেত্রী সোফিয়া ওয়াডিয়াকে ওরা আটক করেছে। তিনি বসন্তের টীকা নেননি। তাঁর বিবেকে বাধে। নিরীহ প্রাণীকে যন্ত্রণা না দিলে পীড়িত না করলে তো টীকা তৈরি হয় না। গান্ধী যে কারণে টীকাবিরোধী ছিলেন তিনিও সেই কারণে। আমাদের মতো সার্টিফিকেট না দেখিয়ে তিনি দেখালেন ভারত সরকারের একখানা তার। তাতে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। জাপানীরা সেটা মানবে কেন? বসন্তের সংক্রামণ থেকে তাদের দেশ তাতে বাঁচবে না।

নেত্রীকে ত্যাগ করে আমরা না পারি এগোতে না পারি পেছোতে। ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলে থাকার অনুভূতি হলো অন্নদাশঙ্করের। ওদিকে আমাদের নিতে জাপান পেন ক্লাব থেকে যে বন্ধুরা এসেছিলেন তাঁরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁদের সম্মানিত অতিথিকে ফেলে তাঁরাও তো ফিরতে পারেন না। অনুমতি মিলল। আমাদের কাফেলা চলল।

এই যে ঘটনাটুকু ঘটে গেল এর গুরুত্ব আমি ভুলিনি। পরে একদিন জাপানীদের সভায় আমাদের দেশের দোটানার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এর সাহায্য নিয়েছি। বসন্ত যখন সংক্রামক আকারে দেখা দেয় তখন আমাদের সরকার না পারে জোর করে সবাইকে টীকা দিতে, না পারে প্রজাদের মরতে দিতে। আধুনিকতা বলে, বিবেকের প্রশ্ন অবান্তর। মানুষের প্রাণ বা দুর্ভোগ বাঁচাতে যদি বাছুরের বা গিনিপিগের পীড়া হয় যন্ত্রণা হয় তবে হোক তার পীড়াযন্ত্রণা। অপর পক্ষে অহিংসা বলে, বিবেকের প্রশ্নটাই আসল। মানুষ বেঁচে থেকে বা দুর্ভোগ এড়িয়ে করবে কী, যদি নির্বিবেক হয়, যদি আর-একটি প্রাণীর দুঃখে অসাড় হয়! গান্ধীজীর দেশ সাহস করে আধুনিক হতে পারছে না, আবার তার সাহস নেই যে পুরো পথটা গান্ধীজীর সঙ্গে যায়।

যাক, সোফিয়া ওয়াডিয়ার সঙ্গে পুরো পথটা যাওয়া আমার বরাতে ছিল। একযাত্রায় পৃথক ফল হলো উমাশঙ্করের, গোককের, জম্বুনাথনের, বাৎস্যায়নের। ওঁরা চললেন দাই'ইচি হোটেলে। আর সোফিয়া ওয়াডিয়া, কমলা ডোঙ্গরকেরী, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও আমি ইম্পিরিয়াল হোটেলে। হানেদা থেকে তোকিয়োর ডাউন টাউন বারো মাইল রাস্তা। ঋজু ও প্রশস্ত পথ। দু'ধারের বাড়ীঘর সাধারণত কাঠের। বেশীর ভাগ একতলা। গায়ে গায়ে জড়িয়ে নয়। ফাঁক ফাঁক। বোধ হয় ভূমিকম্পের ভয়ে কাঠ আর আগুনের ভয়ে ফাঁক। ডাউন টাউন যতই নিকট হয়ে এলো ততই দালানের সংখ্যা বাড়তে লাগল। নানা রঙের আলোকসজ্জা। নিওন বাতি। চীনা অক্ষর উপর থেকে নিচে। ছবির মতো দেখতে। রঙিন অক্ষর। আলোকিত অক্ষর। যেন রংমশাল জ্বলছে।

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন বাস্তুশিল্পী ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট পঁয়ত্রিশ বছর আগে ইম্পিরিয়াল হোটেলের অভিনব সৌধ পরিকল্পনা করেন। ইষ্টকনির্মিত এই অট্টালিকা নাকি জাপানের প্রথম ভূমিকম্পসহ ইমারৎ। আশে পাশে কংক্রিটের দালান উঠছে ও আরো উঁচুতে মাথা তুলেছে। তাই পঁয়ত্রিশ বছরেই এর গায়ে পুরাতনত্বের ছাপ লেগেছে। হোটেলটি তার চেয়েও খনেদী। প্রায় সত্তর বছর আগে এর প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য অতিথিদের জন্যে। এখনো এটি পাশ্চাত্য পরিব্রাজকদের তীর্থ। পৃথিবীর সর্বত্র প্রসিদ্ধ হোটেল-গুলির অন্যতম। পরিচালকরা জাপানী, কিন্তু পরিচালনা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য মতে। ঝি চাকররাও ইংরেজী বলে। ঠিক পশ্চিমের ঝি চাকরদের পোশাক পরে। অবিকল তাদেরই মতো চালচলন। মনে হয় পূব দেশ থেকে পশ্চিম দেশে এসেছি। হোটেল তো ভারতেও আছে। পাশ্চাত্য ধরনের হোটেল। পাশ্চাত্য পরিচালিত। কিন্তু এ বিভ্রম এইখানেই সম্ভব। এদের গাঁয়ের রং আমাদের চেয়ে ফরসা বলে কি? না এদের মনেও পশ্চিমের রং ধরেছে? পরে একদিন একটি কলেজের মেয়ে আমাকে কী একটা উপহার দিয়েছিল আমার বক্তৃতার শেষে। মোড়কের উপর লিখেছিল, "To Orient"। হয়তো ওর মানসিক ভূগোলে জাপান ভারতের পূব দিকে নয়, ভারত জাপানের পূব দিকে। বাস্তবিক, জাপানের অন্তরে এখন অহর্নিশ দ্বন্দ্ব চলেছে। জাপান কি পূর্ব গোলার্ধের পূব দিকের দেশ না পশ্চিম গোলার্ধের পশ্চিম দিকের দেশ? তার অবস্থান কি এশিয়ায় না ইউরামেরিকায়?

আকাশে অবগাহনের সুযোগ পাইনি। কোনো মতে গা মুছেছিলুম। তাই হোটেলে আমার ঘরে গিয়ে গরম জলে শুয়ে থাকলুম পরম হরষে। তত ক্ষণে ন'টা বেজে গেছে। ডিনার পরিবেশন করবে না। চললুম আমি বাইরে কোথাও খেতে। আমার সঙ্গে দেখা করতে একটি জাপানী ছেলে এসেছিল, সে বলেছিল সামনেই রেস্টোরাণ্ট আছে। তাই পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লুম। ভারতের ঘড়িতে তখন ছ'টা। চব্বিশ ঘণ্টা আগে তখনো আমি দক্ষিণ কলকাতা থেকে নিক্রমণ করিনি। আর সেই আমি কিনা চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতে তোকিয়োর রাস্তায় দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছি। অদম্য, অক্লান্ত, উত্তেজনায় চঞ্চল, ক্ষুধায় ক্ষিপ্র। ভাবতে অবাক লাগে। চৌরঙ্গী অঞ্চলের মতো অনেকটা। একদিকে সৌধ, অন্তদিকে হিবিয়া পার্ক, প্রাসাদ-ভূমি। যেমন আমাদের গড়ের মাঠ। তার পরে গড়খাই। তার পরে সম্রাটের প্রাসাদ। যেমন আমাদের ফোর্ট উইলিয়াম। কিন্তু অত দূর যাইনে। দিগ্‌ভ্রমের ভয়ে দিক্‌পরিবর্তন করিনে। রেস্টোরাণ্টের নিশানা খুঁজে না পেয়ে হোটেলে ফিরে আসি। জাপানীকে ধরে ইংরেজীতে শুধাতে সঙ্কোচ বোধ করি রেস্টোরাণ্ট কোথায়। ভাবি আমার কপালে ছিল অভুক্ত থাকা। রাত সাড়ে দশটার সময় কে আমাকে খেতে দেবে! তবু একবার কপাল ঠুকে জানতে চাইলুম হোটেলের ব্যুরোয় ইংরেজীনবিশ যুবকদের কাছে, হালকা সাপার কোথায় পেতে পারি?

উত্তর পেলুম, নিজের ঘরে রাত বারোটা অবধি। বেল টিপতেই মেড ছুটে এলো। পাওয়া যায় স্যাণ্ডউইচ। বেশ, তাই সই। তার সঙ্গে দুধ। দিয়ে গেল মেড। সেই যে আসমানে বসে চা পান করেছি তার প্রায় সাত ঘণ্টা পরে জমিনে বসে সাপার খেয়ে শুতে গেলুম। একরাত্রের নিদ্রা বকেয়া ছিল। পরের দিন ঘুম ভাঙল বেলা করে। আমার ঘড়িতে তখন ছ'টা। ভাবলুম দেশে যে সময় ঘুম ভাঙে বিদেশেও সেই সময় ভেঙেছে। মুখ হাত ধুতে সংলগ্ন স্নানের ঘরে গেছি, টেলিফোন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। শয্যাপার্শ্বে ফিরে গেলুম। এত সকালে কে আমাকে স্মরণ করল? তুলে নিয়ে শুনি নারীকণ্ঠের ভর্ৎসনা। "মনে নেই সাড়ে ন'টায় বেরোতে হবে? দূতাবাসের গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। আর আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি লবিতে।" কেমন করে বলি যে এইমাত্র ভাঙল আমার ঘুম। হোঁস

হলো ঘড়ির কাঁটা ঘোরাইনি। রাখতে চেয়েছি ভারতের সঙ্গে তাল ' তার পরিণাম এই !

পাঁচ মিনিট সময় ভিক্ষা করে নিয়ে ক্ষৌরি হয়ে দৌড় দিলুম লবিতে। পথে পড়ল পেন কংগ্রেসের ব্যুরো। দেখলুম লেখকলেখিকারা ঢুকছেন আর কী হাতে করে বেরিয়ে আসছেন। আমাকেও দেওয়া হলো আমার নাম-ছাপানো কার্ড আঁটা ব্যাজ, কার্ড আঁটা প্ল্যাষ্টিকের ব্রীফকেস। তার সঙ্গে বইয়ের মতো করে ছাপা প্রোগ্রাম, তোকিয়োর মানচিত্র, তোকিয়োর সচিত্র গাইড, জাপানী লেখকলেখিকাদের পরিচিতি পুস্তক, পরদেশী লেখক-লেখিকাদের পরিচিতি পুস্তক। মানচিত্রে প্রত্যেকটি দূতাবাসের অবস্থান চিহ্নিত। যে যেমন খাদ্য পছন্দ করে তেমন খাদ্য যেখানে-যেখানে পাওয়া যায় তার তালিকা ছিল গাইডে আর নির্দেশ ছিল মানচিত্রে। ফরাসী ইটালিয়ান জার্মান রাশিয়ান মার্কিন মঙ্গোলিয়ান বিলিতী মেক্সিকান চীনা জাপানী সব রকম রেস্টোরাণ্টের নাম দেখলুম। দেখলুম না কেবল ভারতীয়।

রাষ্ট্রদূত আমার কলেজ জীবনের সতীর্থ চন্দ্রশেখর ঝা। একই সার্ভিসের লোক। বন্ধুপ্রতিম। গোপালদাসবাবু দমদমে আমার হাতে যে সন্দেশের বাক্স দিয়েছিলেন বিমানে সেটি খুলিনি। হোটেলেও না। রাষ্ট্রদূতকে সেটি নজরানা দিলুম। রাষ্ট্রদূত হলেন রাজপ্রতিনিধি। দিতে গিয়ে মনে পড়ল যে সকাল বেলা পেটে কিছু পড়েনি। এক পেয়ালা চা পর্যন্ত না। হোটেলে ওরা ন'টার পর প্রাতরাশ পরিবেশন করে না। চিনির বলদ আমি। সন্দেশ থাকতে উপবাসী। রাষ্ট্রদূত যদি আমাদের কফি না খাওয়াতেন তা হলে সেদিন নির্জলা একাদশী চলত মধ্যাহ্ন অবধি। চ্যান্সে-লারির নিজের বাড়ী নেই, নাইগাই বিলডিং-এর একাংশে স্থিতি। কিন্তু চমৎকার অবস্থান। একদিকে তোকিয়োর গড়ের মাঠ, অন্যদিকে কয়েক পা যেতেই তোকিয়ো স্টেশন। আশে পাশে ব্যাঙ্ক, আফিস, স্টোর। সিনেমা, থিয়েটার। তোকিয়োর ব্রডওয়ে গিন্‌জা। আমি যে একমাস জাপানে ছিলুম আমার ঠিকানা ছিল ভারতীয় দূতাবাস। চিঠির জন্যে প্রায়ই যেতে হতো সেখানে।

হোটেলে ফিরে দেখি লোকে ভরে গেছে। এক কোণায় আমাদের আন্তর্জাতিক সভাপতি আঁদ্রে শাঁসঁ। তাঁর কথা আগে বলেছি। সৈয়দ

আলী আহ্সানকে আমি চিনতুম না, তিনিও চিনতেন না আমাকে। নাম জানাজানি ছিল। আলাপ হলো। করাচীতে বাংলা অধ্যাপনা করেন। বাংলাসাহিত্যের উপর এমন একখানি ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদন করেন যার তুলনা বাংলাদেশেও নেই। আমরা দুই বাঙালী ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম কে কোন রাষ্ট্র থেকে এসেছি। বাংলা ভাষা শোনা গেল তোকিয়োর ইম্পিরিয়াল হোটেলে। করাচী থেকে আরো একজন প্রতিনিধি উপস্থিত। কুরাতুলাইন হায়দর ইংরেজীতে লেখেন। উত্তরপ্রদেশেই এঁদের বাড়ী। দেশবিভাগের দরুন বাস্তহারা। সে দুঃখ এখনো ভুলতে পারেননি। কেমন এক বিষাদ এঁর বদনে লেখা। পাকিস্তানে গিয়ে জীবিকার প্রশ্ন মিটেছে, কিন্তু জীবনের প্রশ্ন মেটেনি। লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানকে করাচী বা লাহোরে থাকতে বলা যেন কলকাতার বাঙালীকে বাঙাল মুলুকে বাস করতে বাধ্য করা। ধরুন, যদি পশ্চিমবঙ্গের লোক বাস্তহারা হয়ে ঢাকায় চাটগাঁয় শরণার্থী হতো তা হলে জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও জীবনে সুখী হতো কি? এই কন্যাটির কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অভিমান। যেন আমিই দেশবিভাগের জন্যে দায়ী। যেন আমার জন্যেই এঁকে বনবাসে যেতে হয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর সোফিয়া ওয়াডিয়াকে ইণ্টারভিউ করতে এলেন জাপানী মেয়েদের একটি পত্রিকার তরফ থেকে দু'টি মহিলা। সঙ্গে একটি ফোটোগ্রাফার। দু'জনের মধ্যে যিনি প্রবীণা তিনি দোভাষীর কাজ করলেন। যিনি নবীনা তিনি লিখে নিলেন। প্রবীণার পরনে ইউরোপীয় পোশাক, নবীনার পরনে চীনা পোশাক। প্রবীণার কেশ এমন কিছু খাটো নয়, নবীনার কেশ বালকের মতো ছাঁটা। সোফিয়া ওয়াডিয়াকে সাহায্য করতে কমলা ডোঙ্গরকেরী ছিলেন। আমার সেখানে থাকার কথা নয়। কিন্তু থাকতে হলো, প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো, ছবি তোলাতে হলো। পরে একদিন দেখি এক উপহার। উপহার দিতে জাপানীদের জুড়ি নেই। তেমনি ফোটো তুলতেও। হানেদা বিমানবন্দরের ফোটো এরই মধ্যে কাগজে বেরিয়েছে। রাত্রে হোটেলের কক্ষে সেই যে জাপানী ছেলেটি দেখা করতে এলো তার সঙ্গেও দেখি গুটি দুই ছেলে। ফোটো তুলতে চায়। কে যে খবরের কাগজের লোক, কে যে নয়, তা গোড়া থেকে বোঝা যায় না। একদিন এক প্রদর্শনীতে ঘুরে ঘুরে দেখছি, হঠাৎ পাশ থেকে

একজন বলে উঠল, "আপনার ফোটো তুলতে পারি ?" যেই ফোটো তোলা হয়ে গেল অমনি নোটখাতা বেরোল। "আমি অমুক পত্রিকার সংবাদদাতা। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি ?" প্রশ্ন শেষপর্যন্ত এসে ঠেকবে বারো বছর আগেকার সেই পরমাণু বোমা সম্বন্ধে আমার কী মত, সেইখানে কিংবা "মিশ্র সন্তান"দের সম্বন্ধে আমার কী বক্তব্য, এইখানে। এ রকম অনেক বার হয়েছে।

সেদিন আমাদের কংগ্রেসের অধিবেশন ছিল না। হাতে সময় ছিল। দূতাবাসের পরামর্শ শুনে আমরা গেলুম লোকশিল্প প্রদর্শনী দেখতে মিৎসুকোশি ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে। জাপানের এইসব ডিপার্টমেণ্ট স্টোর শিল্পীদের প্রদর্শনীর জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয়। সেদিন কিন্তু তেমন কোনো প্রদর্শনীর সন্ধান মিলল না। বেড়াতে বেড়াতে এক কোণে জনাকয়েক বাস্তশিল্পীর সঙ্গে আলাপ হলো। দেখি এক পাশে একটা কুটীর। বা কুটীরের বড় মাপের মডেল। তাঁদের একজন সেটা ডিজাইন করেছেন। ভারতবর্ষে এ হেন স্টোরও নেই, শিল্পীদের প্রতি এ হেন দাক্ষিণ্যও নেই। এ হেন দর্শনীয়ও নেই। চমৎকৃত হলুম। জাপানের মতো ডিপার্টমেণ্ট স্টোর এশিয়ার আর কোথাও আছে বলে শুনিনি। একই ভবনে সর্বপ্রকার পণ্য সুসজ্জিত। এমন কি ফলমূল মাছ তরকারিও। তাই লোকে লোকারণ্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম কে কী পরেছে, কার কেমন চেহারা। যারা বেচছে তারা বেশীর ভাগ তরুণতরুণী। পাশ্চাত্য পোশাক পরিহিত। যারা কিনছে তারা সব বয়সী নরনারী। কারো পাশ্চাত্য পোশাক, কারো প্রাচ্য। কেউ খড়ম পায়ে দিয়ে খট খট করে হাঁটছে। কারো পিঠে বোঁচকার মতো করে বাঁধা ওবি। আমিও কিনলুম য়ুকাতা আর ওবি। স্টোরে উপর তল করতে চলন্ত সিঁড়ি ছিল। কত কাল পরে এস্‌ক্যালেটরে চড়ে ওঠানামা করতে কী যে মজা লাগছিল। যেন বয়স কমে গেছে ত্রিশ বছর।

হোটেলে ফিরতেই প্রভাকর পাধ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি দিনকয়েক আগে এসেছেন। তাঁদের কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডম জাপানেও শাখা মেলেছে। জাপানী কেন্দ্র থেকে সন্ধ্যাবেলা পার্টি দেওয়া হচ্ছে। আমরাও নিমন্ত্রিত। গিয়ে দেখি মস্ত পার্টি। পেন কংগ্রেস থেকে, ইউনেস্কো থেকে নিমন্ত্রিত নানা দেশের অতিথি। কালচারাল ফ্রীডম কংগ্রেস থেকে নিমন্ত্রক

বহুতর জাপানী। একটি জাপানী সরাইয়ের সংলগ্ন ভূমিতে এঁদের সমাবেশ। পাশে সরাই। চার দিকে উদ্যান। জাপানী ধরনের সরাই। জাপানী ধরনের উদ্যান। এখন এই যে শতাধিক নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রক এঁদের ভোজ্য প্রস্তুত হচ্ছিল জাপানী মতে সকলের সামনে কাঠকয়লার উনুনে। সদ্য ভর্জিত মৎস্যাদি তৎক্ষণাৎ পরিবেশিত হচ্ছিল পাতে পাতে। আপনার ইচ্ছা হয় আপনি উঠে গিয়ে নিয়ে আসতে পারেন রাঁধুনিদের কাছ থেকে। রাঁধুনিরা পুরুষ। নয়তো বসে থাকুন আপনার জায়গায় বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে থাকুন। আপনাকে ভোজ্য দিয়ে যাবে একটি মেয়ে, পানীয় দিয়ে যাবে আরেকটি মেয়ে। এরা খুবই কমবয়সী। পরনে রঙচঙে জাপানী পোশাক। কিমোনো। ওবি। মাথার চুল মুকুটের মতো উঁচু করে বাঁধা। ছবির বইয়ে যাদের দেখেছি তারাই কি এরা? কলাবতী? গেইশা? কই, ছবির সঙ্গে মিলছে না তো? এরা বোধ হয় গৃহস্থের কন্যা, কুমারী কন্যা। বড় নিরীহ। বড় লক্ষ্মী।

তার পর এক সময় দেখি এরাই নাচগান আরম্ভ করে দিয়েছে স্বতন্ত্র এক স্থলীতে। এদের সঙ্গে সামিসেন বাজাচ্ছেন এক প্রবীণা। আরো দু'একজন ছিলেন, তাঁরা নবীনাও নন প্রবীণাও নন। তাঁরা গানের দলে। সামিসেন-বাদিনীর গান শুনে মনে হলো এ তো আমার চেনা গান, এ তো আমার চেনা কণ্ঠ। বাড়ীতে গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা। শান্তিদেবের রেকর্ড। কিন্তু নাম স্মরণ ছিল না বলে জিজ্ঞাসা করিনি কাউকে। এর পর খুব একটা মজাদার মুখোশ এঁটে একটি মেয়ে কমিক নৃত্য করল। মাঝখানে কিছুক্ষণ নাচগানবাজনার বিরাম। স্টীফেন স্পেণ্ডারের ভাষণ। মজলিস থেকে উঠে এসে সেই সব মেয়েরাই ভোজ্যপানীয় পরিবেশন করল।

এবার কিন্তু আমার মনে খটকা বেধেছিল। এরা কারা?

"ওরা একপ্রকার বেশ্যা।" বললেন মৃদুহাসিনী স্বল্পভাষিণী তাইকো হিরাবায়াশি। "আমি এর বিরুদ্ধে লিখে আসছি।"

আলাপের সময় জানা ছিল না এঁর জীবনকাহিনী। ইনি আমার সমবয়সিনী। স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে ইনি তোকিয়োতে এসে টেলিফোন অপারেটর হন। তার পরে দোকান কর্মচারী। কোথাও টিকতে পারেন না। ক্রমে ক্রমে ইনি সমাজসচেতন হয়ে ওঠেন। প্রোলিটারিয়ান সাহিত্য ও

রাজনীতি করতে গিয়ে পীপ্‌লস্ ফ্রন্ট মণ্ডলীর সঙ্গে ইনিও গ্রেপ্তার হন। কঠিন অসুখে পড়ে আট বছর কেটে যায় বিছানায় শুয়ে। গত মহাযুদ্ধের পর আবার যখন লিখতে বসলেন তখন দেখা গেল ইনি আরো গভীর ভাবে জীবনকে অনুভব করেছেন, এঁর দৃষ্টি আরো প্রসারিত হয়েছে, এঁর স্টাইল আরো পরিণত হয়েছে। ইনি শ্রেণীবোধের ঊর্ধ্বে উঠেছেন। উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় ইনি শ্রুতকীর্তি। সামাজিক সমালোচনায় অনলস।

পরে শুনেছি জাপান স্থির করেছে আগামী এপ্রিল থেকে বেশ্যাবৃত্তি উঠিয়ে দেবে। এত বড় বিপ্লবের জন্যে দেশকে প্রস্তুত করার কোনো লক্ষণই দেখতে পেলুম না সেদিন। যাঁরা কালচারাল ফ্রীডম নেই বলে রুশচীনের ছিদ্র ধরেন তাঁরা কি জানেন না যে রুশচীনে বেশ্যাবৃত্তি নেই? পার্টিতে ভদ্রমহিলারাও আসবেন, আবার বাঈজীরাও আসবেন, এ প্রথা বার বার লক্ষ করতে হয়েছে আমাকে। আমাদেরও এক কালে বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে বাঈনাচ না হলে চলত না। সে রেওয়াজ আর নেই বলে আমরা আমাদের স্ত্রীকন্যাদের পার্টিতে নিয়ে যেতে পারছি। যারা বেশ্যাদের সঙ্গে মেশে তারা ভদ্রাদের সঙ্গে মিশবে এটা আমরা সইতে পারতুম না। জাপানীরা বড় বেশী দিন সহ্য করেছে। বাঈজীর নাচগানপরিবেশন বিনা এখনো ওদের পার্টি জমে না। কখনো জমবে কি? তবু বলতে হবে জাপানের বিবেক সজাগ হয়েছে। তাইতো হিরাবাযাশির কণ্ঠে সেই বিদ্রোহী বিবেকের মৃদু প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে শুনলুম।

কিয়োতো ফুশিমি নিঁগিয়ো

॥ তিন ॥

সে রাত্রে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন সোফিয়া ওয়াডিয়ার এক মার্কিন অধ্যাপক বন্ধু। ভারতভক্ত। তাই অকালে ফিরতে হলো হোটেলে। সেখান থেকে আমাদের তুলে নিয়ে গেলেন অধ্যাপক মূর তোকিয়োর বিখ্যাত উদ্যানভোজনাগার চিন্‌জান্‌সো'তে।

চিন্‌জান্‌সো, তার মানে ভিলা ক্যামেলিয়া, গোড়ায় ছিল তিনটি পাহাড় ও দুটি উপত্যকা। তাকে উদ্যানের রূপ দেন মেইজি যুগের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিক প্রিন্স আরিতোমো য়ামাগাতা। তাঁর মালঞ্চের মালাকর ছিল সেকালের সবার সেরা মালী কাৎসুগোরো। গত মহাযুদ্ধের শেষের দিকে আগুন লেগে প্রায় সমস্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ছ' বছর লাগে নতুন করে বানাতে। আট হাজারের উপর গাছপালা লাগানো হয়। ঘরবাড়ি আবার তৈরি হয়। এবার একটি সমিতি সংগঠিত হয়। চিন্‌জান্‌সো সংরক্ষিণী সমিতি। স্থির করা হয় এখন থেকে উদ্যানটি হবে উদ্যান-ভোজনাগার।

এখানে আছে একটি তিনতলা প্যাগোডা। এগারো শ' বছর আগে মহাকবি ওনোনো তাকামুরা এটি করান। তেত্রিশ বছর আগে হিরোশিমা অঞ্চল থেকে এটিকে এখানে সরিয়ে আনা হয়। আর-একটি পাঁচতলা প্যাগোডা আছে। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সরানো। নারা থেকে অপসারিত একটি পাথরের কুণ্ড ও একটি পাথরের লণ্ঠনও আছে। এমনি আরো অনেক কীর্তি স্থানান্তরিত হয়ে এখানে এসেছে। একটা আস্ত মন্দিরকেও কিয়োতো অঞ্চল থেকে আনয়ন করা হয়েছিল, আগুনে পুড়ে না গিয়ে থাকলে সেটি হতো একটি "জাতীয় সম্পদ"। কোনো প্রাচীন কীর্তিকে "জাতীয় সম্পদ" আখ্যা দিলে বুঝতে হবে যে তার সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজের হাতে নিয়েছে।

তার পর আছে একটি পাইন তরু। ফুজি পাহাড়ের মতো দেখতে। তাই তার নাম ফুজি মাৎসু। গাছকে রকমারি আকৃতি দেওয়া জাপানী মালাকরদের কৃতিত্ব। পরে অন্যত্র লক্ষ করেছি কেমন করে কচি বয়স থেকে গাছকে যা খুশি আকৃতি দেওয়া হয়। বামন করে রাখতে তো যেখানে

সেখানে দেখেছি। সে-সব বামনের বয়সের গাছ হয়তো বনস্পতি হয়েছে। একটা বনস্পতি হবে আরেকটা বামন হবে, এটা বোধ হয় স্থায়বুদ্ধি নয়। খোদার উপর খোদকারী করতে গিয়ে মানুষ এ ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি মানেনি।

চিন্‌জান্‌সোতে পৌছতে প্রায় ন'টা বেজেছিল। বলে কী না আমাদের দেরি হয়ে গেছে। খেতে দেবে না। পরেও একদিন এক রেস্টোরাণ্টে দেখেছি ন'টা বাজল কি খাওয়ানোর পাট চুকল। তবে খুঁজে নিতে হয় কোথায় গেলে খেতে পাওয়া যায়। তার সন্ধানে যাই যাই করছিলুম, এমন সময় ভারতীয় অতিথিদের খাতিরে চিন্‌জান্‌সো তার নিয়মভঙ্গ করল।

চিন্‌জান্‌সো থেকে ফেরার পথে অধ্যাপককে বললুম গিন্‌জা ঘুরে যেতে। তোকিয়োর ব্রডওয়ে। কলকাতায় এর মতো কী আছে? না, চৌরঙ্গী নয়। বিস্তীর্ণ ঋজু রাজপথ। দু'ধারে মাথা উঁচু দালান। দোকান আফিস থিয়েটার সিনেমা রেস্টোরাণ্ট। নানা রঙের আলোর বন্যা। আলোকিত রঙিন নিয়গতি অক্ষরচিত্র। এই গিন্‌জাতেই আমরা এসেছিলুম দিনের বেলা ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে। তখন একে চিনতেই পারিনি।

সোফিয়াদি'কে বলেছিলুম আমার ঘুম-ভাঙাব কাহিনী। কে জানে পরের দিন যদি জাগতে সেই রকম দেরি হয় তা হলেই হয়েছে আমাদের কামাকুরা যাওয়া! মহাবুদ্ধ দেখতে। জাপানের খোঁজখবর আর সকলের চেয়ে বেশী রাখি বলে আমাকে তিনি পরিহাস করে বলেছিলেন, "তুমি আমাদের ম্যানেজার। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব।" আপাতত কামাকুরা নিয়ে যাবার কল্পনা ছিল। কিন্তু সময়মতো যদি ঘুম না ভাঙে! কে হবে আমার ঘুম-ভাঙানিয়া! তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমি তো খুব ভোরে উঠি। আমি তোমাকে টেলিফোনে জাগাব। ক'টায় চাও, বল?" আমি বললুম, "আমি যদি আপনা থেকে জেগে না থাকি তা হলে সাতটায়।"

এর পর থেকে রোজ তিনি আমার বৈতালিক হতেন। কিন্তু কোনো কোনো দিন আমি টেলিফোন বেজে ওঠার আগেই বিছানা ছেড়ে থাকতুম। কোনো কোনো দিন আবার এত খারাপ লাগত স্বপ্নের মাঝখানে জাগতে। কোনো কালেই আমার সুনিদ্রা হয় না। যেটুকু হয় সেটুকু ভোরের দিকে। তাই বাড়িতে আমাকে কেউ তুলে দেয় না। কিন্তু বিদেশে যদি দেরি করে উঠি প্রাতরাশ তো হারাবই, যাঁদের ম্যানেজার হয়েছি তাঁদের আস্থাও

হারাব। তা ছাড়া তোকিয়োর জীবনযাত্রা শুরু হয়ে যাবে আমার জন্যে সবুর না করে। কত কী হারাব! ব্যর্থ হবে এত দূর দেশে আসা।

রবিবার সকালে কিন্তু কামাকুরা যাওয়া হলো না। সেইদিনই বিকেলে আমাদের আন্তর্জাতিক কর্মসমিতি একত্র হবে। দুর্লভ সৌভাগ্য আমার, আমিও একজন সদস্য। কমলা ডোঙ্গরকেরীও। আর সোফিয়াদি'কে তো যেতে হবেই। তিনি আমাদের নেত্রী। তার আগে সেদিনকার আলোচনায় আমরা কী লাইন নেব সেটা ঠিক করে ফেলা দরকার। প্রধান বিতণ্ডার বিষয় হাঙ্গেরী। সেখানকার পেন ক্লাবের সভ্যেরা নাকি অত্যাচারে যোগ দিয়েছেন। তা বলে তাঁদের কেন্দ্রটাও সাজা পাবে এটা আমার মতে অবিচার। নাম যদি কেটে দিতে হয় সভ্যদের নাম কাটা হোক, কিন্তু কেন্দ্র বহাল থাক। তদন্ত? হাঁ, তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্ত যতদিন চলছে ততদিন সাস্‌পেন্সন? না, সেটা উচিত নয়।

শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো। আমি কিন্তু উপস্থিত থাকিনি। কারণ আমি জানতে পেরেছিলুম যে এক-একটি দেশের প্রতিনিধি যদিও দু-দুটি ভোট কিন্তু এক-একটি। সেটি যে-কোনো একজন দিলেই চলে। সে জন আমি না হয়ে কমলাবোন হলেও একই কথা আর বিতর্কে অংশ নেবার জন্যে পলিসি নির্ধারণের জন্যে সোফিয়াদি তো রইলেনই। আমি ছুটি নিলুম। রবিবারে রাষ্ট্রদূতকে তাঁর ভবনে পাওয়া যাবে। তাঁর গৃহিণীকেও। সামাজিক 'কল' দিতে হলে অপরাহ্নটা হাতে রাখা চাই। রাত্রে চিন্‌জান্‌সো'তে পেন কংগ্রেসের সম্বর্ধনা। সেটা বাদ দিলে লেখক মহলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে না।

বস্তুত, হাঙ্গেরীর জন্যে ও ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। রুশপ্রভাবিত দেশগুলিতে পেন কেন্দ্র এখনো দু'চারটি আছে। সেই সূত্রে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে, পোলাণ্ড থেকে, বুলগারিয়া থেকে প্রতিনিধি এসেছেন। হাঙ্গেরী থেকেও আসতেন, যদি ওখানকার কেন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব হতো। কিন্তু পলাতক লেখকসভ্যেরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন আর কেন্দ্র তার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। আমরা যদি অনুসন্ধান না করে পক্ষ নিই তা হলে হাঙ্গেরীর কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। তার ফলে হয়তো বুলগারিয়ার চেকোস্লোভাকিয়ার পোলাণ্ডের কেন্দ্রগুলির সঙ্গেও

বিচ্ছেদ ঘটবে। তখন আমরা কোন মুখে বলব যে পি. ই. এন. হচ্ছে বিশ্ব-লেখকসঙ্ঘ? *পোয়েট এসেয়িস্ট নভেলিস্টদের এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম* মহাযুদ্ধের পর লণ্ডনে কাজ শুরু করে। এর প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস ডসন স্কট ও প্রথম সভাপতি জন গলসওয়ার্দি এটিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর মতো এটিও একটি বিশ্বপরিকল্পনা। "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

অপর পক্ষে একথাও ঠিক যে লেখকের স্বাধীনতায় যাঁদের বিশ্বাস নেই, যাঁরা রাষ্ট্রের কথায় ওঠেন বসেন নাচেন মাতেন তাঁরা কোন মুখে পি. ই. এন.'র চার্টারে সই করবেন? যদি করেন সেটা অসাধুতা। সুতরাং তাঁদের স্থান পেন ক্লাবে নয়। মূলত এটা একটা ক্লাব। ক্লাবে সকলের প্রবেশ নেই। কেবল তাঁদেরি আছে যাঁরা ক্লাবের নিয়মকানুন মানতে রাজী ও সমর্থ। পেন কংগ্রেসের পূর্বতন বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে এ নিয়ে দারুণ তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। এবারেও হবে। এমনতর অপ্রীতিকর কার্যে যোগ দিতে আমার অস্পৃহা। কে জানে হয়তো দেখব অধিকাংশের ইচ্ছা হাঙ্গেরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। তার পরিণাম অর্ধেক বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। সুখের বিষয় আমাদের সভাপতি আঁদ্রে শাঁসঁ ছিলেন মধ্যপন্থী। কোনোরূপ চরমপন্থাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। হাঙ্গেরী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত যা হলো তা অর্ধেক বিশ্বের গ্রহণের অযোগ্য হয়নি, অথচ তাতে চার্টারের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়নি। হাঙ্গেরীর পলাতক লেখকদের খুশি করতে গেলে পোলাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়া বুলগারিয়ার প্রতিনিধিরা উঠে চলে যেতেন। সেই সব দেশের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যেত। জানতে পেতুম না আমরা তাদের ভিতরের খবর। পরের দিন কংগ্রেসের উদ্বোধনের সময় পোলাণ্ডের সম্মানিত অতিথি স্লোমিনস্কি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি শুনতে না পেলে আমরা এমন কিছু হারাতুম যার প্রতিপূরণ নেই। পোলাণ্ডের লেখকরাও স্বাধীনচেতা। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার জন্যে লেখকদের যে আকুতি তা তথাকথিত স্বাধীন বিশ্বে সীমাবদ্ধ নয়, তা সারা দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তে সক্রিয়। চার্টার যাঁরা সই করেছেন তাঁদের অসাধুতার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কোনো এক রাষ্ট্রের সঙ্গে সে রাষ্ট্রের লেখকদের একাকার ভাবাটাই ভুল। পেন কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশনে সে ভুলের অবসান হলো। আমরা যদি আর কিছু

না করে থাকি তবে অন্তত এইটুকু যে করতে পেরেছি এর জন্যে সুখী। নইলে গোটা অধিবেশনটাই মাটি হতো। জাপানীরা দুঃখ পেত। ক্রমেই আমরা বুঝতে পারছিলুম কী পরিমাণ তারা খেটেছে, ত্যাগ করেছে, এর সাফল্যের জন্যে।

রবিবার মধ্যাহ্নভোজনের পর চললুম আমরা সাঙ্কেই কাইকান। সেই বৃহদায়তন সৌধের পাঁচ তলায় কোকুসাই হল। সেখানেই আন্তর্জাতিক কর্মসমিতির বৈঠক। তার বাইরে চা-কফির কাউণ্টার, বসে খাবার ও আড্ডা দেবার জায়গা, চিঠিপত্র লেখার টেবিল, চিঠিপত্র ডাকে দেবার আগে রকমারি ডাকটিকিট কেনার ও পেন কংগ্রেসের ছাপ মারার ব্যবস্থা, চিঠিপত্র বিলি করার জন্যে খুঁজে পাবার জন্যে যার যার নামের লেবেল-আঁটা পায়রার খোপ, চেক ভাঙাবার জন্যে ব্যাঙ্ক, দেশদর্শনের জন্যে জাপান টুরিস্ট ব্যুরোর আফিস, পেন কংগ্রেসের নিজের ব্যুরো, কর্মকর্তাদের ঘর, কেরানীস্থান, ফোটো তোলানোর ফোটো কেনার বন্দোবস্ত, এমনি কত কী! আগন্তুকদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছিল জাপানী ধরনে তুলি দিয়ে। আমি নাম লিখলুম একবার বাংলায়, একবার ইংরেজীতে। কিন্তু বৈঠকে গেলুম না। রাষ্ট্রদূতের ভবনে চা খেতে যাবার আগে আমার হাতে যে সময়টা ছিল সেটা খরচ করতে ইচ্ছা ছিল লোকশিল্প প্রদর্শনীতে। কিন্তু কেউ আমাকে বলতে পারল না কোথায় সেটা হচ্ছে। হচ্ছে আর একটা প্রদর্শনী। সেটা ক্যালিগ্রাফীর। হস্তাক্ষরশিল্পের। হচ্ছে পেন কংগ্রেসের অনুষঙ্গে। পাশের ঘরেই। তখন সেইখানেই ভিড়ে গেলুম।

জাপানীরা প্রধানত লেখে চীনা অক্ষরে। আর চীনা অক্ষর হলো ভাবচিত্র। কয়েক হাজার ভাবচিত্র সবাইকে শিখতে হয়। প্রায় ছবি আঁকার মতো। তার অনেক রকম পদ্ধতি আছে। অনেক রকম ছাঁদ। কেউ ধরে ধরে লেখে। কেউ টান দেয়। কেউ জটিলকে সরল করে আনে। এমনি করে একই ভাবচিত্রের একাধিক রূপ প্রবর্তিত হয়েছে। লেখা মানে তুলির আঁচড়। কত রকম তুলি যে ব্যবহার করা হয়। কত রকম লাইন যে টানা হয়। বৈচিত্র্য নির্ভর করে তুলির গতিবেগের উপর, ঝোঁকের তারতম্যের উপর। ছবির কথা বলেছি। ছবি কিন্তু বস্তুর ছবি নয়। একটি মানুষ এঁকে দিলে মানুষের ভাবচিত্র হবে না। ছবি এখানে মানুষের প্রতীক, মানুষ নামক

একটা আইডিয়ার প্রতীক। লিখছে বা আঁকছে যে সে যেন বিশুদ্ধ রূপের জগতে ফর্মের জগতে বিহার করছে। তার কারবার বিমূর্ত নকশা নিয়ে। জাপানে সুন্দর হাতের লেখাও একটি আর্ট। চিত্রকলার দাসী নয়, স্বসা। কেবল তুলি নয়, কাগজ ও কালি তার উপযুক্ত হওয়া চাই। এর পিছনে রয়েছে দু'হাজার বছরের একটানা সাধনা। বড় বড় সাধক তাঁদের সিদ্ধির পদচিহ্ন রেখে গেছেন। মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উত্তরসাধকরাও অগ্রসর হচ্ছেন।

আমার হাতে সময় অতিপরিমিত। ঘুরে ফিরে দেখলুম বহুসংখ্য উদাহরণ। এক দল নতুন কিছু করতে ব্যগ্র। এঁদের স্কুলকে বা কলমকে বলা হয় "জেন-এই"। আর একটি দল আধুনিক সাহিত্যের বাছা বাছা কবিতা বা গদ্যাংশ নিয়ে কাজ করেন। এঁদের স্কুলকে বলা হয় "শোদো"। চীনা অক্ষরের বদলে জাপানী "কানা" অক্ষর বহু স্থলে প্রচলিত। এক-একটি সিলেবল এক-একটি রেখায় সূচিত। এরও নানা শৈলী। এ ছাড়া ছিল ঐতিহ্যবাহীদের নূতন ও পুরাতন স্কুল বা কলম। এক-একখানি চিত্রপট আপনাতে আপনি সমাপ্ত একটি কবিতা বা গদ্যাংশ বা আইডিয়া বা খেয়াল বা হেঁয়ালি বা নিছক ধোঁয়া। এক জায়গায় দেখলুম নাম দেওয়া হয়েছে "টমাস মান্‌এর শেষ উক্তি"। আমার প্রদর্শিকা তরুণী তার অর্থ কী যে বলেছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না, মুদ্রিত প্রতিরূপ দেখে অধ্যাপক কাসুগাই বলছেন, "আমার চশমা কোথায়?" এই সামান্য কথা ক'টি বোঝাতে এতগুলো আঁচড় লাগল। চোখে আঁধার নামছে এই ভাবটা অবশ্য অসামান্য।

পায়ে হেঁটে না বেড়ালে শহর দেখা হয় না। প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করলুম। শেষে ট্যাক্‌সি নিলুম। তোকিয়োর রাস্তাগুলোর আগে কোনো আধুনিক নাম ছিল না। মার্কিনরা নাম রাখে "এ অ্যাভিনিউ", "বি অ্যাভিনিউ", "সি অ্যাভিনিউ" ইত্যাদি ও তার শাখাপ্রশাখা "ফার্স্ট স্ট্রীট", "সেকেণ্ড স্ট্রীট", "থার্ড স্ট্রীট" প্রভৃতি। মানচিত্রে দেখানো রয়েছে সেসব। কিন্তু কেউ জানে না, কেউ বোঝে না। ট্যাক্‌সিওয়ালাকে মুখে বলা বৃথা। মানচিত্র খুলে দেখাতে হয়। সেইজন্যে কেউ যদি নিমন্ত্রণ করেন তো চিঠির সঙ্গে একখানা ছোট মাপের মানচিত্র পাঠিয়ে দেন। সেটা ট্যাক্‌সিওয়ালাকে দিলে সে দিব্যি পড়তে পারে বা বুঝতে পারে। সামনে

রেখে মোটরের স্টীয়ারিং হুইল ঘোরায়। খটকা বাধলে নেমে গিয়ে পুলিস বক্‌স্‌-এ জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিসের ঘাঁটি এখানকার পথেঘাটে। সঙ্গে যদি মানচিত্র না থাকে তা হলে "এল আভিনিউ" বা "থার্টিয়েথ স্ট্রীট" বিশেষ কাজে লাগবে না। তার চেয়ে কার্যকর হবে সেকেলে ধরনের নাম। প্রথমে বলতে হবে কোন "কু"। তার পরে কোন "চো"। তার পরে কোন "মাচি"। তার পরে কোন "চোমে"। তার পরে কোন নম্বর। সাধারণত নম্বর থাকে না। বর্ণনা দিতে হয় বাড়ির। কাছাকাছি কী আছে তার? এই যেমন আমাদের ভবানীপুরের পদ্মপুকুর বা টালিগঞ্জের নাকতলা বলে তার পর বলতে হয় রাস্তার নাম। কিন্তু মানুষের নাম অনুসারে রাস্তার নাম ওদের দেশে হয় না। তিনি যত বড় মানুষ হোন না কেন। তাই রাস্তার নাম পালটায় না। মার্কিনরাই যা আভিনিউ বা স্ট্রীট নামকরণ করেছে।

শহরের নাম কিন্তু জাপানীরা নিজেরাই বদলেছে। নব্বুই বছর আগে এর নাম ছিল এদো বা য়েদো। রাজধানী যখন কিয়োতো থেকে এখানে উঠে এলো তখন এর নতুন নাম রাখা হলো তোকিয়োতো বা পূর্বদিকের রাজধানী। সংক্ষেপে তোকিয়ো। অবশ্য কিয়োতো কয়েক শ' বছর থেকে সত্যিকার রাজধানী ছিল না। ছিল সম্রাটের বাসস্থান। গবর্নমেণ্ট পড়েছিল শোগুন বা সেনাপতিদের হাতে। তাঁরা থাকতেন এদোতে। এই দ্বৈততন্ত্রের অবসান ঘটল প্রায় নব্বুই বছর আগে, সম্রাট মেইজি যখন শোগুনদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে এদোর দুর্গ থেকে তাঁদের সরিয়ে তাকেই রাজপ্রাসাদ করলেন। যেখানে রাজপ্রাসাদ সেখানে রাজধানী। এবারকার রাজধানী পূর্বদিকে। এমনি করে এদো হলো তোকিয়ো। দিনে দিনে বাড়তে থাকল। বাড়তে বাড়তে এখন যা হয়েছে তা এক অতিকায় নগর। সাত শ' ছেআশি বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে কী কী আছে, শুনুন। তেইশটি ওয়ার্ড, আটটি উপনগর, তিনটি জেলা, সাতটি দ্বীপ। গত পয়লা জানুয়ারিতে এর লোকসংখ্যা ছিল তিরাশি লাখ। এ নাকি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। একজন বললেন, "উঁহু। আপনি জানেন না। ইতিমধ্যে আবার গুনতি হয়েছে। এবার অদ্বিতীয়।"

চুলচেরা হিসাবে তোকিয়োর কেন্দ্র হচ্ছে গিন্‌জা সরণির নিহমবাশি সেতু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোকিয়োর কেন্দ্রস্থল রাজপ্রাসাদ। চার দিকে পরিখা।

তাতে হাঁস সাঁতার কাটে। মাঝে মাঝে পুল। পরিখার ওপারে প্রাচীর ও বনানী। তারই অভ্যন্তরে কয়েকটি বাড়ি। শুনেছি আসল বাড়িটি ভেঙে গেছে যুদ্ধের সময়। প্রজাদের অবস্থা ভালো না হলে সম্রাট নতুন বাড়ি বানাতে দেবেন না। তবে পশ্চিমে বাস্তুশিল্পী পাঠানো হয়েছে। তাঁরা পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত দেখছেন। ফিরে এসে তাঁদের পরিকল্পনা পেশ করবেন। পরিখার এপারে ময়দান ও রাজপথ। পূব থেকে উত্তরে গিয়ে শিন্তোদের য়াসুকুনি পীঠস্থান ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে গেলে তাকাতানোবাবা রেলস্টেশনের একটু এদিকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাসগৃহ।

বহু দিন পরে বহু দূর দেশে দেখা। চন্দ্রশেখর ও তাঁর সহধর্মিণী লক্ষ্মীদেবী আমাকে চা খেতে বললেন। গল্প আর ফুরায় না। ওদিকে চিন্‌জান্‌সোতে জাপান পেন ক্লাবের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক পেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা। সময় উত্তীর্ণপ্রায়। একদিন দুপুরে নানা দেশের লেখকলেখিকাদের বাছা বাছা জনকয়েকের নামে লাঞ্চের নিমন্ত্রণলিপি পাঠাতে চন্দ্রশেখরের বাসনা। যাতে ভারতীয়দের সঙ্গে অভারতীয়দের মেলামেশা সুগম হয়। তিনি একটা তালিকা এরই মধ্যে করে রেখেছিলেন। আমি তাতে আরো দু'একটি বিদেশী নাম জুড়ে দিই। কিন্তু পাকিস্তানীদের ডাকতে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। বিশ্বের সকলেই আমাদের মিত্র। অমিত্র কেবল পাকিস্তান। ঘরে বাইরে স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে সর্বত্র তার সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিবিরোধ। ভাগ্যিস্ আমি ইম্পিরিয়াল হোটেলে উঠেছি। নইলে পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমার সেটুকুও ঘনিষ্ঠতা হতো না।

চিন্‌জান্‌সোতে পৌঁছে দেখি বাইরে গাড়ীর ভিড়, ভিতরে মানুষের। শ'দুই জাপানী ও শ'দেড়েক বিদেশী লেখকলেখিকা প্লেট হাতে চলমান দণ্ডায়মান বকবকায়মান। বুকে আঁটা ব্যাজ দেখে চিনে নিতে হয় ইনি কিনি। কোন দেশবাসী বা বাসিনী। আগের দিন জাপানী সরাইখানায় যাঁদের দেখেছিলুম তাঁরা তো ছিলেনই, ইতিমধ্যে সমাগত যাঁরা তাঁরাও আজকের এই মিলনদিনে অনুপস্থিত থাকেননি। পেন কংগ্রেসের অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে এমনি কয়েকটি মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। কোনোটি মধ্যাহ্নে, কোনোটি সন্ধ্যায়, কোনোটি রাত্রে। সেদিন লেখকলেখিকার জনতায় আমি হারিয়ে গেলুম। কেউ একদিনের পুরোনো আলাপী, কেউ হালফিল নতুন।

লক্ষ করলুম এখানেও সেই একই পরিবেশিকার দল। গেইশা। চিন্‌জান্‌সোর নিজের ওয়েটার ওয়েট্রেস নয়। বোধ হয় তাদের সংখ্যা প্রয়োজনের অনুপাতে কম। কিংবা এমনও হতে পারে যে তাদের তেমন শিক্ষাদীক্ষা ভব্যতা বা হ্লাদিনীশক্তি নেই। গেইশাদের অল্পবয়স থেকে কঠোর ট্রেনিং দেওয়া হয়। পার্টিকে প্রাণবন্ত করতে তারা প্রাণপণ সাধনা করে। তাদের হাবভাবে আমি কুরুচির বা যৌন আবেদনের নামগন্ধ পাইনি। তাদেরও একটা মহত্ত্ব বা ডিগনিটি আছে। আগের দিনের সেই সামিসেনবাদিনীর প্রতি সেদিন আমার অন্তরে উদয় হলো শ্রদ্ধা ও কারুণ্য। আমি কে যে আমি ওদের দোষ ধরব! বেশ্যা কি সাধ করে কেউ হয়! হলে ক'জন হয়! হয় প্রাণের দায়ে। হতে বাধ্য হয়। অনেক সময় গুরুজনের নির্বন্ধে। বাল্যবিবাহিতার মতো বাল-বেশ্যারও স্বাধীনতা নেই। জাপানে তো বাপকাকারাই বেচে দেয় বা দিত। ঘৃণা যদি করতে হয় বিক্রেতাদের করব, ক্রেতাদের করব, কিন্তু ক্রীতদের নয়। গান গেয়ে বা সামিসেন বাজিয়ে বা পরিবেশন করে যে অর্থাগম হয় তাকে পাপের উপার্জন বলতে পারিনে। বরং এই উপার্জন না থাকলে ওই উপার্জন আবশ্যক হয়। তা ছাড়া দেশের নৃত্যকলা সঙ্গীতকলা এতদিন বাঁচিয়ে রাখার ভার তো এই কলাবতীরাই বহন করেছে। আমাদের বাঈজীদের মতো।

আমার পূর্বদিনের বিরক্তি এমনি করে ক্ষীণ হয়ে এলো। তা সত্ত্বেও মনটা বিগড়ে রইল। পেন কংগ্রেসের পার্টিতেও গেইশা! জাপান পেন ক্লাবও কি প্রথার অনুসরণ করবে গড্ডলিকার মতো? না নতুন প্রথা প্রবর্তন করবে? পশ্চিমের দৃষ্টান্ত দেখে। পার্টি তো পশ্চিমেও হয়। পেন কংগ্রেসের ঐতিহ্য মেনে চলা কি জাপানে বা এশিয়ায় অসম্ভব? এই প্রথম এশিয়ার মাটিতে পেন কংগ্রেস বসছে। সব রকমে নিখুঁৎ হওয়া চাই। জাপানীরা এ বিষয়ে সজ্ঞান। আমরাও। তা হলে এইটুকু খুঁৎ থেকে যায় কেন? পরে এ রকম পার্টি আরো দেখেছি। ইহাই নিয়ম। জাপানী মন এর মধ্যে অন্যায় বা অশোভন কিছু পায় না। পঞ্চাশ বছর আগে ভারতীয় মনও পেত না। বাঈজী না হলে আমাদের অভিজাতদের পার্টি জমত না। বিবাহ ইত্যাদিতে বাঈনাচ দেখতে ইতরভদ্র সবাই ছুটত। ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে এক কদম বেশী এগিয়েছে। সংস্কৃত বা ফার্সী শিক্ষিত হলে মনোভাব জাপানের অনুরূপ হতো। সংস্কৃত সাহিত্যের বসন্তসেনা এরা। এরা না থাকলে সংস্কৃতি

অপূর্ণ থাকে। জাপানী সাহিত্যে সঙ্গীতে নৃত্যকলায় চিত্রকলায় গেইশা না থাকলে নয়। আধুনিক পুরনারী যতদিন না কলাবিদ্যার ভার নিচ্ছে ততদিন এদের কাজ আছে।

চিন্‌জান্‌সোতে ঢুকতেই দেখি পাশাপাশি তিন জন দাঁড়িয়ে। আবার বেরোবার সময় দেখি তাঁরাই। পর পর করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে। জাপান পেন ক্লাবের সভাপতি য়াস্থনারি কাওয়াবাতা। সহসভাপতি স্থএকিচি আওনো। অপর সহসভাপতি কোজিরো সেরিসাওয়া। সমসাময়িক জাপানী সাহিত্যের তিন দিকপাল। আশা করেছিলুম সানেআৎস্থ মুশানোকোজি, নাওইয়া শিগা, জুন্‌ইচিরো তানিজাকি ও হারুও সাতোকেও দেখতে পাব। কিন্তু হারুও সাতো পেন ক্লাবের সভ্য নন। অন্য ক'জন সভ্য হলেও কেন জানিনে যোগ দেননি। কোনো দিন না। আমরা কত দূর দেশ থেকে এঁদের দেখতে এসেছি আর এঁরা তোকিওতে বা কাছাকাছি থাকলেও আসবেন না, এটা বিস্ময়কর ও দুঃখকর। তবে দেশে বসেই শুনেছিলুম যে জাপানে পেন কংগ্রেস ডাকা নিয়ে অনেক সাহিত্যিকের অমত ছিল। তাঁদের মতে সময় হয়নি। কিন্তু অধিকাংশের মত ছিল। তাঁরা অধিবেশনের সাফল্যের জন্যে প্রাণপাত করেছেন। তিন দিক্‌পালের সঙ্গে নাম করতে হয় সাধারণ সম্পাদিকা য়োকো মাৎস্থওকার। অর্গানাইজ করতে এঁর জুড়ি নেই। কী জাপানে কী ভারতে।

এহিমে মাৎস্থয়ামা-হিমে-দারুমা

॥ চার ॥

একবার কল্পনা করুন দৃশ্যটা। ভোর হলো, সবাই এক এক করে জাগল, যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ল। উঠল না কেবল একজন। সে তার ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে শুতে গেছে। ঘরে আলো ঢোকে না। তাই ভাবছে এখনো রাত আছে। আর একটু ঘুমোনো যাক। এমন সময় টেলিফোন ঝঙ্কার দিল। আঃ! দিল মাটি করে ঘুমটা।

কিন্তু যার কথা বলছি সে আমি হলেও আমি এখানে প্রতীক। লোকটার নাম জাপান। আধুনিক যুগ শুরু হয়ে গেছে কোন প্রত্যুষে। এক এক করে ঘটে গেল ইটালীর রেনেসাঁস, জার্মানীর রেফরমেশন, ইংলণ্ডের রাজায় প্রজায় যুদ্ধ, আমেরিকা বলে এক জোড়া মহাদেশ আবিষ্কার ও তাতে উপনিবেশ স্থাপন, সেখানেও রাজায় প্রজায় যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, শিল্পবিপ্লব, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, নিউটন থেকে ডারউইন, সাহিত্যের যুগযুগান্তর, চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর, দর্শনে ঈশ্বরবাদ থেকে মানববাদ। এমনি করে এলো উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। জাপান তখনো কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে। টেলিফোন বেজে উঠল কমোডোর পেরির জাহাজের গর্জনে।

তার পর ঘটনার স্রোত জলপ্রপাতের মতো লাফিয়ে চলল। জাপান সংকল্প করল আধুনিক হবে। চার শতাব্দীর পথ সে চার দশকে অতিক্রম করল। রুশজাপানী যুদ্ধে সে দুনিয়াকে দেখিয়ে দিল যে আধুনিকতার দৌড়ে সে রুশকেও ছাড়িয়ে গেছে। আরো তিন দশক পরে সে তিন মহাশক্তির অন্যতম হলো। তার সামনে রইল দুটিমাত্র ঘোড়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন। আর এক দশক পরে তাকে ঘায়েল করতে পরমাণু বোমার সাহায্য নিতে হলো। ঘটনাচক্রে সেটা মার্কিনরা উদ্ভাবন করেছিল। জাপানীরা করে থাকলে কী ঘটত তা ভাববার কথা। কেননা সে বিষয়ে তাদের বিবেকের বাধা ছিল না।

যুদ্ধশেষের পর আরো এক দশক কেটে গেছে। ইতিমধ্যেই জাপানের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এত সত্বর আরোগ্য একমাত্র পশ্চিম জার্মানীর বেলা সম্ভব হয়েছে। ফ্রান্সের বেলা ইটালীর বেলা হয়নি। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীর পরে জাপানেরই নাম করতে

হয় আজকের দুনিয়ায়। তবে নব্য চীন এখন জাপানের চেয়েও দ্রুত বেগে ধাবমান। ভবিষ্যতে হাইড্রোজেন বোমা ও রকেট পড়ে কার কী দশা হয় কে জানে। জাপান কিন্তু যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে না। সে যুদ্ধ চায়ও না। জনমত যুদ্ধবিরোধী। এটা সুলক্ষণ। পরমাণু বোমা পড়ে এইটুকু মঙ্গল হয়েছে যে যুদ্ধজ্বর সেরে গেছে। চিরতরে না হোক, বহুকাল তরে।

কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রা দিলে কুম্ভকর্ণের মতো খিদে পাবেই। জাগৃতির পর জাপানের ক্ষুধা কেবল সাম্রাজ্যের বা শক্তির ক্ষুধা ছিল না। ছিল জ্ঞানেরও। প্রগতিরও। ইউরোপের দিকে আড়াই'শ বছর মুখ ফিরিয়ে থাকার পর ইউরোপকেই সে গুরু করল। ইংরেজী ফরাসী জার্মান ইটালিয়ান রাশিয়ান ভাষা শিখে সে-সব সাহিত্য থেকে সরাসরি তর্জমা করল রাশি রাশি গ্রন্থ। যা আমরাও করিনি। শুধু গল্প উপন্যাস নয়, কাব্য নাটক প্রবন্ধ ধর্মতত্ত্ব দর্শন বিজ্ঞান কলাবিধি যেখানে যা কিছু মূল্যবান মনে হলো। জাপানীরা বইয়ের পোকা। কেউ নিরক্ষর নয়, কিনে পড়ার অভ্যাস আছে বাড়ীর ঝি'রও। জাপানী বই লাখো লাখো বিক্রী হয়। এই তো সম্প্রতি একটি মেয়ে একখানি উপন্যাস লিখেছে। এরই মধ্যে ছ'লাখ কেটেছে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা স্তাঁদাল মোপাসাঁ টলস্টয় ডস্টইয়েভ্স্কি এখন জাপানী ভাষার ক্লাসিক হয়ে গেছে। খুব কম জাপানী বইয়ের জনপ্রিয়তা এসব ক্লাসিকের চেয়ে বেশী।

অতি দীর্ঘকাল বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা জাপানের ভাগ্যে যেমন ঘটেছে তেমন চীনের বা ভারতের ভাগ্যেও নয়। এই যে আইসোলেশন এর প্রভাব মানুষের মনের উপরও পড়েছে। একটি নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে থাকতে কারই বা ভালো লাগে! জাপান তাই চায় নিজের খোলার বাইরে আসতে। দুনিয়ার সঙ্গে মিশতে। নিতে আর দিতে। এই আকাঙ্ক্ষা থেকে এলো জাপানের মাটিতে পেন কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা। উদ্বোধনের দিন সাঙ্কেই হলে প্রতিনিধি ও দর্শকের লোকারণ্য। কাওয়াবাতা তাঁর অভ্যর্থনা-ভাষণে গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন যে পৃথিবীর এতগুলি দেশের এত জন সাহিত্যিকের এক ঘরে মেলা হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে জাপানে বা আর কোনো প্রাচ্য দেশে আর কখনো হয়নি। আমারও মনে হচ্ছিল যে একটি ছাদের তলে একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি মানব পরিবারকে। যেন একটি

ছোটখাটো ইউনাইটেড নেশনস। সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এই অধিবেশনে ইউনেস্কোরও সাহচর্য ছিল। পরে যে সিম্পোজিয়ম হলো সেটার আয়োজক পেন তথা ইউনেস্কো।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক সাহিত্যিকের আসার কথা ছিল। আসা হয়নি। তাই দেখতে পাওয়া গেল না মোরিয়াক বা মোরোয়া বা সিলোনে বা রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়া' ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে। আসতে পেরেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন আঁদ্রে শাঁসঁ, জন স্টাইনবেক, জন ডস পাসস্, এলমার রাইস, আলবের্তো মোরাভিয়া, স্টীফেন স্পেণ্ডার, জাঁ গেনো। শেষের জন রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ও রম্যাঁ রলাঁর বন্ধু। আর ছিলেন হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ। ভারতবন্ধু। আমার পুত্রের শিক্ষাগুরু। টিউবিঙ্গেনের অধ্যাপক। স্টাইনবেক তো সেই একদিন দেখা দিয়েই অদর্শন হলেন। তাঁরই ভক্ত সংখ্যা সব চেয়ে বেশী।

উদ্বোধনের দিনটিতে "ভারত", "পাকিস্তান", "ইটালী", "ফ্রান্স" প্রভৃতি নামাঙ্কিত বিভিন্ন ভুক্তি ছিল না। আমরা যে যার খুশিমতো যেখানে সেখানে বসেছিলুম। একজনের খুশির সঙ্গে আরেকজনের খুশি মিলতে মিলতে এমন হলো যে পাশাপাশি আসন নিলুম সৈয়দ আলী আহ্সান, কুরাতুলাইন হায়দর, কমলা ডোঙ্গরকেরী ও আমি। আমার পাশে জম্বুনাথন। পাকিস্তান ও ভারত একাকার হয়ে গেল। ওই একটি দিনের জন্যে। সোমবার দোসরা সেপ্টেম্বর আমার কাছে এই একটি কারণে স্মরণীয়। ভারতে যা সম্ভব হলো না, পাকিস্তানে যা সম্ভব হলো না, জাপানে তা সম্ভব হলো। কুরাতুলাইন হায়দর আমাকে তাঁর একখানি বই পড়তে দিয়েছিলেন পরে একদিন। দেশবিভাগের দুঃখ তার অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত। সমস্যার সমাধানটা কী হলো, শুনবেন? হিন্দু-মুসলমান বন্ধুবান্ধবীরা ভারত ছেড়ে পাকিস্তান ছেড়ে মিলিত হলেন গিয়ে লণ্ডনে। ইংরেজকে তাড়াতে গিয়ে নিজেরাই তাড়িত হলেন ইংরেজের বিবরে। মিলনের আর কোনো ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু সুখী তাঁরা কেউ নন। প্রত্যেকেই অসুখী। সে অসুখ যে সারবে তারও কোনো অঙ্গীকার নেই। বিষাদ। কালিমা। অন্তহীন নৈরাশ্য।

শুনছিলুম কাওয়াবাতার পর ফুজিয়ামার ভাষণ, তার পর আঁদ্রে শাঁসঁর

অভিভাষণ। ফুজিয়ামা মহোদয় হলেন জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। ইংরেজী বলেন চমৎকার। পোশাকে ও চালচলনে মার্কিন বা ইংরেজের মতো। যেন তাদেরই একজন! দেখতেও ভালো। তাঁর নিজের একটি চিত্রসংগ্রহ আছে। কলারসিক। সারস্বত না হলেও সরস্বতীর একজন ভক্ত। গুণী না হলেও গুণগ্রাহী। আর আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতির ছবি আঁকা নাকি তাঁর হবি।

একটা নতুন কথা শোনালেন ফুজিয়ামা মহোদয়। স্থকিয়াকি ও তেম্পুরা জাপানীদের প্রিয় ব্যঞ্জন। সকলে জানে জাপানের বিশেষত্ব। কিন্তু আসলে তা নয়। পাশ্চাত্য ব্যঞ্জনের জাপানী প্রতিযোজন। জাপানীরা আধুনিক ইউরোপের কাছে আমেরিকার কাছে বিজ্ঞানের চূড়ান্ত শিখেছে, শিল্পেরও চরম দেখেছে, পোশাক তো নিয়েছেই, খানাপিনাও নিয়েছে, নিয়ে বদলে দিয়েছে। তবে এ কথাও বললেন ফুজিয়ামা যে পশ্চিমারাও জাপানীদের কাছ থেকে নিতে কসুর করেনি। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইউরোপীয় ইম্‌প্রেশনিস্ট চিত্রীরা জাপানী উডব্লক চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত। আর আজকের দিনের পাশ্চাত্য বাস্তুশিল্পের ভিতর জাপানের চা-পানকক্ষের ও কিয়োতোর কাৎসুরা প্রাসাদের লাবণ্য প্রবেশ করেছে। পরে একজন মার্কিন প্রধানের কাছে এই ধরনের কথা শুনেছি। জাপান কেবল নিচ্ছে না, দিচ্ছেও। তার পর ফুজিয়ামা মহোদয় এ কথাও বললেন যে তাঁর আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতির চিত্রের গভীর তলদেশে এমন কিছু লুকোনো আছে যা নির্ভুল জাপানী।

পেন কংগ্রেস যদিও লেখকদের সংগঠন তবু অন্যান্য বছর দেখা গেছে লেখকদের যত মাথাব্যথা রাজনীতি নিয়ে। এবারকার অধিবেশনেও রাজনীতির ছায়া পড়েছিল। ইউরোপ আমেরিকা থেকে অনেক কষ্ট করে অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন নির্বাসিত হাঙ্গেরিয়ান লেখকপ্রতিনিধিরা। কোনো সন্দেহ নেই যে হাঙ্গেরীতে লেখকের স্বাধীনতার দীপ নিবে গেছে। কিন্তু ভিন দেশের লেখকেরা কেমন করে সে দীপ জ্বালাবেন বা জ্বালাতে সাহায্য করবেন, যদি গোড়া থেকেই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান? নিজেদের সঙ্ঘকে দ্বিখণ্ডিত করে সোভিয়েটের যাত্রাভঙ্গ করাই কি হাঙ্গেরীতে দীপ জ্বালানোর প্রকৃষ্ট উপায়? শাসঁ তাঁর অভিভাষণে হাঙ্গেরীর উল্লেখ না

করে সাধারণভাবে মূলনীতি ব্যাখ্যান করলেন। ফরাসী থেকে এক দফা ইংরেজী হয়েছে, তার থেকে বাংলা করলে জোর থাকবে না। তাই ইংরেজী থেকে তুলে দিচ্ছি কয়েকটি অংশ। বলা বাহুল্য এ ইংরেজী অনুবাদকের কাঁচা হাতের ইংরেজী।

"We all know that in this world which has been at the mercy of disorder and injustice nothing is easier than opposing one another. We all know the questions tending to separate us in two camps, making us deaf and blind. It is for this reason that I want to affirm, above all, that we have not made such a long journey, that we have not crossed so many skies and that we have not come to your islands so full of human virtues that we can learn here what divides us. We are not here to solve political problems on which we shall never come to agreement and which is not our field of activity, but to render service to those human values which are our common heritage, even when we are separated from one another by the confusion of events and by the political structure, by ideologies and by myths..... .. The President of the P. E. N. ought not to behave like a man of politics—a man of politics devoid of all powers who is destined to serve those who are truly powerful, but he ought to behave as a writer.......I did my best only to be a w·iter who represents the writers of all parts of the world and I have never taken any particular position toward various events except when the liberty and even the life of some of our collegues seemed to be in danger. ......The liberty of spirit is an eternal conquest. It is not within our capacity to maintain this against all the dangers, but we nevertheless have the duty to protest each time certain people among us are exposed to danger merely because of their saying what they believe just. It is the menace of the sword which indicates the moment for us to be up and in action....We should, in fact, be capable of maintaining our unity and maintaining this unity, we may have to accomplish certain duties......" (André Chamson)

লেখনীর প্রতাপ নাকি খড়্গের চেয়ে জোরালো। তাই যদি হবে তবে লেখকরা তো কলম দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারতেন, তাঁদের একদলকে দেশ

ছেড়ে দৌড় দিতে হতো না, আরেক দলকে জেলখানায় পচতে হতো না, কয়েকজনের প্রাণদণ্ড হতো না। তা হয় না বলেই আন্তর্জাতিক লেখক সঙ্ঘের কণ্ঠক্ষেপের প্রয়োজন হয়। এবং এই কণ্ঠক্ষেপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়। তার প্রমাণ আমাদের অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছেন ইন্দোনেশিয়ার কারাগার থেকে সদ্যমুক্ত সুতান তাকদির আলীশাবানা। আমরা কোনো কোনো লেখকের প্রাণদণ্ড মকুব করাতে সমর্থ হয়েছিও। এইপর্যন্ত আমাদের সাধ্যের সীমা। এ সীমা লঙ্ঘন করতে গেলে ওজন হারাব। আর এইপর্যন্ত যে সাধ্যে কুলিয়েছে এটা আমাদের সংগঠনের ঐক্যের গুণে, প্রতিপত্তির গুণে। সংগঠন যদি দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়, এক শিবির যদি অপর শিবিরকে বিতাড়ন করে তবে আমাদের পক্ষে বলা কঠিন হবে যে আমরা বিশ্বের লেখক, আমাদের কণ্ঠস্বর বিশ্বের কণ্ঠস্বর।

শাঁসঁ এসব কথা বেশ স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, তাই অপরাহ্ণের সিদ্ধান্তটা প্রাজ্ঞের মতো হলো। কিন্তু এই সভাপতি যদি ইউরোপের তপ্ত আবহাওয়ায় এসব তত্ত্ব বপন করতেন সেটা হতো বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো। বেশীর ভাগ লেখকই আসতেন ঘরের কাছ থেকে। দূরে আসার দুঃখ পোহাতে হতো না বলে দায়িত্ববোধটাও ঢের কম হতো। সুতরাং সভাপতিকে সাহায্য করেছে সভার দূরত্ব। জাপান আমাদের আহ্বান করে আমাদের সংহতি রক্ষা করেছে। আমরা রাজনীতির বি-টীম নই। আমরা সাহিত্যের এ-টীম। আমরা যদি নিজেদের স্বাধীনতা রাজনীতিকদের পায়ে বিকিয়ে না দিই তা হলে আমাদের সমানধর্মাদের স্বাধীনতার জন্যে এ-টীমের খেলোয়াড়ের মতো খেলতে পারব। লেখকেরা আপনাদের মর্যাদা রেখেছেন। এটা শুভ।

দুপুরে জাপান পেন ক্লাবের নিমন্ত্রণে ইণ্ডাসট্রিয়াল ক্লাবে লাঞ্চ। জীবনে কখনো আইসল্যাণ্ডের লোক দেখিনি। আমার বাঁ পাশে জলজ্যান্ত আইসল্যাণ্ডের মানুষ। টোমাস গুডমুণ্ডসন। ভদ্রলোক খেতে খেতে হঠাৎ উঠে গেলেন। আর ফিরলেন না। পরে আবার দেখা হয়েছিল। বললেন সারা রাত ঘুম হয়নি, তাই অসুস্থ বোধ করছিলেন। এক ট্যাক্সিতে যেতে যেতে আইসল্যাণ্ড সম্বন্ধে কথাবার্তা হলো। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বিবেকানন্দ এঁদের রচনা ওদেশের লোক পড়ে। ওদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীর দৃষ্টান্ত ওদের প্রেরণা জুগিয়েছে। কোথায় ভারত আর কোথায় আইসল্যাণ্ড! এক

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অপর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়ক হলো গান্ধীজীর কল্যাণে। পরের দিন কোকুসাই হলের সিম্পোজিয়মে দেখলুম "আইসল্যাণ্ড"এর পাশেই "ইণ্ডিয়া।"

সন্ধ্যায় আবার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাবে নিমন্ত্রণ। এবারকার নিমন্ত্রক সস্ত্রীক পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আইইচিরো ফুজিয়ামা ও মিসেস ফুজিয়ামা। প্রধান মন্ত্রী কিশি স্বয়ং অলঙ্কৃত করেছিলেন। নানা দেশের রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের সহধর্মিণীরাও শোভাবর্ধন করেছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে টেবল থেকে তুলে নিয়ে পানভোজন। সান্ধ্য পার্টি, অথচ গেইশা নেই। মহিলাদের সংখ্যা অধিক। তাঁদের কারো কারো স্বামী জাপানের রাষ্ট্রদূত বা কনসাল হয়ে ইউরোপ আমেরিকায় কাজ করেছেন, তাই তাঁদেরও সেসব দেশে বাস করা হয়েছে। হয়েছে উচ্চতর সমাজে চলাফেরা। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে আলাপ হলো। আর হলো খোদ ফুজিয়ামার সঙ্গে। আকৃতি আর প্রকৃতি দুই অতি যত্নে মার্জিত।

মঙ্গলবার সিম্পোজিয়ম শুরু। এবারকার অধিবেশনের প্রধান অবলম্বন একালের ও ভাবীকালের লেখকদের উপরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের পারস্পরিক প্রভাব। জীবনধারায় তথা নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যনির্ণয়ে। ইউনেস্কো থেকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে বহু বিশেষজ্ঞ নানা দেশ থেকে সমাগত হয়েছিলেন। সকালবেলাটা দেওয়া হলো তাঁদের কয়েকজনকে। কিছু না কিছু ভাববার কথা প্রত্যেকের ভাষণে ছিল। লক্ষ করে আনন্দিত হলুম যে আমাদের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সকলের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। কিন্তু পোল্যাণ্ডের আণ্টনি স্লোনিম্স্কি (Antoni Slonimski) যেমন দাগ কাটলেন তেমন আর কেউ নয়। গভীর বেদনা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত যে উক্তি তার কি কোনো তুলনা হয়! বলতে বলতে তিনি এক-সময় আত্মহারা হয়ে যা বলে বসলেন তার জন্যে হয়তো দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে দণ্ড পেতে হবে। আর কেইবা নিয়েছে এমন ঝুঁকি! তিনি বললেন,

"The Communism of the Stalin era created many myths. Recent times have seen life itself, and personal freedom, dependent on the sentence of a powerful deity and on the whim of a galaxy of vindictive demons. We have no certainty that the era will not be repeated. How, then, shall we give battle to such

resurgent demons ? Apt here is the well-known answer of Confucius to disciples who questioned him concerning the roles of deities and demons : "Have as little to do with them as possible. First study how you may live with your fellow men in peace, justice and love." When asked what he would do first *for the people, he replied, "feed* and *enrich them"* ; what *next, he replied, "educate them." This rationalistic programme,* which exercised an important influence on eighteenth century Europe, is today acquiring a new actuality. On whether victory goes to the old deities and demons of totalitarianism, or to free, rationalistic human thought, depends not only the immediate fate of many Chinese and Polish intellectuals—but also the future of the ideology of socialist humanism." (Antoni Slonimski)

সেই দিন বিকেলে আমার পালা। সে সময় সভা দু' ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগের আলোচ্য জীবনধারা। অপর ভাগের বিবেচ্য নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য। আমি বেছে নিয়েছিলুম জীবনধারা। লিখে নিয়ে গেছলুম ইংরেজীতে। মনে মনে আশঙ্কা ছিল আন্তর্জাতিক লেখকদের সভায় যদি সপ্রতিভভাবে বলতে না পারি, যদি কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলি, যদি আসল বক্তব্য ভুলে যাই, যদি লাজে ভয়ে হতবাক্ হই তা হলে হংসোমধ্যে বকোযথা হয়ে মুখ দেখাব কী করে! পরে শুনলুম সভাপতির আসন থেকে সোফিয়াদি বলছেন, অবিকল ভারতের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। স্বস্থানে ফিরে যেতেই কমলাবোন বললেন, বাচন ত্রুটিহীন হয়েছে। বাংলা না করে ইংরেজী থেকেই তুলে দিচ্ছি কয়েকটি পংক্তি।

"We found it impossible to reject the Gandhian way. We also found it impossible to reject the modern or, for that matter, the western. Did this mean that we accepted what we could not reject ? That was also impossible. For one thing we were disenchanted with the modern West, disillusioned after World War I, sickened after World War II. For another we were not sure that in following the Gandhian way we would not undo a century and half of evolution and return to the Middle Ages. There are wild men in India who care nothing for Non-violence and Truth and whose one object is to restore the good old

days of the privileged castes of India. Modernisation is therefore a stern necessity and it must be carried out with a firm hand. But the means towards this end should not be unfair or evil. Enforced modernisation cannot lead to a flowering of the spirit...We are passing through much inner travail. We have the feeling that in the process of modernisation we are moving further and further not only from our enemy, medievalism, but also from our friend, Gandhism... Great masses of men have been enfranchised. If they, in their impatience, throw to the winds their traditional reverence for life and respect for truth, ceasing to distinguish between right and wrong, their country's modernisation will only land it in greater disaster. Their rulers should be well-advised to guard against disaster by ruling out violent and untruthful means. On the other hand there should be no undue delay in the evolution of the country. Rapid evolution is the only substitute for revolution. While we must not lose our soul for the world we should not lose the world for the sake of the soul. For a disinherited people long exploited by foreign and indigenous elements this is also necessary. I have tried to give a picture of what is in the mind of the writers of India at the present day. A struggle is in progress in that mind between the modern, the traditional and the Gandhian ways of life. A satisfactory *modus vivendi* may be worked out some day but what we have today is an unreal compromise not worthy of serious scrutiny. There can be no great art or literature unless a solid foundation is laid in truth and love ...India's age-old preoccupation with the eternal verities, with the first and the last things, will never take a secondary place or fade away. The best that is in her is permanently attuned to these verities ...The inherent contradictions between the modern way and the Gandhian way will increasingly come to the fore. Writers will perhaps be forced to make a choice between the two and it will be an agonising choice to make either way. Western writers have no such agony ahead of them. Here we have to carry the masses with us one way or the other or become completely inconsequential."

(Annada Sankar Ray)

এবার আমার ঘাড় থেকে বোঝা নেমে গেল। আমি হালকা বোধ করতে থাকলুম। কখন এক সময় উঠে গেলুম বাইরে গলাটা ভিজিয়ে নিতে। কফি কি চা দিয়ে। আড্ডা জমানোর জন্যে সেখানে কোনো সময় লোকের অভাব হতো না। নানা দেশের লেখক। জাপানী দর্শনার্থী। অটোগ্রাফ-প্রার্থী। ফোটোগ্রাফগ্রহণেচ্ছু।

আমার নাম লেখা পায়রার খোপে হাত দিয়ে দেখি একতাড়া কাগজপত্র। পুস্তিকা। চিত্র। প্রায়ই এ রকম থাকে। কেবল পেন কংগ্রেসের নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দেওয়া। হোটেলেও আমার ঘরে পড়ে থাকে এমনি কত রকম উপহার। ফুলের তোড়া, প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ, ক্যালপিস নামক পানীয়, গল্পের বই, কবিতার বই, প্রবন্ধের বই। কোথায় যে রাখব এসব। টেবল চেয়ার যে ভরে উঠল। স্ত্রী সঙ্গে নেই, তবু তাঁর জন্যেও একটি শয্যা ছিল। সেটিও বইপত্রের বাহন হলো।

সন্ধ্যাবেলা ব্রিটিশ কাউন্সিলে ককটেল পার্টি। ডক্টর ফিলিপ্‌সের নিমন্ত্রণ। ভাবলুম শেরোয়ানি পায়জামা পরে যাওয়া যাক। জাপানীর কাছে আমি পাশ্চাত্য সাজতে পারি, ইংরেজের কাছে আমি প্রাচ্য। পায়জামা পরতে গিয়ে দেখি ফিতে নেই। যাঁর উপর গোছানোর ভার ছিল তিনি পরখ করেননি কোমরে জড়ানোর ফিতে আছে কি না। চুড়িদার পায়জামা। পরতেও কষ্ট খুলতেও কষ্ট। সময় নেই যে দ্বিতীয়বার কষ্ট করব। চললুম তাই পরে, একটা সেফটিপিন এঁটে, সামলাতে সামলাতে। দুই হাতে পায়জামা আঁকড়ে ধরে পার্টিতে খাবার হাতে নেবার জন্যে তৃতীয় একখানা হাত পাই কোথায়? চতুর্থ হাতেরও দরকার হলো পানীয় যখন এল। না, না, কক্‌টেল নয়। রামচন্দ্র! আমার দৌড় ঐ কমলালেবু বা পাতিলেবুর শরবত অবধি। বড়জোর বিলিতী বেগুনের রস। যা বলছিলুম। অবস্থাটা সোফিয়াদিকে খুলে বলতে হলো। আর একটা সেফটিপিন তাঁর কাছেও ছিল না। দিলেন কুরাতুলাইন হায়দর।

কক্‌টেল পার্টিতে ভারতফেরতা ইংরেজদের সঙ্গে জমে গেল। জাপানে তাঁরা খুব সুখী নন। ইংরেজের সে প্রতিপত্তি আর নেই। লক্ষ করেছি পেন কংগ্রেসের ইংরেজ প্রতিনিধিদের দিকে কেউ বড় একটা ঘেঁষে না। তাঁদের চেয়ে মার্কিনদের ও ফরাসীদের ঘিরে ভিড় বেশী। এর কারণ কি

জাপানীদের প্রতিবাদসত্ত্বেও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষণ? আমাদের আসার আগে এই নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসেছিল জাপানে। তাতে ভারত নিয়েছিল জাপানের পক্ষ। জাপানীরা এর জন্যে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার পাত্র হলুম আমরাও। কিন্তু ইংরেজ বেচারাদের চেহারা যতবার দেখেছি ততবার মনে হয়েছে জাপানে তাঁরা ভিজেবেড়াল।

রাত্রে ভারতীয় দূতাবাসের হেজমাডি আমাদের কর্ণাটী খানা খাওয়ালেন। আমাদের মানে আমাদের তিনজনকে। সোফিয়াদি, কমলাবোন ও আমি তাঁদের ম্যানেজার মিলে তিন।

য়ামানাশি কোফু-দারুমা

॥ পাঁচ ॥

স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ পিতৃনামা চ মধ্যমঃ। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর টিউবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেলমুট ফন গ্লাসেনাপ (Helmuth von Glasenapp) মহাশয়কে যখন পরিচয় দিলুম তখন আমি পুত্রনামাঃ। ফুজিয়ামার পার্টিতে তিনি পার্শ্ববর্তী অন্য একজন জার্মানকে অধমের সম্বন্ধে রসিকতা করে বললেন, "এঁর ছেলে আমার ছাত্র। এঁকে কিন্তু ওর দাদার মতো দেখায়।"

বুধবার প্রাচ্য পাশ্চাত্য সিম্পোজিয়মের জের টানা হলো। আরম্ভ করলেন ফন গ্লাসেনাপ। যা বলে আরম্ভ করলেন তা আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো।

"India has lavished the treasures of her literature on all the countries of Southern and Eastern Asia. From Siberia to Indonesia and from Afghanistan to Japan, Buddhist missionaries have spread the knowledge of the sacred writings of their faith. And, together with Buddhist legends and poems, they have made known to the Eastern world Hindu thought and Hindu art, so that not only Buddhist narratives but also many other Indian tales and stories have found their way to China, Japan, Tibet and many other regions. The Buddha Jayanti Festivals in Delhi (1956) have shown how much all nations of Asia feel themselves indebted to India and how inspiring and stirring the idea of San-go-ku still is in our time, the idea that the three countries India, China and Japan have much in common because of their Buddhist heritage." (Helmuth von Glasenapp)

এর পর তিনি প্রতীচীর উপর ভারতের প্রভাব আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। আশ্চর্যের কথা বুদ্ধকে নায়ক করে অপেরা রচনা করেছিলেন Max Vogrich ও Adlof Vogl আর স্বয়ং Richard Wagner একটি অপেরাতে বৌদ্ধ কিংবদন্তী ব্যবহার করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সেই অপেরা Die Sieger (বিজয়ীরা) শেষ করে যেতে পারেননি। শুনে মুগ্ধ হলুম বুদ্ধ সম্বন্ধে এক শ' বছর আগে লেখা তাঁর বাণী।

"Buddha's teaching calls for such a grand view of life that every other doctrine must seem rather small when compared with

it. In this wonderful and incomparable conception of the world the most profound of philosophers, the most magnificently successful of scientists, the most extravagantly imaginative artist and the man whose heart is most, widely open to all that breathes and suffers can find an abiding place."

আধুনিক বা সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক তেমন ওয়াকিবহাল নন মনে হলো। তার প্রভাব কি পাশ্চাত্য সাহিত্যে পড়েনি? কেন তবে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করলেন না তিনি? আমার অন্তরে খেদ রাখলেন না সেদিনকার শেষ বক্তা ফরাসী সাহিত্যিক জঁা গেনো (Jean Guehenno)। তাঁর শেষ উক্তি রবীন্দ্রনাথের উক্তি। কিন্তু তার আগে ইটালীর প্রখ্যাত লেখক আলবের্তো মোরাভিয়া কী বললেন তা শুনুন। সবটা নয়, একটুখানি।

"Finally a word on what Italy may have to offer to the East. The world view dominant in Italy is that of Renaissance humanism. It is a view which puts at the centre of the world not religion, an ideology of the state or society but Man, and which helps man to stand above any oppression or domination. The Italian Renaissance concerned of man as the most beautiful plant in nature not to be limited by any outward force and to be left to grow according to his own genius, with all its contradictions, deficiencies and qualities. This view is found in all the masterpieces of Italian literature and also, perhaps more humbly, yet in a clear enough way, in the film and in contemporary literature and thought." (Alberto Moravia)

জঁা গেনো প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন কুঠার সঙ্গে। তখন ১৯১৬ সাল। তাঁর বন্ধুরা নিহত।

"All of Europe had fallen into that folly where to live, one often lost every reason to live. I was in a state of despair. Chance put before me a lecture delivered by a Hindu writer in Japan. It was the message to Japan of Sir Rabindranath Tagore."

কল্পনা করুন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কবিগুরুর নাম শুনে কেমন চমক লাগল আমার চিত্তে। কেমন দুলে উঠল আমার বুক যখন শুনলুম জঁা

গেনো আবৃত্তি করছেন "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির···।" তার পর বলছেন,

"Then, I submit, we prayed the same prayer for our country. Such is what is called 'influence.' I can evaluate to this day what at that moment in my life, in 1916, were what Tagore called the 'counsels of one man to another.'' (Jean Guehenno)

সেদিনকার বৈঠক সেইখানেই শেষ। আমার স্মরণে তখনো ঘুরছিল জাঁ গেনোর কথা, "Allow me to evoke to memory of a personal debt to the Orient for having helped me back on the path of Man." হায়! যে বাণী জাপান থেকে ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসীকে মানবতার পথে ফিরে যেতে সাহায্য করল সে বাণী জাপানীদের ভালো লাগল না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "জাপানে আসিবার সময় যাঁহাকে সমগ্র জাতি অভ্যর্থনা করিয়াছিল—তাঁহাকে বিদায় দিবার ক্ষণে জাহাজঘাটে কোনো জনতার ভিড় হয় নাই—একমাত্র হারাসান তাঁহার অতিথিকে বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত হন।"

সেদিন আমাদের মধ্যাহ্নভোজন সাঙ্কেই কাইকানেরই ন'তলায়। শিন-তোকিয়ো রেস্টোরাণ্টের হল-ঘরে। নিমন্ত্রণকর্তা জাপানের শিক্ষামন্ত্রী তো মাৎসুনাগা এবং ইউনেস্কোর জাপান ন্যাশনাল কমিশনের সভাপতি তামোন মাএদা। আমাকে যেখানে আসন দেওয়া হয়েছিল সেটা প্রধানত ফরাসী-দের টেবিল। দুই পাশে দুই ফরাসী লেখিকা, আনি ব্রিয়ের (Annie Brierre) আর ওদেৎ দ্য সাঁ-জুস্ত (Odette de Saint-Just)। পুরোপুরি ফরাসী পদ্ধতির রন্ধন পরিবেশন। ওয়েটারদের সাজপোশাক পাশ্চাত্য। মনে হলো ইউরোপের কোনোখানে বসে খাচ্ছি আর গল্প করছি। যত রাজ্যের গল্প।

আনি ব্রিয়েরকে জিজ্ঞাসা করলুম রবীন্দ্রনাথের আর রমাঁ্যা রলাঁর লেখা আজকের ফ্রান্সে কেমন চলে। উত্তর পেলুম, বেশী নয়। তবে তিনি স্বীকার করলেন মানুষহিসাবে উভয়ের মহানুভবতা। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যোগ করলেন, "He is one of the great poets of the world." পরে একদিন জাঁ গেনোকে হাতের কাছে পেয়ে একই প্রশ্ন করেছিলুম। অনুরূপ

উত্তর পেয়েছিলুম। রলাঁ তাঁর বন্ধু। রলাঁর জার্নালে আমার উল্লেখ আছে। সেই সূত্রে আলাপ জমে। তিনি যা বললেন তার মর্ম, তখনকার দিনে রলাঁ ছিলেন সত্যি বড়। সেসব দিনও তো আর নেই। লোকে যদি না পড়ে কী আর করা যাবে!

একালের ফরাসীরা যাঁর লেখা এত বেশী পড়ে সেই ফ্রাঁসোয়াস্ সাগাঁ (Françoise Sagan) সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাসা হেসে উড়িয়ে দিলেন ওদেং স্য সাঁ-জুস্ত! কন্যাটির সাহিত্যিক গুণপনা তিনি মানতেই চাইলেন না, কিন্তু একটি গুণের কথা বললেন যা সব গুণের চেয়ে দুর্লভ গুণ। ফ্রাঁসোয়াস্ সাগাঁ গরিবের দুঃখ সইতে পারেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা পান, সমস্ত বিলিয়ে দেন। নিজের জন্যে রাখেন না। মনে মনে নমস্কার করলুম তাঁকে। আমার কেমন একটা ধারণা জন্মেছিল "Bonjour Tristesse" যাঁর লেখা তিনি উত্তর জীবনে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী হবেন। তার আংশিক সমর্থন মিলে গেল।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আজকের দিনের ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বাংলার নাম রেখেছেন কে, বলব? সুধীন ঘোষ। আনি ব্রিয়েরের বহুকালের বন্ধু। ঘোষের সুযশ আমি অনেক পূর্বে অবগত ছিলুম। কিন্তু সে যশ যে কত ব্যাপক তা সেই দিন প্রত্যয় হলো। তখন আমি কেমন করে জানব যে রবীন্দ্রনাথের স্থান থেকে সুধীন্দ্রনাথের প্রস্থানটা সোফোক্লিসের ট্র্যাজেডীর মতো অনিবার্য হবে। কুকুরকে ফাঁসীতে লটকাতে হলে বদনাম দিতে হয় তার আগে। কিন্তু মানুষকে মেরে খেদিয়ে দিয়ে অপঘোষণা করতে হয় তার পরে। যাতে গেঁয়ো যোগী আর ভিখ না পায় স্বদেশে। ফাঁসী নয়, দ্বীপান্তর।

আহারের পর আমরা সদলবলে স্থানান্তরিত হলুম কান্জে কাইকান ওমাগারিতে। সেখানে নো (Noh) নাট্যাভিনয় দেখতে। নো আর কাবুকি হলো জাপানী নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য। পেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের একদিন নো দেখানোর একদিন কাবুকি দেখানোর বন্দোবস্ত ছিল। অতিথি হিসাবে। নো আর কাবুকি দুই পুরাতন, দুই ক্লাসিকাল। নো আরো বেশী। তার উৎপত্তি প্রায় ছয় শতাব্দী পূর্বে। তখনকার দিনের দু'শ' চল্লিশখানা নাটক এখনো অভিনয় করা হয়। তার কতক কান-আমি'র রচনা। বাদবাকী

তাঁর পুত্র জে-আমি'র লেখা বা পুনর্লিখন। এত কাল পরেও তার ভাষা অবিকৃত রয়েছে। কিন্তু তার ফলে একালের লোকের দুর্বোধ্য হয়েছে। নো নাটকের আদর্শ ছিল সেকালে "য়ুগেন" বা রহস্যময় তিমির। অথচ তার ভিত্তি ছিল বাস্তববাদ। সঙ্গীত আর নৃত্য তার অঙ্গ। আদিতে তা ছিল মন্দিরের বা পীঠস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত। পরে শোগুনদের আনুষ্ঠানিক বিনোদনে পরিণত হয়। এমনি করে ক্রমে মার্জিত হয় তার রূপ।

নো নাটকের রঙ্গমঞ্চ প্রেক্ষাগৃহের এক কোণ জুড়ে। একটি পাইন তরু আঁকা পশ্চাৎপট। ডান দিকে দেয়াল ঘেঁষে যাতায়াতের পথ সাজঘর থেকে মঞ্চে বা মঞ্চ থেকে সাজঘরে। মঞ্চের সঙ্গে সমতল। বলতে পারেন মঞ্চের একটি বাহু। একে বলে হাশিগাকারি। অভিনেতারা অভিনয় করতে করতে সেই পথ দিয়ে আসেন, অভিনয় করতে করতে সেই পথ দিয়ে যান। সেইখানে দাঁড়িয়েও অভিনয় করেন। দর্শকদের আসন মঞ্চের সামনে ও ডান দিকে বাহুর কাছে। অভিনেতারা সকলেই পুরুষ। নারী-চরিত্রের অভিনয়ে নারীর স্থান নেই। মুখে মুখোশ এঁটে সাজপোশাক পরলে চিনতে পারা শক্ত নারী না নারীবেশী পুরুষ। তরুণীর ভূমিকা সব চেয়ে কঠিন বলে সেটি নেন সব চেয়ে বৃদ্ধ ওস্তাদ। তাঁরই পদক্ষেপ ও গমনভঙ্গী সব চেয়ে শরম-নম্র, শ্রীময়। মেয়েরাও নাকি তা দেখে মেয়েলিপনা শেখেন।

অভিনেতা না হলে নাটক হয় না। কিন্তু অর্কেস্ট্রা না হলে নো নাটক হয় না। পশ্চাৎপটের সামনে কিছু ফাঁক রেখে অভিনেতাদের পেছন জুড়ে বসে থাকেন একদল বাদক। তিনটি তিন রকম ঢাক ও একটি বাঁশি নিয়ে। তাঁদের দলপতি মুখ দিয়ে অদ্ভুত সব আওয়াজ করেন। সেসব উঠে আসে বুক থেকে। একে বলে "আত্মার আবাহন"। এভাবে আবহ সৃষ্টি না করলে অভিনয় জমাট হয় না। নো নাটক যেন এক এলিমেণ্টাল ব্যাপার। ভিত্তি হয়তো বাস্তব, কিন্তু অভিনয় প্রতীকধর্মী, প্রযোজনা সঙ্কেতময়। পাপপুণ্যের বা ভালোমন্দের দ্বৈরথ চলেছে জগৎ জুড়ে। নো নাট্যভূমি তারই সংক্ষিপ্তসার। পাত্রপাত্রীরা কেউ ব্যক্তিরূপে রূপবান বা মূল্যবান নন। তাঁদের একজন হলেন শিতে বা উত্তমপক্ষ। একজন ওয়াকি বা মধ্যমপক্ষ। আর দুজন দুই পক্ষের জুরে বা সমর্থক। এ ছাড়া থাকে

জি বা কোরাস। এই নিয়ে নো নাটকের কাঠামো। কোনো কোনোটাতে লোকসংখ্যা বেশী থাকে। কোনোটাতে কম। নো নাটক মাত্রেই পদ্য-নাটক। ছোট ছোট দু'খানা নাটকের মাঝখানে একটা তামাশা থাকে, তাকে বলে কিয়োগেন। সেটা গদ্য। মঞ্চের কোনখানে শিতের আসন কোনখানে ওয়াকির আসন তাও প্রথানির্দিষ্ট। তাঁরা থাকেন কোনাকুনি।

সেদিন আমাদের দেখানো হলো দুটি নো আর তাদের মাঝখানে একটি কিয়োগেন। প্রথম নাটকটির নাম "ফুনাবেঙ্কেই" বা নৌকাপথে বেঙ্কেই। কামাকুরার শোগুন বা মহাসেনাপতি অন্যায় করে তাঁর ভাই মিনামোতো নো য়োশিৎসুনেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। য়োশিৎসুনে তাই পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করছেন। যাবার আগে তিনি বিদায় নিচ্ছেন তাঁর সুন্দরী প্রিয়া শিজুকার কাছ থেকে। শিজুকার মনে দুঃখ। প্রিয়তমের অনুগত অমাত্য বেঙ্কেইর অনুরোধে তিনি বিদায়নৃত্য নাচলেন। যাতে যাত্রা শুভ হয়। য়োশিৎসুনে কি সহজে যেতে চান! ওদিকে নৌকা তৈরি। দুর্যোগের দোহাই দিয়ে যাওয়া পেছিয়ে দিতেন য়োশিৎসুনে, কিন্তু বেঙ্কেই তা হতে দিলেন না। বড় শক্ত লোক! নৌকা ভাসল দরিয়ায়। হঠাৎ আকাশ ছেয়ে গেল কালো মেঘে। দুলতে লাগল নৌকা। সামাল! সামাল! য়োশিৎসুনে যাদের নৌযুদ্ধে ধ্বংস করেছিলেন সেই তায়রা বংশের যোদ্ধাদের প্রেতাত্মারা সামনে দাঁড়িয়ে। য়োশিৎসুনে তাঁর অনুচরদের বললেন, শান্ত হও।

আবির্ভূত হলো তায়রা নো তোমোমোরির ভূত। বলল, আমাকে যেমন করে মেরেছ তোমাকেও তেমনি করে মারব। সমুদ্রের অতলে টেনে নামাব তোমাকে।

চলল দুই পক্ষের লড়াই। ঢেউয়ের উপরে ভূত। নৌকার উপরে মানুষ। য়োশিৎসুনে চালালেন তলোয়ার। আর বেঙ্কেই গড়ালেন জপমালা, যা দিয়ে বৌদ্ধ মন্ত্র জপতে হয়। তলোয়ার কী করতে পারে ভূতের! জয়ী হলো মন্ত্রশক্তি। প্রার্থনার শক্তি। ভূতের দল হটে গেল ঢেউয়ের ঠেলা খেয়ে। ক্রমে মিলিয়ে গেল।

এই হলো প্রথম নাটকের গল্প। এ গল্পের নায়ক অবশ্য য়োশিৎসুনে, কিন্তু তাঁর অংশ অপ্রধান। প্রধান হলেন উত্তমপক্ষ আর মধ্যম পক্ষ, শিতে আর ওয়াকি। এখানে শিতে হচ্ছেন শিজুকা আর ওয়াকি হচ্ছেন বেঙ্কেই।

আর নোচি-শিতে বা প্রতিপক্ষ হচ্ছেন তায়রা নো তোমোমোরির প্রেতাত্মা। এই সম্প্রদায়ের ওস্তাদ কিতা মিনারু স্বয়ং সেজেছিলেন সুন্দরী প্রিয়া শিজুকা। ভদ্রলোকের বয়স সাতান্ন। তার পর সেই তিনিই সাজলেন ভয়ঙ্কর ভূত তায়রা নো তোমোমোরির প্রেতাত্মা। নাচ আর নাচন দুটোতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ও সিদ্ধপদ। তিনি "শিতে" ভূমিকাতেই নামেন বলে তাঁকে বলা হয় "শিতে অভিনেতা"। এমনি একজন "শিতে অভিনেতা" কানজে য়োশিয়ুকি। বয়স পঞ্চান্ন। এঁকে দেখতে পাওয়া গেল দ্বিতীয় নাটকে। এঁর পরে যাঁর স্থান তাঁর নাম হোশো য়াইচি। বয়স উনপঞ্চাশ। ইনি "ওয়াকি অভিনেতা"। ইনিই সেজেছিলেন বেন্কেই।

এই সম্প্রদায়ের এঁরাই তিনজন বড় অভিনেতা। এঁরা ভেনিসে গিয়ে নো নাটক অভিনয় করে এসেছেন। কিন্তু এঁদের চেয়ে কম যান না এঁদের সম্প্রদায়ের সঙ্গীতনায়ক কো শোকো। ইনিও ভেনিসফেরতা। কিন্তু এঁকে সেদিন দেখতে পাওয়া গেল না। এঁর পরবর্তী য়োশিমি য়োশিকি অধিনায়কত্ব করলেন যন্ত্র-ও-মন্ত্রসঙ্গীতে। চৌষট্টি বছর বয়স। অমন করে বার বার উউউ উউউ করতে থাকলে ঝড় উঠবেই, ভূত নামবেই। বাপ রে! সে কী হাড়-কাঁপানো পিলে-চমকানো গা-শিউরানো আওয়াজ!

নো নাটকে পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার আছে, কিন্তু মঞ্চসজ্জার বালাই নেই। দৃশ্যটা কল্পনা করে নিতে হয় কথা শুনে ও সঙ্কেত দেখে। ভূতের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধটাতে বেন্কেইকে দেখা গেল বীররূপে। মালা গড়াচ্ছেন না পার্থ-সারথির মতো সুদর্শনচক্র ঘোরাচ্ছেন? বাজনা এমন ভাবে বাজতে লাগল যে উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে চরমে ঠেকল। তার পর আস্তে আস্তে থামল যখন ভূত একটু একটু করে হটে গেল মঞ্চের বাইরে যাতায়াতের পথ ধরে সাজঘরের দিকে। ওই বাহুটা যে কেন দরকারী তা বোঝা যায় বিলম্বিত প্রস্থান দেখে। শিজুকা যখন বিদায় নিচ্ছিল তখন তার পা সরছিল না। তাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখা গেল মঞ্চের বাইরে যাতায়াতের পথে একটু একটু করে পেছিয়ে যেতে।

নো নাটকের প্রাণ হচ্ছে টেনসন। আগাগোড়া একটা সংঘর্ষের ভাব থাকে তাতে। দৈবী শক্তির সঙ্গে আসুরী শক্তির সংঘর্ষ। আর কিয়োগেন হলো নৈতিক তামাশা। ছোটভাইকে পেঁচায় পেয়েছে। বড়ভাই এক বৌদ্ধ

নো নাটক 'ফুনাবেঙ্কেই'
নবম দৃশ্য
(শিজুকার নৃত্যারম্ভ)

সন্ন্যাসীকে বলছে ভূত ঝাড়তে। ছোটভাইকে ঝাড়তে ঝাড়তে বড়ভাইকেও পেঁচায় পেল। পেঁচো নয়, পেঁচা। পেচকের আত্মা। সাধুজী তা দেখে আরো জোরসে মালা গড়াতে লাগলেন। জপতে থাকলেন, "বোরোন!" "বোরোন!" আর ওদিকে ভাই দুটো চেঁচাতে থাকল পেঁচার মতো। "হু।" "হু।" শেষকালে সাধুকেও পেঁচায় পেল। রোজার ঘাড়ে ভূত। কে কাকে সারাবে!

এর পরে দ্বিতীয় নাটক, "শাকৃকিয়ো" বা পাথরের পুল। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। তাঁর দুই সিংহ। শাদা কেশর, লাল কেশর। বোধিসত্ত্বকে দেখা গেল না, তাঁর বার্তাবহ দুই সিংহ এসে পুলের ধারে ফুলবাগিচায় নৃত্য জুড়ে দিল। বোধিসত্ত্বের শান্তিপূর্ণ চিরন্তন রাজত্বের সম্মানে এই নৃত্য। প্রজ্ঞার বোধিসত্ত্ব ইনি। এঁর রাজত্ব প্রজ্ঞার রাজত্ব। শ্বেত কেশরী হচ্ছে রক্ত কেশরীর পিতা। দুজনেই বোধিসত্ত্বের নিত্যসঙ্গী। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতও ছিল। প্রখর সঙ্গীত।

এইসব দেখতে-শুনতে ঘণ্টা দুই লাগল। হোটেলে ফিরে দেখি সময় বেশী নেই। যেতে হবে তোকিয়ো নগরশাসনের গবর্নর সেইইচিরো য়াসুই মহাশয়ের পার্টিতে। সুমিদা নদার অপর পারে কিয়োজুমি উদ্যানে। আবার সেই কালো শেরোয়ানি, কিন্তু এবার আর শাদা চুড়িদার নয়। সেফটিপিন দিয়ে ফিতের কাজ হয় না। সাতপাঁচ ভেবে ট্রাউজার্সই পরা গেল তার বদলে। গ্রে-ব্লু রঙের ডেক্রন মন্দ মিশ খেল না। বেরিয়ে পড়েই ভাবলুম, যাই ফিরে। বদল করি। কিন্তু বাস তো আমার জন্যে দাঁড়াবে না। উঠে বসতে হলো।

উদ্যান না বলে উপবন বলাই সঙ্গত। শ'তিনেক বছর আগে এর পত্তন হয় দেশের চার দিক থেকে অসাধারণ সব পাথরমাটি আনিয়ে। পাথুরে লণ্ঠন, হাতমুখ ধোবার পাথুরে বেসিন, যেখানে সেখানে কুঞ্জ, কোথাও উপত্যকা, কোথাও অধিত্যকা, কোথাও হ্রদ, কোথাও হ্রদের উপর বিশ্রামগৃহ, সংকীর্ণ পায়ে চলার পথ—এমনি কত রকম বৈশিষ্ট্য। তোকিয়ো শহরের ভিতরে থেকেও বাইরে চলে যাবার মতো লাগে। মনে হয় না যে শহরেই আছি।

যেখানে অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্যে বিশেষ আয়োজন ছিল সেখানে না গিয়ে আমি চলে গেলুম ঝোপঝাড় পেরিয়ে উপবন-পরিক্রমায়। দেখলুম একটু দূরে খাবারের স্টল। পানীয়সমেত জাপানী খাদ্য। তেম্পুরা এরই

মধ্যে আমার রসনাহরণ করেছিল। চিংড়িমাছের তেম্পুরা। সেইখানেই তৈরি হচ্ছে, সেইখানেই হাতে হাতে ঘুরছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি আমরা। এর পর আর-একটি স্টল। তাতে সমুদ্রের আগাছা। তার পর আরো একটি। সেখানে মুরগী। এক এক করে পরখ করছি। কেউ ছাড়তে চায় না। খাওয়াবেই। এমন সময় আলাপ হয়ে গেল এক জাপানী অধ্যাপকের সঙ্গে। প্রবীণ বয়সী। তাঁর সঙ্গে এক কালো কিমোনো পরা জাপানী তরুণী। আর্টিস্ট।

অধ্যাপক বললেন, "আপনি হিন্দু। শুনেছি হিন্দুধর্মের সঙ্গে শিন্তোধর্মের মিল আছে। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আমরা কয়েকজন শিন্তো ইনটেলেকচুয়াল মিলিত হচ্ছি আজ এক জায়গায়। আপনাকেও নিয়ে যাব সেখানে। কেমন, রাজী? তা হলে গেটে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন ন'টার একটু আগে।"

এই বলে তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর আমি ঘুরতে ঘুরতে ফিরে গেলুম অভ্যর্থনাস্থলে। যেতে যেতে দেখি একটি বেষ্টনীতে গেইশারা হাসাহাসি করছে। একটু পরে তারাই দেখা দিল নাচের আসরে। কোনো বার ছাতা হাতে নিয়ে, কোনো বার পাখা হাতে নিয়ে মুক্ত আকাশের তলে ঘন ঘাসের উপরে চরণ ফেলে নাচতে লাগল সেই অপ্সরার দল। আর মাটিতে বসে বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন নানা দেশের দেবদেবীর দল।

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একজন জাপানী লেখক। বেশ বয়স হয়েছে। কৃতার্থ হয়ে আমাকে বললেন, "এঁরা হলেন উচ্চতম শ্রেণীর গেইশা। এমন কি আমিও কোনো দিন এঁদের চোখে দেখবার সুযোগ পাইনি। আপনাদের কল্যাণে আজ প্রথম দর্শনলাভ হলো।"

মধ্যযুগের ভারত গত শতাব্দীতে শেষ হয়ে না গেলে আমরাও আমাদের দেশে এর অনুরূপ দেখতে ব্যাকুল হতুম। রাণী ভিক্টোরিয়া জাপানে রাজত্ব করলে জাপানেও সেই সময় এর অবসান ঘটত। ওরা বেঁচে গেছে না আমরা বেঁচে গেছি বলা সহজ নয়। আমার ইচ্ছা করছিল আর একটু দেখতে। কিন্তু মায়াললনারা সহসা মিলিয়ে গেল।

তার পর আতশবাজি ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হয়ে ন'টার একটু আগে গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এক এক করে সবাই গিয়ে বাসে উঠল, বাস

ছেড়ে দিল। অধ্যাপক নিরুদ্দেশ। অনেকক্ষণ পরে দেখি তিনি আসছেন, সঙ্গে এক ইংরেজ লেখিকা। বললেন, "ফরাসী লেখকের খোঁজ পাচ্ছিনে। আবার যাচ্ছি।" যা হোক গল্প করার জন্তে সাথী পাওয়া গেল। তারপর ভদ্রলোক এক জার্মানকে এনে হাজির করলেন। আর তিনি দিলেন তাঁর গাড়িতে আমাদের লিফ্‌ট্।

জার্মান বললেন, "কোথায় যেতে হবে?" জাপানী বললেন, "গিন্‌জা।" চললুম আমরা তোকিয়োর পিকাডিলি অঞ্চলে। পথে যেতে যেতে অধ্যাপক একতরফা বকে যেতে লাগলেন। একবার শুনি তিনি বলছেন, "ওঃ। এই ছিল কপালে! বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ!" তার পর বলছেন, "হবে না কেন? জাপানের হয়েছিল মেগালোমেনিয়া। আমি, মশায়, স্পষ্টভাষী। দেশের লোককেও হক কথা শুনিয়ে দিতে ডরাইনে।" তার পর বলছেন, "ভালোই হয়েছে। দুনিয়াকে হারিয়ে জাপান তার আত্মাকে ফিরে পেয়েছে। এবার সে আধ্যাত্মিক অর্থে মহান হবে।" কখন একসময় শুনি, "কোথায় যেন পড়েছি একটা ইঁদুরও কায়দায় পেলে একটা হাতীকে হারিয়ে দিতে পারে।"

ভদ্রলোকের মর্মবেদনায় সমবেদনা অনুভব করছিলুম আমি। কিন্তু সায় দিতে পারছিলুম না। আর দু'জনও আমারি মতো চুপ। অধ্যাপক বললেন, "দুনিয়া তো অনেকবার ঘুরে দেখলুম। এবার যেতে ইচ্ছা করে ব্রেজিল।" ব্রেজিলের কথা আমি পরে অন্যান্য জাপানীদের মুখেও শুনেছি। একমাত্র সেইখানেই জাপানীরা উপনিবেশ গড়তে পায়। দেশের বাইরে আর কোনো-খানেই ঠাঁই নেই তাদের। "তার পর ভাবি আর কেন এ বয়সে বিদেশে যাওয়া! ব্রেজিলও তো বিদেশ!" বুঝলুম ভদ্রলোকের অবস্থাটা ন যযৌ ন তস্থৌ। পরে শুনেছিলুম তিনি বারোটা ভাষা অনর্গল বলতে পারেন। গিন্‌জার চীনা রেস্টোরাণ্টে ফরাসী ও জাপানীরা অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ক্রমাগত ফরাসী ও জার্মান চালালেন। জার্মানকে দিলেন জার্মানভাষায় লেখা তাঁর বই।

জাপানী কক্ষে তাতামি মাদুরের উপর কুশন পাতা ছিল। আমরা বিদেশীরা বসলুম পদ্মাসনে। আর জাপানীরা বসলেন বজ্রাসনে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেই তরুণীটি। অধ্যাপক আমাকে ছেড়ে দিলেন তাঁর হাতে ও

তাঁর আর্টিস্ট বন্ধুদের সাথে। তাঁরা সকলেই পিকাসোর শিষ্য। তাঁদের একখানা শিল্পপত্রিকাও দেখলুম। তেমনটি আমাদের দেশে নেই।

সামনে রিভল্ভিং টেবল। খাবার জড়ো করা হয়েছিল তাতে। ঘোরালেই যেটা চান চলে আসে হাতের নাগালে। তুলে নিতে হয় প্লেটে। চপ স্টিক দিয়ে তুলতে হয় মুখে। সমস্ত জাপানী খাদ্য। জমকালো কিমোনো-পরা পরিবেশিকারা আরো দিয়ে যাচ্ছিল।

রাত হলো। উঠলুম আমরা। বিদায় নিতে গিয়ে দেখি কোথায় সেইসব কিমোনো-পরা তরুণী পরিবেশিকা! ফ্রক-পরা এক ঝাঁক মেড সম্ভ্রমে নত হয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বলছে, সায়োনারা! সায়োনারা! যদি বিদায় নিতেই হয় তবে নেওয়া যাক। "যদি!" "যদি!"

ওকায়ামা হাতো

। ছয় ।

পথে কুড়িয়ে পাওয়া ক্ষণিকের অতিথি আমি। কেই বা জানে আমার পরিচয়! আমিই বা চিনি কাকে! প্রথম দেখাই যেখানে শেষ দেখা সেখানে বিদায় নিতে দ্বিধা, দিতে দ্বিধা। বোন ছাড়বে না ভাইয়ের হাত, ভাই ছাড়বে না বোনের। মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়। মুখ বলে, "সায়োনারা! সায়োনারা!" মুঠি বলে, "না। না।"

নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়ালুম আমরা। ইংরেজ ফরাসীরা ট্যাক্সি ধরে উধাও হলেন। জার্মানটি ডাক্তার, তিনি যাচ্ছেন তাঁর নিজের মোটরে উঠতে। রাত তখন এগারোটা। তোকিয়োর পক্ষে কিছু নয়, আমার পক্ষে অনেক। আমিও যাবার কথা ভাবছি, অধ্যাপক আমার দিকে ফিরে বললেন, "আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না?"

জানতে চাইলুম, "কোথায়?"

তিনি বললেন, "কফিখানায়।"

সারাদিন মিটিং করে নাটক দেখে পার্টিতে যোগ দিয়ে আমি ক্লান্ত। আর কফি খেলে আমার ঘুম আসে না। বোকার মতো বললুম, "আমাকে মাফ করবেন।" এই বলে ডাক্তারের গাড়ীতে উঠে বসলুম। তিনি আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবার ভার নিলেন।

অধ্যাপক বোধ হয় মনে করেছিলেন যে রাত এমন কী বেশী হয়েছে, এই তো হিন্দু ধর্মের সঙ্গে শিন্তো ধর্মের মোকাবিলার সময়। আর এর উপযুক্ত স্থান কফিখানা। একটু নিরাশ হলেন। তার পর পায়ে হেঁটে চললেন সদলবলে। কফিখানা অভিমুখে। লক্ষ করলুম তাঁদের সকলেরই কেমন এক অস্থির অশান্ত ভাব। সকলেই শিন্তো। সকলেই জাপানী। সকলেই আধুনিক মার্গের শিল্পী বা অধ্যাপক। তিনটের মধ্যে কোন স্রোতটা এঁদের এমন অস্থির করেছে? অশান্ত করেছে?

কিন্তু আমি কেন বোকার মতো কফিখানায় যাবার সুযোগ হারালুম সে কথা আগে বলি। কফিখানা শুধু এক পেয়ালা কফির জন্যে নয়। সেখানে কফি ও কেক খেতে দেয় বললে সামান্য বলা হয়। তোকিয়ো শহরে কফিখানা ক'হাজার আছে, জানেন? ছ'হাজার। তাদের অধিকাংশই মার্কিনদের

নাইটক্লাবের মতো করে সাজানো। ক্লাসিকাল সঙ্গীত, জ্যাজ বাজনা, গ্রামোফোন রেকর্ড, ফ্যাশন প্রদর্শনী, চিত্র প্রদর্শনী, খেয়ালী ছবি আঁকার ব্ল্যাকবোর্ড। এমনি অনেক কিছু পাবেন কফিখানায়। আর পাবেন—ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি—রূপবতী বালা। যার সঙ্গে কফি খেয়ে সুখ।

ভোগবতীর বন্যা বয়ে চলেছে তোকিয়োর পথে ঘাটে। নানা রঙের আলো, নানা রঙের কাগজের লণ্ঠন। প্রতি রাত্রেই এই। রাত বারোটার সময় অন্তত একদিন দেখেছি দোকানপাট কতক বন্ধ কতক খোলা। কখন যে ওরা শুতে যায় কে জানে! তবে আলোকসজ্জা ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। ক্ষীণ হয়ে আসে যানযন্ত্রের গর্জন। যানযন্ত্র না বলে যানোয়ার বললে কেমন হয়? রাস্তার যানোয়ার তো মোটর। কিন্তু মাথার উপর দিয়ে আরেক প্রস্থ সড়ক গেছে। রেল সড়ক। কলকাতায় সে রকম নেই। পায়ের তলার মাটি খুঁড়েও আরো এক প্রস্থ সড়ক। রেল সড়ক। ভারতে সে রকম নেই। তাই তোকিয়োর যানোয়ারের সঙ্গে তুলনা দিতে পারছিনে।

এখন ফিরে যাই অধ্যাপকের অস্থিরতার প্রসঙ্গে। মনে হলো তিনি কোনো মতেই বাস্তবকে মেনে নিতে পারছেন না। ভুলে থাকতে চাইছেন। আপনাকে ভোলাতে চাইছেন। বৌদ্ধদের খ্রীস্টানদের আরো অনেক দেশ আছে, কিন্তু শিন্তোদের ওই একটিমাত্র দেশ, ওই একটিমাত্র সভ্যতা। হিন্দুদের যেমন "বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার" শিন্তোদেরও তেমনি পূর্বপুরুষ জন্মভূমি ও সম্রাট। এর কোনো একটির উপর বিশ্বাস হারালে শিন্তো আর মনে জোর পায় না। কোনো দুটির উপর বিশ্বাস হারালে তো রীতিমতো দুর্বল বোধ করে। গত শতাব্দীর নব জাগরণ শিন্তো ধর্মের মর্মে আঘাত হানেনি। বরং শিন্তোকে করেছিল রাষ্ট্রধর্ম, সম্রাটকে দিয়েছিল একচ্ছত্র ক্ষমতা, জন্মভূমিকে রাঙিয়েছিল অপূর্ব মহিমায়, পূর্বপুরুষের প্রতি আনুগত্য অটুট রেখেছিল। আধুনিকতা জাপানকে মহাশক্তির আধার করেছিল, কিন্তু আধারটা আধুনিকতার পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল। সেটা আধুনিকতার সৃষ্টি নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের ফলে সেই সুপ্রাচীন আধারে ভাঙন ধরেছে। ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গড়াও চলেছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রজাশক্তি এই প্রথম রাজ্যভার নিল। মিলিটারির পিঠে

সিভিল এই প্রথম ঘোড়সওয়ার হলো। সিভিল লিবার্টি এই প্রথম অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেলো। নরনারীর সমান অধিকার এই প্রথম ঘোষিত হলো। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা যুদ্ধবিগ্রহ এই প্রথম বর্জিত হলো। জাপানের কোনো আর্মি নেভী বা এয়ারফোর্স নেই। যা আছে তার নাম আত্মরক্ষা-বাহিনী। সৈন্য হয়তো আবার হবে, কিন্তু সামন্ত আর হবে না। সামুরাই বলে সেই যে দুর্ধর্ষ শ্রেণী ছিল ইতিহাস জুড়ে তার ইজ্জৎ গেছে, সে আর মুখ দেখাতে পারে না লজ্জায়। জাপান নতুন অর্থে নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে। বড় বড় মনোপোলিও ভেঙে দিয়ে গেছেন নয়া মেইজি ম্যাকআর্থার। ১৯৪৫ জাপানকে ১৮৬৮র পর বড় এক কদম এগিয়ে দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার আবার সাঙ্কেই কাইকানের কোকুসাই হলে পেন কংগ্রেসের সাহিত্য অধিবেশন। এবার যাঁকে সভাপতির আসনে দেখা গেল তিনি ইন্দোনেশিয়ার সদ্যোমুক্ত লেখক সুতান তাকদির আলীশাবানা। পরে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তাঁর বন্দিদশার কারণ। তিনি বলেছিলেন তিনি প্রত্যেক প্রদেশের জন্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চান, যেটা ভারতবর্ষে কবে থেকে আছে, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় নেই। এর জন্যে তিনি আবার জেলে যাবেন, তবু এ দাবী ছাড়বেন না। ও দেশে হয়েছে এই যে জাভার লোক ক্ষমতা হাতে পেয়ে আর সকলের উপর সর্দারি করছে, তাই আর কারো আন্তরিক সহযোগিতা পাচ্ছে না। অন্য পক্ষের কথা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে অপ্রতিহত ক্ষমতা না দিলে দেশ ভেঙে যেতেও পারে, দেশীবিদেশী কুচক্রীর তো অভাব নেই।

এই সভায় স্টীফেন স্পেণ্ডার একটা মনে লাগবার মতো উক্তি করলেন। পূর্বদিকে বিপ্লব হয়েছে, রূপান্তর হয়নি। গোকক করলেন এর প্রতিবাদ। আমি সে সময় উপস্থিত ছিলুম না, কার কী যুক্তি তা অনুধাবন করিনি। এখন পূর্বদিক বলতে বোঝায় রাশিয়া ও চীন। ভারত ও জাপান নয়। স্পেণ্ডার বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন এই যে কমিউনিস্টরা বিপ্লব ঘটালে কী হবে, রূপান্তর ঘটানো অত সোজা নয়। আমি রুশ চীনে যাইনি, রূপান্তর সত্যি কতটুকু হয়েছে জানিনে, তবে এটা বেশ বুঝি যে বিপ্লব ও রূপান্তর একই কথা নয়। তা যদি হতো তবে লেনিনের দেশের চিত্রকলা ভিক্টোরিয়ার দেশের মতো লাগত না। পরে একদিন রুশ দূতাবাসে ককটেল পার্টিতে

গিয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখে ভাবনায় পড়ি। এ কোথায় এলুম! ব্রিটিশ দূতাবাসের পুরোনো বাড়ী নয় তো? ছবিগুলো সরায়নি, যাদুঘরের মতো রেখে দিয়েছে বুঝি! আরে না, না। তা নয়। এ হলো সোভিয়েট চিত্রকলা।

সেদিন মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে। শিন্‌জুকু অঞ্চলে। ভারতীয় লেখকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের জন্যে অন্যান্য দেশের লেখকদের থেকে বেছে বেছে কয়েকজনকে আমন্ত্রণ করেছিলেন চন্দ্রশেখর ও তাঁর সহধর্মিণী। জাপানীদের অনেকে কিন্তু কথা দিয়েও কথা রাখেননি। এমন হবে জানলে আমরা তাঁদের বদলে অন্তদের আহ্বান করতুম। জাপানীদের জন্যে বহুদেশের লেখক বাদ গেলেন। আমাদের পার্টি জমল না। তবে আঁদ্রে শাঁসঁ, মাদাম শাঁসঁ, স্টীফেন স্পেণ্ডার ইত্যাদি ছিলেন বলে আমাদের রাষ্ট্রদূতের মুখরক্ষা হলো। পরে এসে হাজির হলেন কাওয়াবাতা। তাঁকে বসিয়ে খাওয়ানোর ভার পড়ল আমার উপরে। পাশে বসলেন মাদাম তোমি কোরা। রবীন্দ্রনাথের পরম একনিষ্ঠ ভক্ত।

কথাপ্রসঙ্গে মাদাম কোরা বললেন, "বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তিন শ' বছর আমরা মাংস খাইনি। গত শতাব্দীর নব জাগরণের পর আধুনিক হতে গিয়ে আমরা মাংসাহারী হই। আমাদের জেনারেশনে আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে মাংস খেতে আরম্ভ করি।"

আমি তো অবাক। আধুনিকতা দেখছি মত্তমাংসের প্রবর্তনা দিয়েছে একাধিক দেশে। গান্ধীজীর ছেলেবেলায় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বোঝাত ইংরেজের মতো মাংস না খেলে ইংরেজকে গায়ের জোরে হারাবে কী করে? সে যুক্তি তাঁকে পথভ্রষ্ট করেছিল, কিন্তু অল্পদিনের জন্যে। জাপানে অবশ্য মৎস্যাহার চিরদিন ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে রহিত হয়নি। বাঙালীরা যেমন মাছে ভাতে বাঙালী জাপানীরাও তেমনি মাছে ভাতে জাপানী।

মাদাম কোরা প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। "জাপানের বিস্ময়কর প্রগতির প্রকৃত সঙ্কেত কিন্তু সুবিদিত নয়। আসল কারণ হলো মেইজি আমলের গোড়ার দিক থেকে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে যেতে বাধ্য করা। প্রথম প্রথম চার বছরের জন্যে। তার পরে ছ' বছরের জন্যে। ক্রমে ক্রমে ন'বছরের জন্যে। শতকরা আটানব্বই জন লিখতে পড়তে জানে।"

এর একটা উলটো দিক ছিল, মাদাম কোরা দেখাননি। পরে অবগত হয়েছি। রাষ্ট্র যাঁদের হাতে পড়েছিল তাঁরা জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে গিয়ে একান্ত বশংবদ করে তুলেছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তারা পোষ মেনেছিল। তার চেয়ে ভালো ছিল বৌদ্ধদের মন্দিরসংলগ্ন পাঠশালা বিদ্যালয়। এখন তো মন্দিরের সঙ্গে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধ ব্যবস্থাও জনশিক্ষার ব্যাপকতার জন্যে ধন্যবাদযোগ্য। তবে ধর্মনিরপেক্ষ নয়। এখনকার রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা গণতন্ত্রী তথা ধর্মনিরপেক্ষ।

তবে মেইজি আমলের ব্যাপক জনশিক্ষা লেখকদের বাঁচিয়েছে। বই বিক্রী হয় লাখে লাখে হাজারে হাজারে। তাই বই লিখে সংসার চালানো যায়, পরের চাকরি করতে হয় না। বড় বড় লেখকদের তো দু'তিনখানা করে বাড়ি। একখানা তোকিয়োতে, একখানা সমুদ্রের ধারে, একখানা গ্রামে। পেন ক্লাবের মতো বহু ক্লাব আছে লেখকদের। এক পেন ক্লাবেরই আট শ' জন সদস্য। কাওয়াবাতা তাঁদের সভাপতি।

য়াসুনারি কাওয়াবাতার বয়স আটান্ন। একহারা চেহারা। সিংহের কেশরের মতো চুল। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর সিংহ। গম্ভীর চিন্তাকুল মুখ। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তিনি সঙ্কল্প করেন শোকগাথা ছাড়া আর কিছু লিখবেন না। অবশ্য কথাসাহিত্যরূপে। তাঁর লেখা চিরদিন গীতকবিতা-ধর্মী তথা মরমী তথা ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক। যুদ্ধ ও তার লজ্জাকর পরিণাম তাঁকে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নির্লিপ্ততায় পৌঁছে দিয়েছে। যেখানে পৌঁছলে সৌন্দর্য আর মৃত্যু একাকার হয়ে যায়। সুন্দর শৈলীর জন্যে তাঁর অসামান্য খ্যাতি। বিচিত্র আঙ্গিক। ছাব্বিশ বছর বয়সে "ইজুর নর্তকী" লিখে যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন তখন থেকেই তাঁকে গণ্য করা হয় ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক বলে। তারপর বাইরের অলঙ্কার একে একে খুলে ফেলে ভিতরের সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করেন। পরিণত বয়সের উপন্যাস "তুষারভূমি" সম্প্রতি ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। এর বেশীর ভাগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে লেখা। যুদ্ধোত্তর উপন্যাস "সহস্র সারস" জাপানের আর্ট আকাডেমির পুরস্কার পেয়েছে। আগেকার দিনের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মুশানোকাজি ও শিগা এখনো বেঁচে, কিন্তু সক্রিয় নন। সুতরাং কাওয়াবাতার চেয়ে প্রভাব-শালী ঔপন্যাসিক বলতে তাঁর চেয়ে বয়সে বড় তানিজাকি।

খাওয়াদাওয়ার পর কাওয়াবাতা আমাকে তাঁর মোটরে করে হোটেলে পৌঁছে দিলেন। পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি কি বৌদ্ধ?" উত্তর পেলুম, "হাঁ।" তিনি যে সত্যিকারের বৌদ্ধ তার প্রমাণ মিলে গেল হাতে হাতে। শুনেছেন কখনো একজন লেখককে অন্য একজন লেখকের প্রাণখোলা প্রশংসা করতে? বিশেষত সেই অন্য জন যদি হন তাঁর চেয়ে বিখ্যাত ও সাংসারিক অর্থে সফল? কাওয়াবাতা আমাকে তাজ্জব বানালেন। ইংরেজী তর্জমায় আমি "Shunkin" পড়েছি শুনে তৎক্ষণাৎ বললেন, "তানিজাকির ওই কাহিনীটিই আধুনিক কালের জাপানী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাহিনী।"

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি একটি উক্তিও করলেন না। যদিও আমি তাঁকে বলেছিলুম যে আমি তাঁর "আসাকুসা কুরেনাইদান" উপন্যাসটির গল্পাংশ জানি। মোটর যেই ডাউন টাউনের নিকটবর্তী হলো তিনি বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "তোকিয়োর এই গোলমাল আপনার বরদাস্ত হয়? আমি তো এখানে একরাত্রিও টিকতে পারিনে। পেন কংগ্রেসের জন্যেই এখানে থাকা। না, তোকিয়োতে আমার লেখা আসে না।"

পরে একদিন কামাকুরা যাই বুদ্ধমূর্তি দেখতে। সেখানে শুনি কাওয়াবাতার বাসস্থান সেইখানেই। আগে থেকে খবর দিইনি, সময়ও ছিল না হাতে, নইলে আলাপ করে আসা যেত তাঁর সঙ্গে। তবে ইতিমধ্যে হয়েছিল আরো কয়েকবার সাক্ষাৎ। একবার তো আমিই বয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে আসি আমাদের তিনজনের স্মৃতি-উপহার।

দুটি জাপানী ছেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আকিরা ওগাওয়া ও তার ভাই। কাবুকি থিয়েটারে যাব শুনে ওরা বলল, "চলুন, পায়ে হেঁটে যাওয়া যাক।" আমিও তাই চাই। পায়ে না হাঁটলে শহর দেখা হয় না। শখ ছিল মাটির তলার ট্রেন দেখার। পায়জামার ফিতে কেনার গরজও ছিল। পেন কংগ্রেস থেকে জানিয়েছিল ছ'টার থেকে আমাদের জন্যে ব্যবস্থা। কাবুকির নিয়ম হচ্ছে বেলা সাড়ে আটটায় আরম্ভ হয়, রাত সাড়ে ন'টা অবধি চলে। একটার পর একটা পালা দেখানো হয়। যার যখন খুশি টিকিট কিনে ঢুকতে পারে। যদি জায়গা খালি থাকে। আগে থেকে রিজার্ভ করতে পারা যায়। কম সময়ের জন্যে টিকিট কাটলে আংশিক মূল্য।

গবর্নরের অতিথি আমরা। আমাকে দেওয়া হলো হাজার ইয়েন দামের টিকিট। তার মানে তেরো টাকা পাঁচ আনা দামের। মনে হলো সারা দিনের টিকিট। থাকতে পারতুম সাড়ে ন'টা অবধি। কিন্তু আটটার সময় সময় কোসিরো ওকাকুরার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট। ভারতবন্ধু কাকুজো ওকাকুরার পৌত্র। জাপানের শিল্প-ইতিহাসে কাকুজো ওকাকুরার নাম তেনশিন ওকাকুরা।

যা বলছিলুম। পায়ে হেঁটে চললুম তোকিয়োর পথে দু'ধারের দোকান-বাজার দেখতে দেখতে। লোকে লোকারণ্য। পোশাকের দোকানে শ্বেতাঙ্গিনীদের ডামি। যদিও যাদের জন্যে দোকান তারা পশ্চিমের লোকের চোখে পীতাঙ্গিনী। পোশাকে পরিচ্ছদে কিন্তু কোনো তফাৎ নেই। পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল দুটি মেয়ে, মুখ দেখিনি। পিছন থেকে দেখা যায় তাদের বব-করা চুল। চুলের রং কটা বা সোনালী। ফ্রক বা স্কার্ট পাশ্চাত্য ফ্যাশনের বই দেখে কাটা। হাই হীল জুতো পায়ে খটখট করে হাঁটা। বিভ্রমটা সম্পূর্ণ বিলিতী। কী সব স্মার্ট মেয়ে! হাসির ফোয়ারা। আবার কিমোনো-পরা মহিলারাও চলেছেন। পিঠে বোঁচকার মতো ওবি বাঁধা। পায়ে খড়মের মতো জোরি। মাথায় নানারকমের খোঁপা। কারো কারো পিঠে ছোট ছেলে চেপেছে। এরা গরিবের বৌ। সব চেয়ে মজা লাগে যখন দেখি একটি যুবক সাহেবী পোশাকের সঙ্গে জাপানী খড়ম পায়ে দিয়ে খটাস খটাস করে হাঁটছে।

গিন্‌জা সরণি কেটে জেড আভিনিউ গেছে। তার পর জেড আভিনিউ কেটে টেন্‌থ্‌ স্ট্রীট গেছে। মোড়ের মাথায় কাবুকি-জা। আমার পথপ্রদর্শকদ্বয় বিদায় নিল। বিরাট থিয়েটার। রাজপ্রাসাদের স্টাইলে নির্মিত। নির্মাণকাল ১৮৮৯ সাল। পুনর্নির্মাণ ১৯৫০। থিয়েটারের সঙ্গে আহারের স্থান। খাতে খাবার জন্যে বাইরে যেতে না হয়। সারি সারি দোকানও সেই সঙ্গে। কত কী কিনতে পাওয়া যায়। ভিতরে গিয়ে দেখি বিশাল প্রেক্ষাগৃহ। আসন সংখ্যা তিন হাজার। বৃহৎ মঞ্চ। মঞ্চের থেকে দর্শকদের দিকে এগিয়ে এসেছে একটি দীর্ঘ বাহুর মতো হানামিচি। অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকদের যোগসূত্র। সেই পথ বেয়ে দর্শকদের দু'পাশে রেখে তাঁরা অভিনয় করতে করতে আসেন বা যান। তা ছাড়া প্রবেশ ও প্রস্থানের গতানুগতিক পথ

তো আছেই। অভিনেতা বলেছি। অভিনেত্রীর ভূমিকায় মুখোশপরা পুরুষদেরই অধিকার। তিন শ' বছর আগে কাবুকির সূত্রপাত কিন্তু করে ইজুমোর এক নর্তকী। ওকুনি তার নাম। নৃত্য থেকে বিবর্তিত হলো নাট্য আর নারীর যোগদান হলো নিষিদ্ধ। সে নিষেধ আজো বলবৎ রয়েছে। নো যেমন ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাবুকি তেমন নয়। কাবুকি শিক্ষা দেয় না, বিনোদন করে। জনসাধারণ এর সমজদার।

যবনিকা উঠতেই দেখা গেল পাইন গাছের ছবি আঁকা পশ্চাৎপট। তার সামনে উচ্চাসনে বসে আছে এক সার গায়ক বা আবৃত্তিকারক। তাদের দৃষ্টি পুঁথির উপর নিবদ্ধ। তাই দেখে তারা নাটকের কাহিনীটা সুর করে গেয়ে যায়। তার পর এক সার বাদক। তাদের প্রত্যেকের হাতে সামিসেন। মঞ্চের আড়ালেও বাদক ও বাদ্য থাকে। মঞ্চের উপর রকমারি স্টেজ প্রপার্টি। সেসব কিন্তু বাস্তবধর্মী নয়। যদিও নো'র মতো অনাড়ম্বর নয়। অভিনেতা ব্যতীত আরো কতক লোক ছিল রঙ্গভূমিতে। তারা হাঁটু গেড়ে বসেছিল একটু সরে। একজন অভিনেতার হয়তো হাতিয়ার চাই, অমনি হাতিয়ার নিয়ে এল হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হেঁটে। হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়তো ফুরিয়েছে। অমনি হাত থেকে নিয়ে রেখে দিতে চলল। একটি লোক কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। কী যে তার কাজ তা বোঝা গেল না। পরে বন্ধুদের কাছে শুনলুম সে হলো প্রম্পটার। লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ছিল আর চুপি চুপি কথা বলছিল। আর একটা লোক মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে যবনিকার এক প্রান্তে বসেছিল। হঠাৎ শুনি খটখট করে কে যেন কাঠের করতালি দিচ্ছে। চেয়ে দেখি ওই লোকটা। ওর কাজ হলো দর্শকদের মনোযোগী করা। আরে, মশাই, মন দিয়ে দেখুন এইবার কী ঘটছে। জাপানীদের প্রযোজনকৌশল অতুলনীয়। অভিনেতাদের পোশাক যেমন বর্ণাঢ্য তেমনি সুদর্শন তাঁদের দেহের গড়ন।

একটিমাত্র পালা আমি পুরো দেখতে পেয়েছি। নাম "ৎসুচিগুমো।" ইংরেজীতে "আর্থ স্পাইডার" বলতে কী বোঝায় আমার তো বুদ্ধির অগম্য। অভিজাতবংশীয় মিনামোতো য়োরিমিৎসুর অসুখ করেছে। রাজঅন্তঃপুরিকা সুন্দরী কোচো তাঁর সান্ত্বনার জন্যে একটি মনোরম নৃত্য প্রদর্শন করে গেলেন। একটু পরে এসে হাজির হলো এক ভ্রাম্যমাণ সাধু মঞ্চবাহু দিয়ে। নাচল এক

ভীষণ কঠিন নাচ। অকস্মাৎ মাকড়শার জাল ছুঁড়ে জড়াতে চাইল য়োরিমিৎস্থকে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ তরবারি দিয়ে এমন এক খোঁচা দিলেন যে সাধুবেশী মাকড়শা অমনি উধাও। সোরগোল শুনে ছুটে এলেন এক বীরবর। রাক্ষুসে মাকড়শার রক্তের দাগ ধরে চললেন য়োরিমিৎস্থর সঙ্গে দূর পর্বতে, যেখানে মাকড়শার বাসা। এবার আর সাধুর বেশে নয়, নিজ মূর্তিতে দেখা গেল পিশাচকে। বাপ্‌স্‌। কী ভয়ঙ্কর চেহারা ও সাজ! সে তার ঢিবি থেকে বেরিয়ে এল হাতিয়ার হাতে। ঢিবিতে থাকে বলেই কি সে "আর্থ স্পাইডার?" লড়াইটা যা জমল তা কি শুধু মঞ্চের উপর! ঐ এলো রে আমাদের দিকে হানামিচি বেয়ে! দর্শকদের মাঝখানে! ভয় নেই। আবার ফিরে চলল। টেনসনে ফেটে পড়বে আকাশ। বাজনাও টেনসন গড়ে তুলছে। কী হয়! কী হয়! কে হারে! কে মরে! মাকড়শা হটতে হটতে ঢিবিতে কোণঠাসা হয়ে মারা গেল।

এই নাটিকাটি একটি নো নাটিকার কাবুকি সংস্করণ। নো নাটিকামাত্রেই প্রায় ছ' শতাব্দী আগে লেখা। তখনকার দিনের মানুষ দেব দৈত্য পিশাচ ভূতপ্রেত প্রভৃতিকে প্রকৃতির শক্তির মতো মেনে নিত। মেনে নিয়ে তার উপর জয়ী হবার সঙ্কেত শিখত। এখনকার মানুষের চোখে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, স্থতরাং মূল্য যদি থাকে তবে শুধু আর্টের রাজ্যে। শুধু আর্ট বা শুদ্ধ আর্ট হিসাবে নো নাটিকার বিচার হয় না। তার অনেকখানিই মন্ত্রতন্ত্র। যেমন অথর্ব বেদের। কাবুকি কিন্তু মোটের উপর আর্টের খাতিরে আর্ট। কিন্তু স্টাইলাইজ্‌ড্‌।

এর পরে যে পালাটি হলো তার নাম "শুজেনজি মোনোগাতারি।" তার প্রথম অভিনয় বিংশ শতাব্দীতেই। ১৯১১ সালে। গল্পটা কিন্তু শোগুন-শাসিত জাপানের। মুখোশনির্মাতা য়াশাও শাসকসেনাপতি য়োরিইয়ের মুখোশ গড়তে বসে কিছুতেই নিখুঁৎ মুখোশ গড়তে পারে না। শোগুন শেষকালে বিরক্ত হয়ে খুঁৎওয়ালা একটা মুখোশ কেড়ে নিয়ে যান। সেইসঙ্গে নিয়ে যান মুখোশনির্মাতার কুমারী কন্যা কাৎস্থরাকে। ওটা ছিল মৃত্যু মুখোশ। শিল্পীর দুর্নাম হবে বলে শিল্পপ্রাণ য়াশাও রাগ করে নিজের তৈরি যতগুলো মুখোশ ছিল সব ভেঙে ফেলে। জীবনে আর মুখোশ গড়বে না। ওদিকে শোগুনের শত্রুরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত। সেই মুখোশটা পরে

তাঁর প্রিয়া কাৎহুয়া শোগুন সাম্বে। শোগুন বলে ভ্রম করে তাকেই মারে শত্রুরা। ভজেনজি থেকে সে পালিয়ে আসে বাপের কাছে। বাপ কোথায় শোক করবে, না মৃত্যুর আলোয় উপলব্ধি করে তার মুখোশ গড়া সার্থক। সে যেমনটি গড়েছে তেমনিটি ঘটেছে। সুতরাং তুলি হাতে নিয়ে বসল সে মরা মেয়ের মুখ এঁকে নিতে। আবার গড়বে সে মুখোশ। সে শিল্পী।

এ নাটিকা দেখতে আমার সময় ছিল না। উঠতে হলো ওকাকুরার সঙ্গে মিলতে। তবু এর উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে কাবুকির প্রধান অবলম্বন এইসব উপাখ্যান বা মোনোগাতারি। তা সে বিশ্বাসযোগ্য হোক বা না হোক। জাপানের সাধারণ লোক সব দেশের সাধারণ লোকের মতো সেন্টিমেণ্টাল কাহিনী ভালোবাসে, তার সঙ্গে একটা লড়াই থাকলে তো সোনায় সোহাগা। আর থাকবে নাচ গান রঙের বাহার রূপের হিল্লোল। কাবুকির শিল্পপরিকল্পনায় সৌন্দর্যের স্থান আছে, কিন্তু সত্যের জন্যে আকুলতা নেই। আর্ট কি কেবল সৌন্দর্যগতপ্রাণ? সত্যই তার লবণ, যা না থাকলে সবকিছু আলুনি। এই তিন শ' বছরে বিশ হাজার কাবুকি পালা লেখা হয়েছে; তার থেকে এখনো শ' পাঁচেক পুরোনো পালা বেঁচে আছে। আমার নিজের ধারণা কাবুকির চেয়ে নো উচ্চাঙ্গের আর্ট। জীবনের সত্য সেখানে শিল্পপ্রতিমার জীবন্যাস করেছে। জনতাকে সেই উর্ধ্বে উঠতে হবে।

কাগাওয়া শিশিগাশিরা

॥ সাত ॥

দেশ ছাড়ার কিছু দিন আগে কলকাতার এক জাপানী ভদ্রলোক আমাকে চা পানের জন্যে বাড়িতে ডেকেছিলেন। গিয়ে দেখি বসবার ঘরের দেয়ালের ধারে এক পূজাবেদী। আলো জ্বলছে। ধূপ পুড়ছে। আমার দেওয়া পদ্ম-ফুলের তোড়া এক দারুমূর্তির চরণে রেখে হাত জোড় করে প্রণত হলেন কনিজুকা মহাশয়। বললেন, "ইনিই আমার ভগবান। বৈশ্রবণ কুবের। হিন্দু দেবতা। হাজার বছর আগে চীন থেকে জাপানে যান। দ্বার রক্ষা করেন। জাগ্রত দেবতা। মহাশক্তিসম্পন্ন। সিদ্ধিসৌভাগ্যদাতা।"

অবিকল হিন্দু মনোভাব। জাপানে এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই যাত্রা করেছিলুম। তবু আশ্চর্য হলুম যখন ওকাকুরা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ইনাজুর এবং ইনি আমার হাতে দিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত। কিন্তো ইনাজু একটি বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত। অধিকন্তু তামাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। উপরন্তু "জাপান বিশ্বপরিষদ্"-এর পরিচালক। পুরোহিতেরও পরিধানে পাশ্চাত্য পোশাক। কিন্তু মনটা পুরোদস্তুর প্রাচ্য। ভারতবর্ষে যাননি, কিন্তু মনেপ্রাণে আমাদেরই একজন। জাপানী ভাষায় মহর্ষির আত্ম-চরিত অনুবাদ করে ইনি ক্ষান্ত হননি, তার সঙ্গে সংযোজন করেছেন মহর্ষির বংশলতা। কে যে মহর্ষির কে হন তা ইনি মুখে মুখে বলতে পারেন। বেদ উপনিষৎ ব্রাহ্মমত এঁকে আকর্ষণ করেছে।

এঁদের সঙ্গে ছিলেন মাগোইচিরো চাতানী। ভারত-প্রত্যাগত সওদাগর। আর য়োশিএ হোত্তা। ভারত-প্রত্যাগত লেখক। গত বছর দিল্লীতে এশিয় লেখক সম্মেলনে এঁকে আমি দেখেছিলুম, কিন্তু সে সময় পরিচয় হয়নি। চার জনে মিলে কাবুকি-জা থেকে বেরিয়ে চললুম কাছাকাছি একটি রেস্টোরান্টে। মালিক জাপানী। খানা পশ্চিমী।

এঁরা সবাই চান যে আমি জাপানে দু'একমাস থাকি, দেখি শুনি আলাপ করি। কিন্তু সামনেই আমার পেন কংগ্রেসের বিজয়া দশমী। সেপ্টেম্বরের দশ তারিখেই দশাহ শেষ। কিয়োতোতে দশহরা। সেখান থেকে যে যার দেশে ফিরে যাবে। আমি আরো কিছু দিন কিয়োতো অঞ্চলে কাটিয়ে আবার তোকিয়ো আসব ও দিন দশেক থেকে আটাশের প্লেন ধরব, যদি পকেটে টাকা

থাকে। নয়তো আরো আগে উড়তে হবে আকাশে। বন্ধুরা আমাকে অভয় দিলেন যে টাকার কথা ভেবে স্থিতি সংক্ষেপ করতে হবে না, আতিথেয়তার আশা আছে, বরং থাকার মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারি। তা কি হয়! অক্টোবরস্ত ষষ্ঠ দিবস লঙ্ঘিত হবে যে! কেবল গৃহলক্ষ্মী না, সরস্বতীও অভিমান করবেন।

প্রায় প্রতিটি দিন আমি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেয়েছি। আমার উপন্যাসের নায়কনায়িকাকে নিভৃতে বসিয়ে রেখে আমি পালিয়ে এসেছি জাপানে। কেন? কোন কাজে? পেন কংগ্রেসের কাজ তো দশ দিনের বেশী নয়। তা হলে কেন আমি সোফিয়াদির সঙ্গে দশ তারিখে ফিরে যাইনে? কেন কমলাবোনের সঙ্গে চোদ্দ তারিখে ফিরে চলিনে? জন-দুই বাদে আমাদের দলের সবাই ফিরে যাচ্ছেন ওই দুই ক্ষেপে। সে দু'জনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। আর ক'দিন পরে দলচ্যুত একক লেখককে কেই বা পুঁছবে! কেইবা পার্টিতে ডাকবে! দেশ দেখাবে!

তার পরে মনে আশ্বাস পেয়েছি যে আছে আমার কাজ। সে কাজ এখনো স্পষ্ট নয়। ক্রমে স্পষ্ট হবে। জাপান আমাকে চায়। প্রতিদিন তার প্রমাণ মিলছে। কেন চায় তা কিন্তু জানিনে। এমন করে আর কোনো দেশ কখনো আমাকে চায়নি। সেতু বাঁধতে হবে ভারতের সঙ্গে জাপানের, বলেছিলেন আমাকে শিনিয়া কায়গাই। সেতু বাঁধতে পারব না হয়তো, কিন্তু রাখী বাঁধতে পারব।

পরের দিন শুক্রবার। তোকিয়োতে পেন কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন। সেদিন এক ভাষার গ্রন্থ অপর ভাষায় অনুবাদ করা নিয়ে আলোচনা সাঙ্গ হলো। প্রস্তাবও গৃহীত হলো। আমি উপস্থিত ছিলুম না। পাশের একটি কক্ষে জাপানী উডব্লক প্রিণ্ট প্রদর্শনী। সেখানে না গেলে আমার শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে যেত। সময়ও ছিল না আর।

জাপানী ভাষায় ওকে বলে উকিয়োএ। উকিয়ো মানে ভাসমান পুরী। তারই চিত্রণ উকিয়োএ। ভাসমান পুরী বলতে কী বোঝায়? আমোদ-প্রমোদের স্থান। যথা? যথা, কাবুকি রঙ্গালয় ও গেইশাগৃহ। জাপানে এর জন্যে পৃথক পল্লী ছিল। এখনো আছে। যেমন তোকিয়োর আসাকুসা। কিয়োতোর গিয়ন। প্রাচীন ভারতেও এর অনুরূপ ছিল। আধুনিক ভারতে

যদি কোথাও থাকে তবে তা অতীতের ছায়া। অতীতের কায়া আছে জাপানে।

ভারতের মতো জাপানও ছিল প্রকারান্তরে বর্ণাশ্রমের দেশ। অভিজাতরা বর্ণের শ্রেষ্ঠ। তার পরে ক্ষত্রিয় বা সামুরাই। শিল্প যা ছিল তা এঁদেরই ঘিরে। আর ধর্মমন্দিরকে জড়িয়ে। বৈশ্য-শূদ্রের জীবনযাত্রার প্রতিফলন ছিল না তাতে। তাদের এত পয়সাও ছিল না যে ঝুলন্ত পট কিনতে পারে বা সরস্ত দরজায় আঁকিয়ে নিতে পারে বা ঘরের দেয়ালকে সচিত্র করতে পারে। টাকা জমতে শুরু করল ষোড়শ শতাব্দীতে। সেটা ব্যবসাবাণিজ্যের যুগসন্ধি। যেমন আমাদের কোম্পানীর আমল। আমোদপ্রমোদ আগেকার দিনে যা ছিল তা সাধারণের রুচির ঊর্ধ্বে। এইবার পত্তন হলো পুতুলনাচের থিয়েটার। কাবুকি থিয়েটার। গেইশাগৃহের ছড়াছড়ি। ছবি আঁকা হলো কাবুকি অভিনেতাদের, রূপসী গেইশাদের। সাধারণের জীবনযাত্রার প্রতিফলন হলো ভাঁজ-করা পর্দায় বা চিত্রিত দেয়ালে। কিন্তু প্রত্যেক গৃহস্থের সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না এসব কেনার বা করানোর। তাই আবিষ্কার করা হলো কাঠের ব্লকের ছাপা। এক-একখানি ছবির হাজার হাজার প্রতিলিপি নয়, হাজার হাজার মূল ছবি। ক্রেতাদের প্রত্যেকে জানবে যে তার খানাই মূলছবি বা তার খানাও মূল ছবি। আজব এক পদ্ধতির দ্বারা এমনটি সম্ভব হয়। দামও শস্তা। অথচ শস্তা বলে খেলো নয়। বিখ্যাত শিল্পীদের বিখ্যাত সব ছবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ফুল পাখি প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়েও উকিয়োএ সৃষ্টি করা হয়। লোকরুচি প্রসারিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এর বিকাশ। তার পরে মেইজি আমলের সূর্যোদয় আর উডব্লক প্রিন্টের সূর্যাস্ত।

উকিয়োএ তুলির কাজ নয়। চাকুর কাজ। ধারালো চাকু দিয়ে কাটা কাটা আঁকাবাঁকা লাইন টানতে হয়। গোড়ার দিকে ছাপা ছবিতে তুলি দিয়ে রঙিন করা হতো, কিন্তু পরে এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয় যাতে তুলির সাহায্য লাগে না, রেখার সঙ্গে রং আপনি ফোটে। একরঙা থেকে দোরঙা, তার পরে দশরঙা, তার পরে বহুরঙা, এই বিবর্তনের ইতিহাস বিচিত্র ও বহুকালব্যাপী। পৃথিবীর আর কোনো দেশ এর খবর রাখত না, রাখলেও এর ধারেকাছে যেত না। এটা জাপানীদের একচেটে। ছাপার সঙ্গে

কাগজের সম্বন্ধ আছে। যেমন-তেমন কাগজে ছাপলে ছবি ওতরাবে না। হোশো বলে একরকম মোটা নরম কাগজ আছে, তাতে রং ভিজে অপূর্ব সুন্দর হয়। চিত্রকরের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিতে হয় খোদাইকারকে ও মুদ্রাকরকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছবির গায়ে তিনজনের স্বাক্ষর বা নামাঙ্কন থাকত। কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

উকিয়োএর প্রধান কেন্দ্র শোগুন যুগের এদো। প্রধান পটভূমি এদোর প্রমোদপল্লী য়োশিওয়ারা। প্রথম অধ্যায়ের প্রধান পুরুষ মোরোনোবু। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তিন প্রধান হারুনোবু, উতামারো, শারাকু। শারাকুর কবে জন্ম, কোথায় জন্ম, কবে মৃত্যু, কোথায় মৃত্যু, কেউ আজ পর্যন্ত জানে না। মাত্র দশটি মাস তাঁকে ছবি তৈরি করতে দেখা গেছল। দশ মাসে এক শ' চল্লিশখানা ছবি। জাপানীরা তাঁকে বেবাক ভুলে যায়। আস্ত একটা শতাব্দী চলে যায়। ১৯১০ সালে মিউনিকের এক জার্মান তাঁকে আবিষ্কার করেন। এখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত। কাবুকি অভিনেতাদের ক্ষণিকের রঙ্গীভঙ্গী ও মুখভাবকে তিনি সর্বকালের করে দিয়েছেন। ধরে রেখেছেন তাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের চরিত্র। এইজন্যেই নাকি তারা তাঁর উপর ক্ষেপে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের দুই প্রধান হোকুসাই ও হিরোশিগে। এঁরা কাবুকি অভিনেতা আর সুন্দরী গেইশা ছেড়ে রঙ্গিণী প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরান। হোকুসাই তাঁর নব্বুই বছরের আয়ুষ্কালে ত্রিশ বার নাম বদলান ও তেত্রিশ বার বাসা বদলান। ফুজি পর্বতের রহস্যের তিনি অন্ত পান না, তার রঙ্গীভঙ্গী ও মুখভাবকে নানা স্থান থেকে নানা কোণ থেকে নিরীক্ষণ করেন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর বীক্ষণের ধারা আত্মগত নয়, বস্তুগত। ভাবপ্রভব নয়, যুক্তিপ্রভব। হিরোশিগের বেলা বিপরীত। ঝড় বৃষ্টি বরফ কুয়াশার কবিত্বময় বর্ণনা তাঁর জাপানী প্রকৃতিকে যতখানি ব্যক্ত করে বহিঃপ্রকৃতিকে ততখানি নয়। এই পর্যন্ত এসে উকিয়োএ অস্ত গেল। শুধু সে নয়। গোটা শোগুন যুগটা।

নতুন জাপান ইউরোপের কাছে শিখল লিথোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফি ও তামার ফলকে ছাপার কৌশল। উকিয়োএর চেয়ে আরো শস্তায়, আরো বেশী সংখ্যায়। জনগণের প্রয়োজন আরো সহজে মিটল। আর সেকালের সেইসব প্রমোদস্থলী থেকে জীবনের স্রোত অনেকদূর সরে এসেছিল। আধুনিক

যুগ তাকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে চলল। জনগণের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হলো। ভারতের সাধারণ লোকও কি আর কালীঘাটের পট কিনতে চায়? কোম্পানীর আমলের পর মহারানীর আমলে সকলেরই রুচি বদলে যায়। যেমন শিক্ষিত মহলে তেমনি অশিক্ষিত স্তরে। ইতিমধ্যে সেটা আরো প্রকট হয়েছে। রুচিবদল বললে রুচির উন্নতি বোঝায় না কিন্তু। শিল্পকাজের উৎকর্ষও না। উকিয়োএ সেকেলে হলেও একালের চিত্রকর্মের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক নয়। ইউরোপেও তার প্রভাব পড়েছে। দেখতে দেখতে মনে হয় কী মায়াবী দেশ ছিল জাপান! ভানুমতীর নিজের রাজ্য। ইচ্ছা করে মায়াশতরঞ্চে বসে উড়ে যেতে এক যুগ থেকে আরেক যুগে। এ যুগ থেকে ও যুগে। পাগল করে দেয় অজ্ঞাতনামা শিল্পীর সৃষ্টি কাম্বুন আমলের নৃত্যপরা সুন্দরী। কী অপূর্ব তার ভঙ্গী, তার গতিবেগ, তার অঙ্গবাস, তার হাতে ধরা পাখা, তার টানা টানা চোখ, তার নাসা আর কেশ আর মুখ।

জাপান যে নতুন করে সভ্য হলো তা নয়। সে সভ্য ছিল, কারো কারো মুগ্ধ নেত্রে সভ্যতর ছিল। পূর্বযুগের মায়া-অঞ্জন যারই চোখে লেগেছে তারই সে বিভ্রম জাগবে। আমিও মাঝে মাঝে ভেবেছি কী এমন ক্ষতি ছিল জাপান যদি চিরকাল মধ্যযুগের মায়াপুরী হয়ে আর সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে যেত! তা হলেই আর সকলে তার ধনে ধনী হতো। কিন্তু ও ভাবনা ভুল। আমার সহজ বোধ আমাকে সজাগ করেছে, এই রাজ্যের উপর কী যেন একটা অভিশাপ আছে। কোথায় কী যেন একটা গলদ। সেইজন্যে ত্যাগ আর বীর্য আর শ্রম আর সৌন্দর্য আর বুদ্ধি আর বিবেক থেকেও ঠিকমতো মিশ্রণ হয়নি।

এশিয়া ফাউণ্ডেশনের মার্কিন ও জাপানী বন্ধুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মধ্যাহ্ন-ভোজন। ভারতীয়দের খাতিরে। খেতে খেতে দেরি হয়ে গেল। বাস ছেড়ে দিল পেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের নিয়ে গবর্নরের অনুগ্রহে তোকিয়ো শহর ঘুরিয়ে দেখাতে। বাস কোনখানে দাঁড়াবে তার নাম যোগাড় করে ট্যাক্সি ডেকে বলা হলো, চালাও জলদি। ট্যাক্সিতে জনা দুই মহিলা, জনা দুই পুরুষ। বাইরে লেখা আছে—আশি ইয়েন। জাপানের এটি একটি উত্তম প্রথা। বড় ট্যাক্সি একশ' ইয়েন। মেজ ট্যাক্সি নব্বই ইয়েন। সেজ ট্যাক্সি আশি ইয়েন। ছোট ট্যাক্সি সত্তর ইয়েন। প্রথম দুই কিলোমিটার এই

ভাড়ায় যায়। তার মানে সওয়া মাইল। এ হলো তোকিয়োর হার। অন্যান্য শহরে অন্যান্য হার। এখানে বলে রাখি যে জাপানীরা সংখ্যা লেখে ইংরেজদের মতো আরব্য পদ্ধতিতে। মুদ্রায়, নোটে, টিকিটে—সর্বত্র ঐ পদ্ধতি। রোমক লিপির ওয়াই কেটে ইয়েন সূচনা করা হয়।

তা আমাদের সেজবাবু তো আমাদের নিয়ে চললেন। জোয়ান মদ্দ। গুণ্ডার মতো চেহারা। যাকে দেখে তাকেই শুধায়, আরে ভাই এই প্রাসাদটা কোথায়? শুনে নিয়ে আমাদের দিকে বীরদর্পে তাকায় আর একগাল হাসে। আর সবজান্তার মতো বলে, "হাই।" তার পর হাওয়ার মতো ছোটে। , আর হঠাৎ ব্রেক টিপে ধরে যাকে পায় তাকে ডেকে আবার শুধায়, আরে ভাই। রাস্তায় সে কী ভিড়! যানে-মানুষে টানাটানি। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেজবাবু বলছেন, আরে ভাই। তার পর হেঁকে উঠছেন, "হাই।" আর ধাঁই করে চালিয়ে দিচ্ছেন শ্বাস-কেড়ে-নেওয়া বেগে। জাপানী জানিনে, তাই বলতে পারছিনে, আরে ভাই, থাম। অমন করে ধনেপ্রাণে মেরো না। আমরা নেমে যাই। আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাই যে আর কাজ নেই চালিয়ে। কিন্তু উলটো বুঝলি রাম। কী! এত অবিশ্বাস! আমি জানিনে রাস্তা! আরো জোরসে চালায়। আমরা চোখ বুজে ইষ্টদেবতা স্মরণ করি। সোফিয়াদি, কমলাবোন, এঁদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। আমারও।

ডাকু কিন্তু ঠিক পৌঁছিয়ে দিল আমাদের। বকশিস্ চাইল না। ইউরোপ হলে চাইত। লোকটা সত্যি খুব ভালো। মন্তব্য করলেন সোফিয়াদি। আমিও স্বীকার করলুম যে ওর ওই হাসি দিলখোলা সরল প্রাণের হাসি। "আরিগাতো গোজাইমাসু" বলে ধন্যবাদ দিলুম ওকে। দেখলুম যেখানে এনেছে সেটা একটা প্রাসাদ। পুরোনো এক সম্রাজ্ঞীর। এখন সেখানে রেশমের গ্যালারি হয়েছে। "সিল্ক রোড সোসাইটি" বলে রেশমশিল্পের উন্নতিকামীদের একটি প্রতিষ্ঠান ওর পরিচালক। রেশম কিনলুম আমরা। মেয়েরা রেশম বয়ন করছিল। রকমারি তাঁত। সংলগ্ন উদ্যানে গিয়ে পায়চারি করলুম। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম যে তোকিয়ো শহরে আছি।

তার পর চল চল রব। এবার সদলবলে বাসযোগে নগরপরিক্রমা। তোকিয়োর নয়ী দিল্লী। যত রাজ্যের সরকারী বিভাগ। তার পর যেতে যেতে সম্রাটের প্রাসাদভূমির সীমানা। সীমানার বাইরে পরিখা। বাসে

আমাদের গাইড ছিল একটি মেয়ে। সে বলল, "তোকিয়ো শহরের এই একমাত্র ঠাঁই যার জন্যে আমি গর্বিত।"

তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার দিয়ে বাস্ চলল উএনো অঞ্চল ছাড়িয়ে। শিনোবাজু পুষ্করিণী। রাশি রাশি পদ্মপত্র। ফুল দেখলুম না একটিও। আমার ধারণা ছিল জাপানে পদ্ম নেই। সেটা ভুল। আমাদের ইম্পিরিয়াল হোটেলের সামনেই তো পদ্মপুকুর। বুদ্ধমূর্তিরও পদ্মাসন জাপানে।

আসাকুসায় কান্নন বোসাৎসুর মন্দির। কান্নন হলেন অবলোকিতেশ্বর। বোধিসত্ত্ব। বোসাৎসু। বোধিসত্ত্বরা স্ত্রীও নন, পুরুষও নন। খ্রীস্টানদের এন্‌জেলদের মতো তাঁরা নরনারীভেদের উর্ধ্বে। কিন্তু চীনদেশে ওরা অবলোকিতেশ্বরকে নারীরূপে কল্পনা করে। তাই জাপানেও অবলোকিতেশ্বর হলেন নারী। নামকরণ হলো কান্নন। বিদেশীরা ভুল বুঝে দেবতা বলেন। "Goddess of Mercy." বুদ্ধের পরেই কান্ননের জনপ্রিয়তা। এমন-কি বুদ্ধের চাইতেও বেশী প্রভাব। যেমন শিবের চেয়ে শক্তির।

এই মন্দিরকে সেন্‌সোজি বলা হয়। এর অধিষ্ঠাত্রী কান্নন বোসাৎসু, তাই লোকমুখে এর পরিচয় কান্নন বোসাৎসুর মন্দির। এর প্রতিষ্ঠাকাল ৬২৭ সাল। তার মানে তেরো শ' বছর আগে। তা বলে বর্তমান মন্দিরগৃহটি তত পুরাতন নয়। জাপানে অগ্নিদেবতার প্রতাপ সব দেবতার চেয়ে বেশী। সেইজন্যে প্রাচীন মন্দিরগৃহ বড় একটা দেখা যায় না। দ্বিতীয় মহাসমরের শেষভাগে সারা আসাকুসা অঞ্চলটাই ধ্বংস হয়ে যায়। দশ বছরের মধ্যেই মন্দিরের প্রধান মহল পুনর্নির্মিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ ভক্তের চেষ্টায়। এখনো অন্যান্য অংশের পুনর্নির্মাণ বাকী।

এই মন্দিরের বিশেষত্ব প্রকাণ্ড একটি লাল কাগজের লণ্ঠন। গেইশাদের উপহার। আর-এক বিশেষত্ব মন্দিরে যাবার দীর্ঘ সরণির দু'ধারে দু'সারি বিপণি। একে বলে নাকামিসে। সপ্তদশ শতকের স্মারক। তোকিয়োতে এত বেশী কেনাবেচা খুব কম বাজারে হয়। শস্তায় কিনতে চাও তো নাকামিসে যাও। নিকটেই গেইশাপল্লী। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল।

বাস থেকে নেমে দেখি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন একটি অভ্যর্থক মণ্ডলী। মন্দিরের তরফ থেকে। মণ্ডলীর ওরাও আমাদের প্রায় সমসংখ্যক। বেশীর ভাগই অল্পবয়সী মেয়ে। আমার অনুমান কুমারী

মেয়ে। কেশবিন্যাসের স্টাইল থেকে আর কোনো অনুমান আমায় মনে জাগেনি। ফুটফুটে লক্ষ্মী মেয়ে, যেমন কচি তেমনি নিরীহ। আহা! কেমন ভক্তিমতী! তীর্থঙ্করদের স্বাগত জানাতে এসেছে।

সদলবলে নাকামিসের ভিতর দিয়ে চলেছি। দোকানদাররা হাঁ করে দেখছে নানা দেশের লেখকলেখিকাদের। আমরাও হাঁ করে দেখছি দোকানে সাজানো শিল্পজাত সামগ্রী। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আমাদের স্বাগতকারিণীর দল। এমন সময় কে একজন কর্তাব্যক্তি আমাদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, "হাত ধরাধরি করে চলুন। জোড়ে জোড়ে চলুন।" যেন আকাশ-বাণী হলো।

আমার পাশে পাশে চলছিল একটি ষোল-সতেরো বছর বয়সী স্বাগত-কারিণী। একটু ইতস্তত করে তার হাতে হাত মেলালুম। সে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে আমার হাতে হাত রাখল। স্মিত হেসে বলল, "ইঙ্গিরিশি নো।" বুঝতে সময় লাগল যে ও বলছে, ইংরেজী জানিনে। কথাটি না বলে হাতে হাত দিয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, কই, আর কেউ তো আমার মতো আকাশবাণী মানছে না। তবে কি—

দেখে নিশ্চিন্ত হলুম যে আরো একজন আমারই মতো হাতে হাত রেখে চলেছেন। ফরাসী কি ইটালিয়ান। তবু মনটা সায় দিল না। ভাবলুম কী করে হাত ছাড়ি। ছাড়লে কি মেয়েটির মনে লাগবে না! তা বলে কাঁহাতক সোয়া মাইল পথ পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটা যায়। এমন সময় দেখি মেয়েটি আপনা থেকে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে তার সখীর সঙ্গে একত্র হলো। আমিও আমার স্বদলের সঙ্গে এক হয়ে গেলুম।

সেন্‌সোজির পুরোহিত আমাদের আদর করে এক-একটি উপহার দিলেন। আমরাও তুলি দিয়ে নাম সই করলুম। দিব্যি ভিড়। ভক্তজন হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছেন, মাথা নোয়াচ্ছেন, ভিক্ষাধারে মুদ্রা নিক্ষেপ করছেন। আসল মূর্তিটি দেখতে দেওয়া হয় না। শুনেছি সেটি ছোট্ট একটি সোনার বিগ্রহ। তেরো শ' বছর আগে তিনটি জেলে সেটি সুমিদা নদীতে জাল ফেলে মাছের সঙ্গে পায়। মহারানী সাইকোর রাজত্বে।

ফিরতি পথে কেউ আমাদের পার্শ্বচর হলো না। দলটাও ছত্রভঙ্গ। বৃষ্টি পড়ছিল। কাপড়চোপড় বাঁচিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বাসে গিয়ে উঠি।

তারপর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আবিষ্কার করি যে ওই মেয়েগুলি গেইশা। গেইশার হাত ধরে প্রকাশ্য রাজপথে চলেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। দৃশ্যটা কল্পনা করতেই আমার বলতে ইচ্ছা গেল, মা ধরণী দ্বিধা হও।

আমাদের গাইড মেয়েটি বেশ ইংরেজী বলে। পরনে গাইডের ইউনিফর্ম। খোঁপার উপর ক্যাপ। একটুখানি বেঁকানো। প্রাণোচ্ছলা। রসিকা। বাস চলতে আরম্ভ করলে তারও মুখ চলতে শুরু করল। "এই রাস্তায় ওই যে সব বাড়ী দেখছেন ওখানে কারা থাকে, জানেন? গেইশারা। গেইশা কাদের বলে, জানেন? যারা প্রোফেসনাল এণ্টারটেনার।"

কথাটা আরো দু-এক জায়গায় শুনেছি। সেকালে এর জন্যে লজ্জাবোধ ছিল না। একালে জগৎ এসে হাজির হয়েছে জাপান দেখতে। তার ভালোমন্দের নিরিখ অন্যরকম। তাই তাকে বোঝাতে হয়, বুঝ দিতে হয়, এরা প্রোফেসনাল এণ্টারটেনার।

মেয়েটি আরো বলল, "দি গেইশা ইজ এ প্রাউড পার্সন। সে কারো অনুকম্পা চায় না।" জাপানের গেইশাদের ঐতিহ্য সেইরকমই বটে। তাদের ত্যাগ তাদের মহত্ত্ব দেশবিশ্রুত। অনেকেই তারা মা-বাপের দুঃখ দেখতে না পেরে গেইশা হয়ে অর্থ সাহায্য করে। অনেকেই শিক্ষিতা, বিদ্যাবুদ্ধিতে পুরুষের সমকক্ষ। কেউ কেউ সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়, কেউ কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেলে বিয়েও করে। লাফকাডিও হার্ন আই বলে সে মেয়েটির কাহিনী লিখেছেন সে ভালোবাসা পেয়েছিল, ভালো বর পেয়েছিল, ভালো ঘর পেয়েছিল, শ্বশুর-শাশুড়ীরও মত ছিল, কিন্তু বিয়ে না করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল. বহুকাল পরে জানা গেল সে সর্বস্ব ত্যাগ করে বুদ্ধের শরণ নিয়েছে। কেন? তার ঔচিত্যবোধ তাকে নিবর্তন করেছিল। "তোমার স্ত্রী হয়ে আমি তোমার লজ্জার কারণ হব না।"

যেতে যেতে আমাদের গাইড বলল, "আচ্ছা, আপনারা কি কখনো জাপানী গান শুনেছেন? শোনাব একটা?" গাইড হতে হলে ও বিদ্যাও শিখতে হয়, তার পরিচয় দিল। স্বদেশপ্রেমের গান কি নিছক প্রেমের গান ঠিক মনে পড়ছে না। তারিফ করলুম আমরা। তখন সে আরো একটা গান গেয়ে শোনাল। চলন্ত বাসে। শহরের মাঝখানে।

এর পরে গাইড বলল, "আমাদের জাপানীদের জীবনে চারটি পরম আতঙ্ক।

একটি হলো ভূমিকম্প। জানেন তো ১৯২৩ সালের ভূমিকম্পে এই তোকিয়ো শহরটাই ধ্বংস হয়? দ্বিতীয়টি হচ্ছে আগুন। আগুন যে-কোনো দিন যে কোনো জায়গায় লাগতে পারে। তৃতীয়টির নাম টাইফুন। এই তো তার সময়। আর চতুর্থটির নাম?"

ভেবেছিলুম এর পরে আসছে পরমাণু বোমা। মেয়েটি একগাল হেসে আমাদের মাথায় পরমাণু বোমাই ফেলল। "হাজব্যাণ্ড! হাজব্যাণ্ড ইজ দি গ্রেটেস্ট টেরর অফ জাপান।" তারপর আশ্বাস দিল, "তবে আর বেশী দিন নয়। জমানা বদলে যাচ্ছে। আর এক পুরুষ বাদে স্বামীমহাপ্রভুদের এত তেজ থাকবে না।"

ইশিকাওয়া ওকিআগারি

॥ আট ॥

টাইফুন! টাইফুন! এই তার সময়। আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন কাওয়াবাতা। এবার তোকিয়ো কাইকানের নৈশ ভোজে। তিনি অবশ্য চান না যে টাইফুন আসে, কিন্তু তাঁর কথাবার্তার ধরন থেকে মনে হলো তিনি ওই অভিসারিকার পায়ের ধ্বনি শুনতে না পেয়ে একটু যেন নিরাশ হয়েছেন। ওদিকে খবরের কাগজে রোজ লিখছে, "তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি? সে যে আসে, আসে, আসে।"

সেই বিরাট ভোজনকক্ষে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পানাহার গল্পগুজব ও বক্তৃতা একসঙ্গে চলছিল। ফরাসীদের দলে আমিই একমাত্র অরসিক যে সোমরসে বঞ্চিত। কিন্তু পানে আমার বিতৃষ্ণা থাকলেও আহারে অগ্নিমান্দ্য ছিল না। জাপানীরা রাঁধে ভালো, খাওয়ায় ভালো আর ক্ষুধাও অত ঘোরাঘুরি করলে ভালোই পায়। তা সত্ত্বেও আমার মুখের খাদ্য মুখে রুচল না যখন শুনলুম কাওয়াবাতা বলছেন, পেন কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্যে জাপানীরা মুক্ত হস্তে চাঁদা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বড়লোক মাঝারি লোক তো আছেনই, আর আছেন স্কুলকলেজের ছাত্র, কলকারখানার মজুর, এমন কি যক্ষ্মানিবাসের রোগী। সারা জাপান সাড়া দিয়েছে।

সত্যি! লেখক হয়ে এমন সম্মান আর কোথাও পাইনি। যেখানেই যাই পেন কংগ্রেসের লেখক বলে লোকে দু'বার চেয়ে দেখে। কোথাও পেন কংগ্রেসের নাম-লেখা লাল শালু, কোথাও পেন কংগ্রেসের নাম-আঁকা আতশবাজি। যেন আমরা কৃতার্থ করে দিতে এসেছি। সুধীন ঘোষ আমাকে আগেই বলেছিলেন, দেখবেন জাপানীরা খুব খাতির করবে। ওরা ইংরেজদের মতো লেখকদের সম্বন্ধে উদাসীন নয়।

এসব ভোজসভার অবলম্বন অবশ্য পানাহার, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক পরিচয়। আমার টেবিলে এক ফরাসী মহিলা বসেছিলেন, কী একটা কথা-প্রসঙ্গে তাঁকে বললুম, "কিন্তু মার্কিনরা তো ফ্রান্সকে ভালোবাসে।"

ভদ্রমহিলা শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "হুঁ! ভালোবাসে! গ্রাস করতে ভালোবাসে!" এর পর তিনি যা বললেন তার অর্থ মার্কিনের ভালোবাসা রাহুর প্রেম।

"কিন্তু ইংরেজরা অমন নয়। ফ্রান্সকে ওরা আপনার মনে করে।"

"হাঁ, হাঁ! আপনার মনে করে! আপনার সম্পত্তি কিনা! যাকে খুশি বিলিয়ে দেবে!"

"তা হলে, মাদাম, কারা আপনাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু?"

ভদ্রমহিলা আমাকে বিমূঢ় করলেন। "কেন? জার্মানরা!"

শুনুন। শুনুন। ফরাসীদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু জার্মানরা। কালে কালে কত শুনবেন। হয়তো শুনবেন জাপানীদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু মার্কিনরা। মার্কিনদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু রুশেরা।

"কিন্তু, মাদাম, ওরা যে আপনাদের ঠেঙিয়ে টিট করে দিল বার বার। এই সেদিনও কী মারটাই না মারল! এত কাল শুনে এলুম জার্মানরা ফরাসীদের জাতশত্রু।"

ভদ্রমহিলা আমাকে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, "জার্মানরা মানুষ ভালো। যুদ্ধের সময় কত কী খারাপ কাজ করতে হয়। কে না করে? তা বলে কি মানুষ খারাপ হয়ে যায়? জার্মানদের অনেক সদ্‌গুণ আছে। ওদের সঙ্গে আমাদের কিসের ঝগড়া?"

আসলে জার্মানদের সঙ্গে ফরাসীদের আর কোনো স্বার্থের সংঘাত নেই। ওরা তো আলজিরিয়ায় ফরাসীনীতি নিয়ে উচ্চবাচ্য করছে না। অস্ত্র পাঠাচ্ছে না টিউনিসিয়ায়। নয়তো ভদ্রমহিলার মুখে ওদের নিন্দাবাদও শোনা যেত। তা ছাড়া ফরাসী জার্মান ওলন্দাজ বেলজিয়ান ইটালিয়ান মিলে নতুন একটা সমবায় গড়ে উঠছে। "লিটল ইউরোপ।" এই বছরের প্রথম দিন থেকেই ওদের মাঝখানে আমদানি-রপ্তানির মাশুল উঠে গেল, যেতে আসতে বিধি-নিষেধ থাকবে না। জাতীয়তাবাদের উপরে উঠতে চেষ্টা করছে পশ্চিম ইউরোপের লোক। কবে কে কাকে ঠেঙিয়ে টিট করে দিয়েছে সেসব কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। ভারত পাকিস্তানের লোকেরও।

তোকিয়োতে পেন কংগ্রেসের এইখানেই যবনিকা। এর পরের অঙ্ক কিয়োতো। কিন্তু অনেকেরই সেখানে যাওয়া হবে না। সুতরাং এই দেখাই শেষ দেখা। বিদায়ের সুর বাজছিল বক্তৃতায়, কথাবার্তায়। অস্তি গোদাবরী-তীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ। সেখানে নানা দিগ্‌দেশাগত পক্ষী একরাত্রের জন্যে একত্র হয়। ভোর হলে কে কোথায় উড়ে যায়। তবু তো পরের দিন

আবার তারা উড়ে আসে। সবাই নয় যদিও। আমাদের উড়ে আসার সুদূরতম সম্ভাবনাও নেই। এতগুলি পাখীর তো নয়ই।

এই ক'দিনে অনেকের সঙ্গে মুখচেনা হয়েছিল। কতকের সঙ্গে চেনা-শোনা। তাই ক্ষণকালের জন্যে হলেও একটা বিষাদের ছায়া পড়ল মুখে যখন এলমার রাইস বললেন তিনি আমাদের সঙ্গে কিয়োতো আসছেন না, ফিরে যাচ্ছেন আমেরিকায়। একবার কী একটা প্রসঙ্গে আমি তাঁর শ্রবণে বলেছিলুম, "আমেরিকানরা স্বামী হয় ভালো।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি পালটা দিলেন, "কিন্তু ঘন ঘন স্ত্রী বদলায়।" নাট্যকারের উপযুক্ত ডায়ালগ। লোকটি নিরহঙ্কার। স্নেহশীল।

জাপানে রওনার আগে আমার বৈরাগ্য উদয় হয়েছিল। গৃহিণীকে বলেছিলুম মাছমাংস ছেড়ে দেব। তা শুনে তিনি বলেছিলেন, ছাড়তে চাও ফিরে এসে ছেড়ো। স্ত্রীবুদ্ধি শুভঙ্করী। নইলে সে রাতের সেই বিদায়-ভোজে আমাকে প্রায় অভুক্ত থেকে যেতে হতো। সোফিয়াদির মতো। তাঁকে বসিয়েছে সম্মানিত অতিথির টেবিলে, কিন্তু ভুলে গেছে যে তিনি বা তাঁর মতো অনেকে নিরামিষাশী। একই ব্যাপার হলো পরের দিন কিয়োতোর সেনবংশের চা-অনুষ্ঠানে। সে কথা যথাকালে।

পরের দিন ভোরে উঠে তৈরি হয়ে নিয়ে প্রাতরাশ ও তার পরে হোটেল থেকে তোকিয়ো স্টেশন। হিবিয়া থেকে মারুনৌচি। এ পাড়া ও পাড়া। মিনিট পাঁচেকের বাস-দৌড়। মালপত্র কতক রেখে গেলুম হোটেলে, কতক একদিন আগে থাকতে দিতে হয়েছিল টুরিস্ট ব্যুরোর হেফাজতে, তারা পৌঁছে দেবে কিয়োতোর মিয়াকো হোটেলে। সঙ্গে ছিল ছোট একটি ব্যাগ আর শান্তিনিকেতনের ঝোলা।

কিয়োতো পড়ে ওসাকার পথে। ওসাকাগামী ট্রেনের নাম "সাকুরা"। চেরীফুল। কী সুন্দর নাম! জাপানের লিমিটেড এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির নামগুলি এমনি কবিত্বময়। যেটিতে কিয়োতো থেকে ফিরি সেটির নাম "ৎসুবামে"। সোয়ালো পাখী। এগুলি অত্যন্ত দ্রুতগামী। পথে খুব কম জায়গায় দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। বিদ্যুৎ দিয়ে চলে অবশ্য জাপানের সব ট্রেনই আমাদের এই পথে। তবে সব ট্রেন সমান চঞ্চল নয়। সমান পরিষ্কারও নয়। ভাড়ার তারতম্য আছে একই শ্রেণীতে। টিকিট আমাকে

কাটতে হলো না, ওরাই কাটল, কিন্তু তার পদ্ধতিটা বেশ মজার। একখানা হলো মূল টিকিট। তোকিয়ো থেকে কিয়োতো। তার উপর আর একখানা এক্সপ্রেস ট্রেনের। তার উপর আরো একখানা লিমিটেড এক্সপ্রেস ট্রেনের বা সংরক্ষিত আসনের।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ভারতের রেলপথের দ্বিতীয় শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই একই শ্রেণী। আসনগুলো গদিমোড়া, ঠেলা দিলে নেমে যায়, আরাম কেদারার মতো। সকলের মুখ ইঞ্জিনের দিকে। এক এক সারিতে দু' দু' জোড়া আসন। মাঝখানে চলাফেরার পথ। সে পথ সারা ট্রেনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চলে গেছে। এক কামরা থেকে গিয়ে আরেক কামরায় আড্ডা দিয়ে আসা যায়। তৃতীয় শ্রেণীও বেশ আরামের। সেখানেও আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট। গদিমোড়া আসন। তবে অল্পস্বল্প তফাৎ আছে।

বিমানে বসেছিলুম আমরা আটজন ভারতীয় লেখক। একজন লেবানন-বাসী লেখকও। আর ট্রেনে বসলুম আমরা পাঁচ মহাদেশের শ' দুয়েক লেখক। এক ট্রেনে এতসংখ্যক লেখক কখনো কোথাও ভ্রমণ করেছেন কি? বলতে গেলে আস্ত একটা কংগ্রেস চলেছে এক ট্রেনে। সাত ঘণ্টার পথ।

ট্রেন চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তোকিয়ো শহরও চলেছে। সে যেন ফুরোবার নয়। সে যদি বা সারা হলো শুরু হলো য়োকোহামা। দেখতে দেখতে ক্রমে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, কে একজন বলে উঠলেন, "বুদ্ধ। বুদ্ধ।" প্রকাণ্ড এক বিগ্রহ আকাশতলে উপবিষ্ট। একটু যেন সামনের দিকে ঝুঁকে। একটু যেন সবুজ বরণ। এই কি সেই কামাকুরার বুদ্ধ? পরে জেনেছিলুম এটি আমাদেরি কালের এক শিল্পীর অসমাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। করুণার দেবী কান্নন। কামাকুরার বুদ্ধমূর্তির মতো ব্রঞ্জনির্মিত নয়। আধুনিক উপকরণে গঠিত।

কখন এক সময় দেখি সমুদ্র। এই সেই প্রশান্ত মহাসাগর যার উপর দিয়ে উড়ে এসেছি। বালুকাময় বেলাভূমি দেখতে পেলুম না। এক জায়গায় পাথরের উপর বসে ছেলেরা মাছ ধরছে। সমুদ্র ধীরে ধীরে অদর্শন হয়ে গেল। বিরলবসতি বনের ভিতর দিয়ে চলেছি। আবার

এলো সমুদ্র। এবার দেখতে পেলুম সমুদ্রের ধারের ছোট ছোট শহর। জাপানের রিভিয়েরা। স্বাস্থ্যের জন্যে যেখানে যায়। উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করে। ওদাওয়ারা। আতামি। আতামির কথায় মনে পড়ল তানিজাকি এখানে থাকেন। কিয়োতো থেকে ফিরে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আতামি আসা যাবে।

এর পরে এলো সুড়ং। বেশ দীর্ঘ। তার পর আবার সমুদ্রকূল। ক্রমে তাও মিলিয়ে গেল। পাহাড়ে রাস্তা। মাঝে মাঝে শহর। ছোট ছোট কারখানা। বড় বড় কারখানারও বাড়ীঘর ভারী নয়। তার পর এলো বৃহৎ নগর নাগোইয়া। চিমনীতে চিমনীতে ছেয়ে গেছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মলিন। প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করলুম। লোকের ভিড়, কিন্তু হৈচৈ হাঁকডাক নেই। কেবল সুর করে বিড়বিড় করছে ফিরিওয়ালা। সিগারেট চকোলেট পত্রিকা ইত্যাদি তার ডালায়। রকমারি জাপানী খাবার প্যাকেট বেঁধে বিক্রি হয়। অনেকের মধ্যাহ্নভোজন সেইভাবে হয়।

জাপান টুরিস্ট ব্যুরো আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছে। তারাই দিয়ে গেল আমাদের আসনে লাঞ্চ খাবার প্যাকেট। খুলে দেখি পাশ্চাত্য পদ্ধতির। সঙ্গে দিয়েছে ছুরি কাঁটা। কিসের তৈরি মনে পড়ছে না। প্ল্যাস্টিকের না বাঁশের। তাই দিয়ে মুরগি খাওয়া গেল। কিন্তু গলা ভেজাবার জন্যে জল কোথা পাই? বলে কোনো ফল হলো না। অগত্যা আমার প্রতিবেশী আর আমি চলন্ত ট্রেনে টলতে টলতে চললুম ডাইনিং কারে জল খেতে। ছোট এতটুকু ডাইনিং কার। সামান্য জনকয়েকের আয়োজন। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা হয় না। বোঝা গেল লাঞ্চ প্যাকেট কিনে খাওয়াই রীতি। জলও দিয়ে যায় করিডোর দিয়ে ছুটি মেয়ে। চা ইত্যাদি পানীয় তাও বেচতে আসে করিডোরে।

হাঁ, ডাইনিং কার থেকে ফিরে আসার সময় দেখা ডাক্তারের সঙ্গে। সেই যে জার্মান ডাক্তার যিনি আমাকে সেদিন রাত্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর মোটরে করে আমার হোটেলে। তিনিও চলেছেন কিয়োতো, আমাদেরই দলে। জাপান পেন ক্লাবের তিনিও একজন সদস্য কিংবা বন্ধু। জাপান পেন ক্লাবের সদস্যতালিকায় দেখেছি বিদেশীদেরও নাম। অন্য ভাষার লেখককেও তাঁরা সদস্য করে নেন। এই উদারতা অনুকরণযোগ্য।

কথায় কথায় ডাক্তার বললেন, "মেয়েটির বয়স বেশী নয়, কিন্তু এরই মধ্যে ওর উপন্যাসটির ছ'লাখ কেটেছে। শোনেননি নাম? 'বাঙ্কা'। সিনেমা হয়েছে। সেদিন দেখে এলুম। হারাদা। য়াসুকো হারাদা লেখিকার নাম।"

জাপান পেন ক্লাব আর ইউনেস্কোর জাপানী ন্যাশনাল কমিশন মিলে চমৎকার একখানি "Who's Who" সংকলন করেছেন। তাতে জাপানের ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য লেখকলেখিকার কমবেশী পরিচিতি আছে। শেষের দিকে দেখা যায় বিভিন্ন সাহিত্য সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের নাম। এবং বিচিত্র পুরস্কারের তালিকা। তারই এক জায়গায় দেখি নারী সাহিত্যিক সমিতির পুরস্কার পেয়েছেন য়াসুকো হারাদা। পুরস্কারের উপলক্ষ "বাঙ্কা"। প্রাপ্তির সাল ১৯৫৭। পূর্ববর্তী সালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্যে। তাঁর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত হয়েছেন তোমি ওহারা। তাঁর উপন্যাসটির নাম "স্ট্রেপ্টোমাইসিন থেকে বধির"।

এই যেমন নারী সাহিত্যিক সমিতি উপন্যাসের জন্যে পুরস্কার দেন তেমনি জাপান সাহিত্য উন্নয়ন সমিতি থেকে আকুতাগাওয়ার নামে পুরস্কার দেওয়া হয় সাহিত্য জগতে নতুন নতুন লেখকদের পরিচয় ঘটানোর জন্যে। ১৯৫৫ সালে এঁরা পুরস্কার দেন শিন্তারো ইশিওয়ারাকে। এই ছেলেটি এখন জাপানের সব চেয়ে জনপ্রিয় লেখক। এঁর উপন্যাস "সৌর ঋতু" একালের ছেলেমেয়ের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জীবনবেদ। তার থেকে চলতি হয়েছে একটা বক্রোক্তি—"সৌর পরিবার"। অর্থাৎ গোল্লায় যাওয়া উত্তরপুরুষ।

চলন্ত ট্রেনে হৈ হৈ করে বেড়িয়ে সুখ আছে। কিন্তু পাশাপাশি বসবার জায়গা তো পাওয়া যায় না। সব গোনাগুনতি। করিডোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আড্ডা দেওয়া যায়! দুটো-একটা কথা অনেকের সঙ্গেই হলো। বিশেষ করে আঁদ্রে শাঁসঁর সঙ্গে। তিনি প্যারিসেই বাস করেন, তবে তাঁর আসল বাড়ী হলো দক্ষিণ ফ্রান্সে। প্রোভাঁসে। প্রায়ই সেখানে গিয়ে থাকেন। "প্রোভাঁসের ভাষা তো ফরাসীরই একটি উপভাষা?" আমার অজ্ঞতা দেখে শাঁসঁ কী মনে করলেন, তৎক্ষণাৎ বললেন, "না, না, স্বতন্ত্র ভাষা।" তিনি তাঁর মাতৃভাষায় কবিতা লেখেন। আর উপন্যাস লেখেন ফরাসীতে।

সেই দিন কি অন্য কোনো দিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আন্তর্জাতিকতা ভালো জিনিস বইকি। ও না হলে দুনিয়া বাঁচবে না। আবার

জাতীয়তাও ভালো জিনিস। এ না হলে না হবে কাব্য, না হবে আর্ট, না হবে সঙ্গীত। চাই সামঞ্জস্য।"

কখন এক সময় দেখি হ্রদ। চোখ জুড়িয়ে গেল নীলাঞ্জন মেখে। কাচের জানালার ধারে বসে আছি। ক্রমে বাঁধছি এক-একখানি ছবি। দিনটা গরম, যদিও মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে তন্দ্রার ভাব আসছে। একা আমার নয়। ট্রেন চলেছে পশ্চিম মুখে হন্‌শু দ্বীপের বুক চিরে। এই দ্বীপটিই আসল জাপান। বাকী তিনটি দ্বীপের নাম কিয়ুশু, শিকোকু, হোক্কাইদো। শেষেরটি একটু স্বতন্ত্র।

যতই পশ্চিমে যাচ্ছি ততই জাপানের সভ্যতার আদিভূমির দিকে যাচ্ছি। তারও পশ্চিমে কোরিয়া ও চীন। প্রাচীন জাপানের উপর তাদের প্রভাব ততখানি আধুনিক জাপানের উপর ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাব যতখানি। মাঝখানের কয়েক শতাব্দী জাপান সেকালের পশ্চিম ও একালের পশ্চিম দুই পশ্চিমের প্রভাবকে দূরে রেখেছিল। এমনি করে এলো তার চরিত্রে দ্বৈপায়নতা। সেটা এখনো পুরোপুরি কাটেনি।

সেই দ্বৈপায়ন যুগেও কিছুকালের জন্যে পর্তুগিজ সংস্পর্শ ঘটেছিল। ওদের কায়দা হচ্ছে প্রথমে কতক লোককে দীক্ষা দিয়ে খ্রীস্টান করবে, তার পরে শেখাবে বিদ্রোহ করে দেশের একটি খণ্ডে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করতে। ধর্ম ও রাজনীতি ওদের কাছে এক অপরের সোপান। এই কায়দাটার কথা জাপানীরা গোড়ায় জানত না। পরে কেমন করে জানতে পারে। বৌদ্ধরাও রাজনীতির খেলায় মন্দ খেলোয়াড় ছিল না। আর-কেউ তাদের খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইলে তাদেরই বা সেটা সইবে কেন? পর্তুগিজরা উড়ে এসে জুড়ে বসতে না বসতে আবার উড়তে বাধ্য হলো। মাঝখান থেকে কাটা পড়ল কয়েক হাজার জাপানী খ্রীস্টান। এর পরে জাপানীরা পাশ্চাত্যদের কাউকেই ঢুকতে দিল না, ইতিমধ্যে আর যারা ঢুকেছিল তাদের একে একে তাড়াল। থাকতে দিল শুধু ওলন্দাজদের। তাও দেশের এক কোণে নাগাসাকিতে।

জাপানকে ঠিকমতো চিনতে হলে চীন ও কোরিয়া দেখা উচিত তার আগে। তার পরে দেখতে হয় নারা ও কিয়োতো, তার পরে ওসাকা ও তোকিয়ো। অতীত থেকে বর্তমানে আসতে হলে পশ্চিমদিক থেকে পূবদিকে

আসাই সঙ্গত। তা না করে আমরা চলেছি পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে। তোকিয়ো থেকে কিয়োতোয়। বর্তমান থেকে অতীতে। কিয়োতো থেকে যাব নারায়। আরো অতীতে। এমন করে ইতিহাস পড়া হয় না। কিন্তু একদা আমার নিজের একটা থিয়োরি ছিল যে এমনি করেই ইতিহাস পড়া উচিত, গল্প বলা উচিত। তার পরীক্ষা করেছিও।

কিয়োতো। কিয়োতো। শুনিয়ে দিয়ে গেল রেলের লোক। জাপানের একটি উত্তম প্রথা। যে স্টেশনে গাড়ী থামবে সে স্টেশনে তো নামঘোষণা করবেই আগে থেকেও নামজপ করবে, "পথে পড়বে অমুক অমুক স্টেশন।" তা ছাড়া প্রত্যেক স্টেশনের গায়ে সেই স্টেশনের নাম যেমন লেখা থাকে তেমনি লেখা থাকে একটি ফলকের গায়ে সেই স্টেশনের আগের স্টেশন ও পরের স্টেশনের নাম। ধরুন, বোলপুর স্টেশনের ফলকে বোলপুরের একদিকে থাকবে কোপাই, অন্য দিকে ভেদিয়া। যাতে দিগভ্রম না হয়।

কিয়োতো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দারুণ ভিড়। জনতাকে আরো জনাকীর্ণ করেছিল আমাদের স্বাগতকারী দল। যথারীতি পতাকা ছিল, ক্যামেরা ছিল, মালা ছিল। কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে বেরোতে গিয়ে দেখি আমাকে খুঁজছে শান্তিনিকেতনের বিব্‌লি, যার ভালো নাম সন্দীপ ঠাকুর। বেঘোরে বেহারে বাঙালীর মুখ দেখতে পেয়ে আমি তো বর্তে গেলুম। ওর সঙ্গে ছিল ওর এক বন্ধু। জাপানী।

মিয়াকো হোটেলে পেন কংগ্রেসের বাস থামল। আমার ঘরের চাবি নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল হোটেলের বয়। যেমন ঢাউস চাবি তার চেয়ে ঢাউস তার সঙ্গের কাঠ। ঘর খুলে দিতে দেখি আমার স্যুটকেস আগেই গৃহপ্রবেশ করেছে। ওই যেটিকে তোকিয়োতে হস্তান্তর করে অবধি মনে মনে শঙ্কিত ছিলুম। এমন তো হতে পারত যে আমি পৌঁছলুম একদিন আগে আর আমার স্যুটকেস একদিন পরে। তা হলে কী বিপদেই না পড়তুম! অন্য হোটেলে চালান যেতেও তো পারত।

পেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের এক হোটেলে রাখা এখানেও সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া আমাদের অনেকে আবার চেয়েছিলেন জাপানী সরাইতে উঠতে। জাপানী সরাই সম্বন্ধে লোভ ছিল আমারও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও ছিল যে স্নানের টাবের একই গরম জলে একসঙ্গে গা ডোবাতে হবে চেনা-অচেনা

অনেকের সঙ্গে। কিংবা একে একে নামতে হবে জল না পালটিয়ে। আগেকার দিনে তো স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ছিল না। শুনেছি এখনো নেই গ্রাম অঞ্চলে। নেই শুনেছি আতামি প্রভৃতি শৌখীন এলাকাতেও। সেখানে নাকি স্নানের সাথী হয় গেইশারা।

সোফিয়াদিকে কিন্তু তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বে এক জাপানী সরাইতে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এ বিভ্রাটের জন্যে যিনিই দায়ী হোন না কেন হোটেল-সরাই পরিবর্তনের পক্ষে বড় বেশী বিলম্ব হয়ে গেছে। তিনি তো চোখে আঁধার দেখলেন। স্নান বন্ধ করে দিলে বাঁচবেন না, আবার প্রাণ গেলেও অমনভাবে স্নান করবেন না। জাপানী সরাই সম্বন্ধে জাপানীদের যা গর্ব স্নানাগারের প্রসঙ্গ তুললে ওরা অত্যন্ত অপমান বোধ করবে। তাই বলতে হলো তিনি নিরামিষাশী মানুষ, খান পাশ্চাত্য রীতির রান্না। তাতে ফল হলো। তাঁকে জাপানী সরাইতে যেতে হলো না। মিয়াকো হোটেলে তাঁরও ঠাঁই হলো। নইলে তোকিয়োর মতো কিয়োতোয় আমার ঘুমভাঙানী দিদি হবে কে?

গত শতাব্দীর বনেদী হোটেল। এর বিশেষত্ব এর পাহাড়ে উদ্যান। ইচ্ছা করলে এখানে জাপানী ধরনে সাজানো ঘরও পাওয়া যায়। আমরা চাইনি। আমাদের ঘরগুলো পশ্চিমী ধরনে সাজানো। আমারটাতে আমি একা। পাশের বিছানা খালি। দেয়ালজোড়া কাচের জানালা দিয়ে দূর দিগন্তের পর্বত দেখা যায়। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে। ছবির মতো প্রসারিত শহর আমার দৃষ্টির তলে। ঘরে বসেই নগরদর্শন। এমনটি তোকিয়োতে ঘটেনি। আমি তো ঘর থেকে নড়তে চাইনে। বিব্‌লি এসে পড়ল। তার সঙ্গে তার জাপানী বন্ধু। নিচে এসে বসে আছেন কাসুগাই মহাশয়ের বন্ধু তোদো মহাশয় ও তোরিগোএ মহাশয়। এবং আরো কেউ কেউ।

একটি কাগজের জন্যে কবিতা লিখে দিতে হবে, আর একটি কাগজের জন্যে প্রবন্ধ। এ-সব একদিন অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু ইণ্টারভিউটা আজ এখনি হওয়া চাই। লোকে জানতে চায় জাপান আমার কেমন লাগছে, মিশ্র সন্তানদের সম্বন্ধে আমার মত কী, এমনি কত রকম প্রশ্ন। এতদিনে আমার দুরস্ত হয়ে এসেছিল কী বলতে হয়, কতখানি বলতে হয়।

চারটের সময় পৌঁছেছি। ছ'টার সময় বেরোতে হবে। উরাসেন্‌কে প্রতিষ্ঠানে "চা-নো-য়ু"। চা অনুষ্ঠান। নিমন্ত্রণ করেছেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার।

আমাদের সবাইকে। হোটেলে বন্ধুদের নিয়ে ঘরোয়া একটু চা পান করা গেল। তার পর তাঁদের বিদায় দিয়ে সদলবলে বাসে উঠে বসলুম। বাস চলল কম্নিচিয়ান। সেনবংশের বাড়ী। সেনবংশ? ওমা, জাপানেও সেন! চীনেও সেন, কোরিয়াতেও সেন, নরওয়েতে ডেনমার্কেও সেন। ওর মতো আন্তর্জাতিক পদবী আর একটিও নেই। সেনদের প্রতি আমার পক্ষপাতের কারণ আমার পিতামহী সেনদুহিতা। তাই গ্র্যাণ্ড মাস্টার সোশিৎসু সেনকে দেখে পর মনে হলো না। এঁর পূর্বপুরুষ সেন-রিকিয়ু ষোড়শ শতাব্দীতে জাপানের চা-পানের নীতি ও পদ্ধতি বেঁধে দেন। পরে শেখাতে গিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। একটি উরাসেন্কে। সেনবংশের গুরুগিরি চোদ্দ পুরুষ ধরে চলে এসেছে। উরাসেন্কের শাখাপল্লব এখন আমেরিকাতেও ছড়িয়েছে।

এখানে বলে রাখি যে আমাদের যেমন নাম আগে পদবী তার পরে জাপানীদের তেমন নয়। বল্লাল সেন লক্ষ্মণ সেনকে ওরা হলে বলত সেন বল্লাল, সেন লক্ষ্মণ। এতক্ষণ যে বলে এলুম য়াসুনারি কাওয়াবাতা ওটা জাপানী পদ্ধতি নয়। ওরা হলে বলত কাওয়াবাতা য়াসুনারি, তানিজাকি জুন্ইচিরো, মুশাকোজি বা মুশানোকোজি সানেআৎসু। তেমনি সেন রিকিয়ুর চতুর্দশতম উত্তরপুরুষ সেন সোশিৎসু। আমাদের সেন মহাশয়।

মিয়াগি মাৎসুকাওয়া-দারুমা

॥ নয় ॥

সেদিন কিয়োতোর ভিতর দিয়ে কন্নিচিয়ান যেতে যেতে আমরা হৃদয় হারালুম। সেই যে জার্মানদের একটা গান আছে, "হাইডেলবার্গে হৃদয় হারিয়েছি।" তেমনি আমাদেরও অন্তর গান গেয়ে উঠতে চায়, "কিয়োতোয় হৃদয় হারিয়েছি।"

কিন্তু নাগরীর কাছে নয়, নগরীর কাছে। নগরী নিজেই যেন নাগরী। কী তার রূপ আর কুহক! সাধে কি তার দ্বারে পাঁচ হাজার শিল্পী ধর্না দিয়ে পড়ে আছে বলে শুনি। শিল্পে আর সৌন্দর্যে সে মুনিরও মন ভোলায়। তা হলে আমাদের দোষ কী, যদি বলে থাকি, "তোকিয়োতে না করে কিয়োতোয় পেন কংগ্রেস আহ্বান করলেই হতো! কী আছে তোকিয়োতে! কিয়োতোর কাছে তোকিয়ো!"

দেখা গেল মানুষ কত সহজে নিমকহারাম হয়। তোকিয়োর অত যে লাঞ্চন আর ডিনার আর ব্যাঙ্কেট সব এককবেলার মধ্যে ভুলে গেল। কিসের জন্যে? না সৌন্দর্যের জন্যে। শিল্পের জন্যে। আপ্যায়নে মানুষকে বশ করা যায় না। সে অমৃতের পুত্র। অমৃতের জন্যে তৃষিত। কিয়োতোয় কংগ্রেস ডাকলে অত আপ্যায়নের আবশ্যক হতো না।

আমার তবু সান্ত্বনা ছিল যে পেন কংগ্রেস ভাঙবার পরেও আমি কিয়োতোয় থেকে যাচ্ছি আরো দিন কয়েক। কিন্তু শনিবার বিকেলে এসে রবিবারটা কিয়োতোয় কাটিয়ে সোমবার সারা দিন নারা বেড়িয়ে রাতের ট্রেনে যাঁরা তোকিয়ো ফিরে যাচ্ছেন ও মঙ্গলবার আকাশে উড়ছেন কী তাঁদের সান্ত্বনা! একটা কি দুটো দিন কিয়োতোর পক্ষে কিছুই নয়। এই নগরী বা নাগরী অত অল্প পরিচয়ে অবগুণ্ঠন খোলে না। হায়, হায়! কেন আমরা আরো আগে কিয়োতো আসিনি! তোকিয়ো? তোকিয়ো আমাদের সময় হরণ করেছে। আর কিয়োতো করেছে মনোহরণ।

কন্নিচিয়ান পৌঁছতে না পৌঁছতে বর্ষণ শুরু। একেবারে মুষলধারে বর্ষণ। বাস থেকে নামতে দেবে না। নেমে বেশ কিছু দূর হেঁটে যেতে হয়। যেন পাড়াগেঁয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটা। সেনমহাশয়েরা একদল ছাতা-বরদার পাঠিয়ে দিলেন। জাপানী ছত্র। চললুম ছত্রপতি শিবাজীর মতো

ছত্রধারী সমভিব্যাহারে। উপবনপথ দিয়ে যেতে হয়। যেতে যেতে সংসারের চিন্তা পিছনে রেখে মনটাকে শান্ত করে নিতে হয়। সম্মুখে শান্তিপারাবার। চা-পানগৃহ যেন তার মাঝখানে একটি দ্বীপ। সেখানে এপারের ময়লার প্রবেশ নেই। জাপানের চা-পানতত্ত্বের মূলকথা হলো বহির্জগতের থেকে বিচ্ছিন্নতা। চা-শিৎস্থ বা চা-পানগৃহ যেন একটি নিভৃত উপাসনাস্থলী।

সত্যিকার একটি চা-অনুষ্ঠান চার ঘণ্টা ধরে চলে। তার এতরকম কায়দাকানুন যে জাপানের চা-অনুষ্ঠানের চেয়ে ভারতের বিবাহ-অনুষ্ঠান বরং সোজা। আদিতে এটা ছিল ধ্যানী বা জেন (Zen) বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধুদের নিঃশব্দ একাগ্রতার সহায়। একটি হাতলহীন পেয়ালায় সুরভিত সবুজ চায়ের মিহি গুঁড়োর উপর গরম জল ঢেলে নেড়েচেড়ে একই পেয়ালা থেকে একে একে পাঁচজনে চুমুক দেওয়া। জেন সাধুরা সেইভাবে নিজেদের মধ্যে একটা সাযুজ্য বা কমিউনিয়ন বোধ করতেন। তাঁরা ছিলেন সৌন্দর্যপ্রিয়, ধর্মের সঙ্গে নন্দনতত্ত্ব মেশাতে জানতেন। সরঞ্জামগুলি স্বল্প হলেও সুন্দর হবে, সরল হবে। সেবার পদ্ধতি হবে আর্টের মাপকাঠিতে মাপা। আবার আর্ট হবে প্রকৃতির সঙ্গে সুসমঞ্জস। ফুল থাকবে, ছবি থাকবে, তা রাখার জন্যে তোকোনোমা থাকবে। শিল্পের পিছনে থাকবে জীবনশিল্প। জীবনের একটি বিশেষ আদর্শ ও ধারা।

পরে এই অনুষ্ঠান মন্দিরের বাইরে এসে অন্য আকার নেয়। হিদেয়োশি প্রভৃতি সেনাপতি বা শাসকরা হন এর পক্ষপাতী। এঁরা সংসারী লোক। চার ঘণ্টা যদি সংসার ভুলে থাকতে পারেন তা হলে আত্মা শান্ত হয়। তারপর আবার নতুন উৎসাহে শাসনকার্য বা যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়। এই সূত্রে একটা সাযুজ্য ঘটে বন্ধুবান্ধব বা অনুগতদের সঙ্গে। হিদেয়োশি নিম্নস্তরের লোকদেরও ডেকে এনে সঙ্গে বসাতেন। জননায়কের পক্ষে সেটা নেতৃত্বের অঙ্গ ও সিদ্ধির শর্ত। চা-অনুষ্ঠান ক্রমে সমাজের উচ্চস্তরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেতা হয়ে দাঁড়ায়। মহিলাদের চা-কেতাদুরস্ত হতে হয় বিয়ের আগে থেকেই। তখন এটা হয়ে যায় এটিকেটের শামিল। সঙ্গে সঙ্গে স্টাইলাইজড হয় আমাদের দক্ষিণী নৃত্যকলার মতো। তবে ধর্ম আর শিল্প থেকে দূরে সরে যায় না। মধ্যযুগে সেটা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু জেন সাধুদের কাছে যা ছিল দারিদ্র্যের মহিমাদ্যোতক তাই হয়ে দাঁড়াল দরিদ্রের সাধ্যাতীত।

একালে চা-অনুষ্ঠান সমাজের মধ্যস্তরে ব্যাপ্ত হয়েছে, কিন্তু অত সময় কে দেবে, আর সংসারকে ভুলে যাওয়া কি এত সহজ! এখন এটি একটি রক্ষণযোগ্য সুন্দর প্রাচীন প্রথা। জাপানের বিশেষত্ব। আর মেয়েদের পক্ষে একটি উপাদেয় শিক্ষা। সম্ভ্রান্ত পরিবারে তো নিশ্চয়ই। যারা সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য হতে চায় তাদের পরিবারেও। উরাসেন্‌কে একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এর আস্তানা কন্নিচিয়ান এখন মস্ত বাড়ী, যদিও গোড়ায় ছিল একটি ছোট্ট কুটির। কন্নিচিয়ান কথাটির অর্থ "অল্প কুটির।" সেনবাড়ীর প্রতিনিধিরা আমাদের অভ্যর্থনা করে সোজা নিয়ে তুললেন তুটি কি তিনটি বড় বড় ঘরে। জাপানী ধরনে তাতামি মাতুর দিয়ে মোড়া তার মেজে। ঘরের আকার অনুসারে মাতুরের সংখ্যা কম বেশী। আবার মাতুরের সংখ্যা অনুসারে ঘরের বর্ণনা। ছ'মাতুরি, আট মাতুরি, বারো মাতুরি। এ ছাড়া একেকটি ঘরের একেকটি নাম। কোনো একখানি ঘরে আমাদের সকলের ধরে না বলে বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন দলের স্বতন্ত্র চা-অনুষ্ঠান হলো। পাঁচজনকে নিয়ে সত্যিকার অনুষ্ঠান। পাঁচজনের জায়গায় আমাদের ঘরে আমরা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন। মানুষ বেশী, সময় কম, চার ঘণ্টার পাঠ আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টায় সারতে হবে।

আমরা বসেছি মাতুরের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে দেয়াল ঘেঁষে তিন দিকে। এক দিকের এক প্রান্তে জলন্ত উনুনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছেন কিমোনো পরা অনুষ্ঠানকর্তা সেনবংশের এক যুবক। তাঁর আশেপাশে বিবিধ সরঞ্জাম। জলের পাত্র থেকে হাতায় করে ঠাণ্ডা জল নিয়ে তিনি উনুনের উপর চাপানো কেটলিতে ঢালছেন, তার থেকে গরম জল নিয়ে ঢালছেন গুঁড়ো চায়ের পাত্রে। ঢালার আগে চায়ের ভাঁড় থেকে চা তুলে নিয়েছেন বাঁশের চামচে দিয়ে, নিয়ে চায়ের পেয়ালায় রেখেছেন। ঢালার পর বাঁশের একটা বুরুশের মতো জিনিস দিয়ে চা ঘুঁটছেন। চায়ে জলে মিশে গাঢ় হচ্ছে। গৃহস্থের বাড়ীর চা পাতলা হয়। অনুষ্ঠানের চা গাঢ় হয়। ঐ একই পেয়ালা পাঁচজনের ভোগে লাগার কথা। কিন্তু আমরা বিদেশী মানুষ, আমাদের রীতি আলাদা, তাই আমাদের জন্যে একটির পর একটি পেয়ালায় চা তৈরি হচ্ছে। হয়ে বাইরে চালান যাচ্ছে। বাইরে থেকে আসছে একেকটি মেয়ের হাতে একেকটি পেয়ালা। বাড়ীর মেয়ে বা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী। চিত্রল কিমোনো পরা।

সমস্ত ব্যাপারটা স্টাইলাইজড। অনুষ্ঠানকর্তার প্রত্যেকটি ক্রিয়া একান্ত ধীরে ও সন্তর্পণে সম্পন্ন হচ্ছে এমন একটি ঢঙে যাকে নিন্দুকরা বলবে ওস্তাদী। কিন্তু এই হলো ওঁদের ঘরানা ঢং। শুদ্ধভাবে একেকটি কর্ম সম্পাদন করছেন আর একবার করে আমাদের দিকে সহাস্যে তাকাচ্ছেন। যেন বলতে চান, "কেমন? দেখলেন তো? এই হলো পানপাত্রে বারিনিক্ষেপণং। যথাশাস্ত্র করেছি কি না বলুন।" বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য অনুসারে এ যেন একটা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর ওই যে একেকটি মেয়ে আসছে দিচ্ছে আর যাচ্ছে ওদের আসা দেওয়া চলে যাওয়াও স্টাইলাইজড। মনে করুন আপনি একজন দেবতা। আপনাকে দেওয়া হচ্ছে চা নয় নৈবেদ্য। যে মেয়েটি এলো সে আপনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কোমর থেকে মাথা নত করে প্রণাম করল। তার পর মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। তার পর আবার নত হয়ে নৈবেদ্য স্থাপন করল। তার পর আবার মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। তার পর আবার নত হয়ে প্রণাম করল। তার পর ধীরে ধীরে উঠে পিছু হটে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার এসে তথাবিধি নিবেদন করে গেল মিষ্টান্ন। আপনার খাওন সারা হলে আবার এসে তেমনি প্রণামাদি করে নিয়ে গেল শূন্য পাত্র। আপনি তারিফ করতে করতে চা সেবা করলেন, মিষ্টান্ন সেবা করলেন।

এর পর খাট মাদুরি ঘরে নৈশভোজন। জলচৌকির মতো নিচু টেবিলের দু'ধারে নানা দেশের শ'দুই লেখকলেখিকা পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসেছেন। ঘুরে ফিরে তদারক করছেন স্বয়ং সেন মহাশয়। পরিবেশনের ভার নিয়েছে বাড়ীর মেয়েরা বা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা। পুরুষরাও। প্রত্যেকের সম্মুখে রাখা হলো এক-একটি থালী। গোল না চৌকোণা মনে পড়ছে না। ধাতুনির্মিত নয়, যত দূর মনে পড়ে ল্যাকারের তৈরি। তার কানা বেশ উঁচু। তাতে ছিল রকমারি খাবার। আমিষ ও নিরামিষ দুই। জাপানী পদ্ধতির ভোজ। যথারীতি চপ স্টিক ছিল তার সঙ্গে। তা দিয়ে তুলে নিয়ে মুখে দিতে হয়।

আমার পিছন দিকে ছিল খোলা জানালা। তাকে ইচ্ছামতো সরানো যায়। কখন এক সময় দেখি প্রবল বৃষ্টির ছাটে পিঠ আমার ভিজে যাচ্ছে। দারুণ হাওয়া। এই কি সেই টাইফুন? এলো এতদিন পরে? কাঁপিয়ে দিচ্ছিল বাড়ীটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে। উঠে বন্ধ করে দিলুম জানালাটা।

দেখি হাত গুটিয়ে বসে আছেন একা জম্বুনাথন। ওদিকে অন্যদের অর্ধেক খাওয়া সারা। কী ব্যাপার! তিনি যে নিরামিষাশী। তাঁর মুখে দেবার মতো কী আছে বুঝতে পারলে তো মুখে দেবেন! এক কোণে ভাত ছিল। জাপানী মতে প্যাকেটে মোড়া। "নির্ভয়ে খান। ভাত খেতে আপত্তি কিসের?" পরামর্শ দিলুম বৃদ্ধ তামিল ব্রাহ্মণকে। বেচারা অনশন ভঙ্গ করলেন। পরে যখন নিজের মুখে তুলি তখন আমার রসনা যেন আমিষের আস্বাদ পেলো। হুঁ হুঁ! আপনাদের বলব না ভাতের সঙ্গে কী মেশানো ছিল। বলতে পারলে তো বলব। আমার যত দূর মালুম হলো ওটা কাঁচা মাছের কুচি নয় সিদ্ধ মাংসের কীমা। অধ্যাপক কামুগাই কিন্তু বিশ্বাস করবেন না যে চা অনুষ্ঠান-শেষে আমিষ ভোজ কখনো সম্ভবপর। তাঁর মতে ওটা সোয়া বীনেরই রকমফের। আশা করা যাক জম্বুনাথন সেদিন নিরামিষ তণ্ডুল ভক্ষণ করেছেন। তবে তিনি বা আমি কেউ "বীয়ারু" কিংবা "সাকে" পান করিনি। কমলালেবুর রস আনিয়ে পিপাসা মিটিয়েছি।

ভোজনের পর সেন মহাশয় আমাদের কত রকম উপহার দিলেন। দক্ষিণা বলা যেতে পারে। তাঁকে সপরিবারে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে করমর্দন করলুম। বললুম, "আপনারা সেন। আমার দেশেও সেন আছেন। আনন্দ হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে মিলে।" সেনের বয়স হলো ষাটের উপর। পরিধানে কিমোনো। বেশ লাগে তাঁকে, তাঁর গৃহিণীকে, তাঁর বড় ছেলে সোকোকে। ঘুরেফিরে শিল্পসংগ্রহ দেখলুম। আকাশের সুমতি না হলে তো বাসে উঠতে পারিনে! একটু যেন ধরল বৃষ্টিটা। তখন আমরা আবার সাবধানে পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে জুতো বাঁচিয়ে বাসে গিয়ে উঠলুম। ওহো, বলতে ভুলে গেছি যে জাপানীদের ঘরে ঢুকতে হলে জুতো খুলে কাপড়ের চটি পায়ে দিতে হয়। ওঁরাই জোগান।

বাসে দু'জন দু'জন করে বসে। আমার পাশের আসন খালি ছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, "বসতে পারি?" রাঙা কিমোনো-পরা জাপানী মহিলা। বয়স কত হবে? মেয়েদের বয়স অনুমান করা অভদ্রতা। বলা যেতে পারে তরুণী নন, মধ্যবয়সীও নন, হতে দেরি আছে। পরিষ্কার ইংরেজী বলেন। উচ্চশিক্ষিতা নিশ্চয়। জাপানী মহিলাদের অঙ্গে পাশ্চাত্য পোশাক এত বেশী দেখেছি যে চোখ জুড়িয়ে গেল এঁর সুন্দর কিমোনো দেখে।

আবহাওয়ার উপর বলার যা ছিল তা যখন ফুরিয়ে এলো তখন শুনিয়ে দিলুম কিমোনোর প্রশংসা। ভদ্রমহিলা খুশি হয়ে বললেন, "কিমোনো পরতেই আমি ভালোবাসি, কিন্তু কখন পরি, বলুন? রোজ আপিসে যেতে হয় যে!"

তোকিয়োর কোনো এক ব্যাঙ্কে কাজ করেন। পেন কংগ্রেসের সঙ্গে কিয়োতো এসে শনিবারটা কাটালেন। কাল রবিবার বিকেলে ওসাকা যাচ্ছেন। সেইখানেই বাড়ী। সোমবারের দিনটা ছুটি নিয়েছেন। আমি যেদিন ওসাকা যাব সেদিন তিনি সেখানে থাকবেন না বলে দুঃখিত। তোকিয়ো ফিরে গিয়ে আমি যেন তাঁদের মহিলাসমিতির সভায় যাই। নিমন্ত্রণ রইল। ডায়েরি খুলে দেখলুম যে পরের রবিবার আমার তোকিয়ো ফেরা সম্ভব হবে না। ভদ্রমহিলা দুঃখিত হলেন। বললেন, "তা হলে আজকেই আপনার হোটেলে আসব, যদি বলেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে ইচ্ছা। মেয়েদের পত্রিকায় লিখি কিনা।"

মেয়েদের পত্রিকা আমাদের দেশে ক'খানাই বা আছে! জাপানে এন্তার। মজা এই যে পত্রিকা যদিও মেয়েদের জন্যে সম্পাদক হয়তো অ-মেয়ে। জাপানের অনেক লেখক মেয়েদের লেখক। আমার প্রতিবেশিনী জাত-মেয়ে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম তিনি কী লেখেন। "কী লিখি?" তিনি সরলভাবে বললেন, "মেয়েদের যতরকম প্রশ্ন তার উত্তর দিই। এই-জন্যেই তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করা এত বেশী দরকার। হদ্দ হয়ে গেলুম ওদের প্রশ্ন শুনতে শুনতে।"

"কী রকম প্রশ্ন?" জেরা করলেন ভূতপূর্ব বিচারপতি। পূর্বজন্মের জাতিস্মর।

ভদ্রমহিলা এর উত্তরে বললেন, "আমি ওদের হাজার বার বোঝাই, ফিফটি ফিফটি। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক ফিফটি ফিফটি। কেমন? ঠিক কি না?"

তখনো আমি অন্ধকারে। ভাবছি ফেমিনিজমের কথা হচ্ছে। সর্বক্ষেত্রে নরনারীর সমান অধিকার। তা নয়। এর তাৎপর্য অন্যরকম। ধরুন, দুটি মানুষ রেস্টোরাণ্টে একসঙ্গে খাচ্ছে। বিল মিটিয়ে দেবার সময় ফিফটি ফিফটি। আধাআধি। সমান সমান। কেউ কারো কাছে ঋণী নয়, কেনা নয়। নইলে আত্মমর্যাদা থাকে না।

ভদ্রমহিলা বললেন, "মেয়েদের কি আত্মমর্যাদা নেই? কেন তা হলে ওরা নিজেদের অমন করে খেলো করতে যায়?"

আমি ভালো করে না বুঝেই সায় দিয়ে চললুম। ওদিকে বাসও চলতে থাকল হোটেলের পথে। ভদ্রমহিলা উঠেছিলেন আর একটু দূরে জাপানী সরাইতে না কোথায়।

"আমাদের দেশে ত্রিশ লক্ষ বিবাহযোগ্যা কুমারী অতিরিক্ত। যাদের সঙ্গে বিয়ে হতো তারা মহাযুদ্ধে নিহত।" করুণকণ্ঠে বলে চললেন প্রতিবেশিনী। "এর ফলে জাপানের ঘোরতর নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে। না, নীতি বলতে বিশেষ কিছু বাকী নেই। দেয়ার ইজ নো মরালিটি।"

আমি এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। বললুম, "আমাদের দেশে মেয়েরা অতিরিক্ত নয়। মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে কম। সেইজন্যে এ সমস্যা ভারতে নেই।"

"সেই ভালো। সেই সবচেয়ে ভালো। মেয়েদের সংখ্যা কমতির দিকে থাকলেই মঙ্গল। তা হলে তো সব সমস্যাই মিটে যায়।" ভদ্রমহিলা যেন মুশকিল-আসান পেয়ে গেলেন। "সেইজন্যেই তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছা। তবে আজ বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কাল সকালে হবে।"

আমি কিন্তু কথা দিতে পারছিলুম না। যদিও আমারও ইচ্ছা ছিল আলাপের। এর পর ভদ্রমহিলা আর একটু ভেঙে বললেন, "ঐ একমাত্র টেস্ট। নীতির আর কোনো টেস্ট নেই। বিশ্বস্ততা। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর।"

এতক্ষণে বোঝা গেল ফিফটি ফিফটির মর্ম কী। বললুম, "আপনি তা হলে মেয়েদের এই উপদেশ দিচ্ছেন। শুনছে কেউ আপনার উপদেশ?"

"শুনছে কোথায়!" ভদ্রমহিলা আর্তকণ্ঠে বললেন, "কেউ শুনছে না। না শুনুক, আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি।"

জাপানে বহুবিবাহের চল নেই। মেয়েরা সব সহ্য করবে, কিন্তু সতীন সহ্য করবে না, তার চেয়ে আত্মহত্যা করবে। তা হলে ঐ ত্রিশ লাখ অতিরিক্ত অনূঢ়াকে বলতে হয় আজীবন ব্রহ্মচারিণী হতে। তাই বলছেন আমার প্রতিবেশিনী। কিন্তু ভবী ভুলছে না।

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না। ভাবনায় পড়েছিলুম। ভদ্রমহিলা

কিন্তু একালের মেয়েদের উপর লেখনীহস্ত হয়ে রয়েছিলেন। তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে তিনি আইন করে নীতি সংস্থাপন করতেন। বললেন, "জাপানের আইন কোনখানে কড়া, জানেন? যেখানে দু'পক্ষই পুরুষ। কিংবা দু'পক্ষই নারী।"

এমনি করে আমার নীতিশিক্ষা আইনশিক্ষা হলো। বাকী ছিল ডাক্তারি-শিক্ষা। ভদ্রমহিলা বললেন, "প্ল্যাস্টিক সার্জারিতে দেশটা ছেয়ে গেছে। মেয়েদের নাক কি তাদের জন্মগত? মুখ কি তাদের প্রকৃতির হাতে গড়া? অস্ত্রোপচার করে মুখের চেহারাটাই বদলে দেয়। আপনাদের দেশেও কি এসব হয়?"

না। ফেস লিফ্‌টিং এখনো আমাদের দেশে চলতি হয়নি। তাই কথাটা আমার কাছে ভারী নতুন লাগল। ছোট ছেলের কাছে নতুন একটা খেলা যেমন লাগে। এর পরে জাপানে যে ক'দিন ছিলুম টিকল নাক দেখলেই মনে মনে বলতুম, "বুঝেছি। প্ল্যাস্টিক সার্জারি।" মুখের চেহারা আর্য ধাঁচের হলেই আমার মুখে মুচকি হাসি ফুটত। "ফেস লিফ্‌টিং জানিনে? বুদ্ধের দেশ থেকে এসেছি বলে কি আমি একেবারেই বুদ্ধু!" আসলে জাপানীরা মিশ্র জাতি। ওদের মধ্যে এমনিতেই যথেষ্ট আকৃতিগত বৈচিত্র্য। তার জন্যে অস্ত্রোপচার অনাবশ্যক। প্রাচীন ছবিতেও চোখ নাক আর্যের মতো দেখা যায়।

আমার প্রতিবেশিনীর উক্তিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেদিন "সায়োনারা" বলে নেমে গেলুম আমি আমার হোটেলে। "সায়োনারা" বলে সেই বাসে চললেন প্রতিবেশিনী।

পরের দিন উঠে দেখি প্রখর সূর্যালোক। কোথায় টাইফুন! প্রাতরাশের পর আবার আমরা উঠে বসলুম বাসে। এবার যাচ্ছি তেনরিয়ুজি। জেন বৌদ্ধ মন্দির। যেতে যেতে মুগ্ধ হয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকলুম নগরীকে। সৌন্দর্য এর ঐশ্বর্য। সৌন্দর্যের পরিচয় সর্বাঙ্গে। হেইআন-কিয়ো ছিল এর আদি নাম। অষ্টম শতাব্দীর শেষপ্রান্তে পত্তন। একটি বৃহৎ চতুষ্কোণকে সমান্তরাল সরল রেখা দিয়ে কাটাকুটি করে আশিটির উপর ছোট বড় মাঝারি চতুষ্কোণ বানালে যেমন দেখায় হেইআন-কিয়োর মানচিত্র ছিল তেমনি দেখতে। পরে প্রচুর ভাগবিভাগ ও সংযোজন ঘটেছে। তা হলেও আদি

পরিকল্পনা সুরক্ষিত। কিয়োতোর রাস্তা বাঁকাচোরা নয়। সরু সরু নয়। সোজা আর চওড়া। আদি থেকেই আধুনিক। তাতে প্রাচীন পদ্ধতির বাড়ীই বেশী। কিন্তু গাড়ী বেবাক মডার্ন। আর পাশ্চাত্য পোশাক থেকে নাগরিক তো নয়ই, গ্রাম্য নরনারীও মুক্ত নয়। তেনরিয়ুজি যেতে শহর হয়ে গেল গ্রাম। যদিও শহরের শামিল।

বারো লাখ লোকের দানাপানির জন্যে মিল ফ্যাক্টরিও জুটেছে। চীনা-মাটি, ল্যাকার, রেশম ও সূচীশিল্পের জন্যে কিয়োতোর খ্যাতি আছে। তোকিয়ো, ওসাকা, নাগোইয়ার পর কিয়োতোর বাণিজ্য। সেদিক থেকে সে চতুর্থ স্থানের অধিকারী। কিন্তু যেদিক থেকে সে প্রথম সেটা চতুর্বর্গের দ্বিতীয় বর্গ নয়, বাকী তিনটি। দেড় হাজার বৌদ্ধমন্দির কি পৃথিবীর আর কোথাও আছে? তাদের মধ্যে তিরিশটি হচ্ছে তিরিশটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদর। তার পর শিন্তোদেরও দু'শ'টির উপর পীঠস্থান। এই যেমন গেল ধর্মের জয়জয়কার তেমনি কামেরও কামরূপ গিয়ন। জাপানের গেইশাকেন্দ্র। ছ' ছ'টি থিয়েটার আছে, তাদের বলা হয় কাবুরেন্‌জো বা গেইশা রঙ্গালয়। আর মোক্ষ? শিল্পীর মোক্ষ শিল্পে। শিল্প যারা ভালোবাসে তাদেরও। সকলের মোক্ষ সৌন্দর্যে। সৌন্দর্যসাধনায় কিয়োতো চিরদিন অনলস ও অগ্রগণ্য। মন্দিরে পীঠস্থানে বিপণিতে বাসগৃহে উদ্যানে উপবনে সর্বত্র তার প্রকাশ।

ক্রমে ক্রমে এলো তেনরিয়ুজি। নব্বই একর জমি জুড়ে সুরম্য উদ্যান। মাঝখানে মন্দির, সরোবর, কমলবন। চতুর্দশ শতাব্দীর কীর্তি। মহাসেনাপতি আসিকাগা তাকাউজি এর প্রতিষ্ঠাতা। জেন সম্প্রদায়ের সাধু সোসেকির জন্যে এর প্রতিষ্ঠা। মহাসেনাপতিরা ছিলেন জেন বৌদ্ধ ধর্মে নিষ্ঠাবান। তাঁরাই দেশের প্রকৃত শাসক। তাই জাপানের শাসনব্যাপারের উপর জেন সাধুদের পরোক্ষ প্রভাব ছিল। যে পাঁচটি জেন মন্দিরের সাধুরা কিয়োতোর এই সব শোগুনদের রাজনৈতিক পরামর্শ দিতেন তেনরিয়ুজি সেই পাঁচটির একটি। বৃহৎ পঞ্চকের একতম। সেকালের রাজনৈতিক গুরুত্ব একালে নেই। তবু মহিমা আছে। কিয়োতোর গবর্নর তোরাজো নিনাগাওয়া, মেয়র গিজো তাকায়ামা ও চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি তানেইচিরো নাকানো মিলিত হয়ে এইখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করেছেন।

পৌঁছতেই আমাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন মন্দিরের সাধুরা। জুতো খুলে নিয়ে কাপড়ের চটি পরিয়ে দিতে হাত বাড়ালেন। সব কাজে হাত লাগানোই তাঁদের নীতি। কায়িক শ্রমকে তাঁরা পারমার্থিক মর্যাদা দেন। মেথরের কাজও তাঁদের কাছে শুচি। কোনো মানুষকেই তাঁরা তাঁদের চেয়ে খাটো মনে করেন না। তা বলে একজন সাধু হাঁটু গেড়ে বসে আমার জুতোর ফিতে খুলবেন এ আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব কী করে? সাধুজী জুতো খোলার পুণ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। তখন তাঁর পুণ্যসঞ্চয়ের উপায় হলো জুতো তুলে নিয়ে গিয়ে একত্র রাখা। আমাকে দিলেন একটা চাকতি। আমার জুতোর নম্বর।

তার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো অভ্যন্তরে। একটার পর একটা চত্বর আর প্রকোষ্ঠ পেরিয়ে যেখানে উপনীত হলুম সেটা একটা তিন দিক খোলা মণ্ডপ। মাদুরের উপর সারি সারি কুশন। চতুর্থ দিকে মুখ করে নামাজীদের মতো বসতে হয়। কোথায় আসন নেব ভাবছি এমন সময় দেখি আমার সেই প্রতিবেশিনী। তেমনি রাঙা কিমোনো পরা। সাধারণ জাপানী মেয়ের তুলনায় লম্বা। বিশিষ্ট মহিলা, সন্দেহ নেই। কুশলবিনিময় করা গেল। তার পর আবার প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনী হওয়া গেল। তাঁর অন্য পাশে বসলেন এক অবসরপ্রাপ্ত জাপানী বিচারপতি। যথারীতি কার্ডবিনিময় করা গেল। লক্ষ করলুম তাঁরা বসেছেন হাঁটু গেড়ে। বজ্রাসনে। আমাকেও তা হলে তাই করতে হয়। তা দেখে প্রতিবেশিনী বললেন, "না, না। আপনার কষ্ট হবে। আপনি আপনার দেশের প্রথায় বসুন।" তখন আমি বসলুম পদ্মাসনে। এটা জাপানীদের অভ্যস্ত না হলেও অজানা নয়। জাপানেও বুদ্ধের পদ্মাসন।

পেন কংগ্রেসের সেই শেষ অধিবেশন। আঁদ্রে শাঁসঁ, য়াসুনারি কাওয়াবাতা প্রভৃতির প্রান্ত ভাষণ। বিদায়ের ব্যথা সকলের অন্তরে। কারো কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আবার এ জীবনে ঘটলেও ঘটতে পারে, কিন্তু অধিকাংশের সঙ্গে বিচ্ছেদ চূড়ান্ত।

॥ দশ ॥

প্রশান্তদা (মহলানবিশ) নয়া চীন দেখে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন, ভাবী ভারতের রূপ দর্শন করে এলুম। কিয়োতো দেখে তেনরিয়ুজি দেখে আমিও তেমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখতে পারতুম, প্রাচীন ভারতের রূপ অবলোকন করলুম।

কোথায় এসেছি আমি! কোনখানে বসেছি! এ যে প্রাচীন ভারতের মহাযানবৌদ্ধ মন্দির! দেশান্তরিত ও কালান্তরিত হয়ে নামান্তরিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। তেনরিয়ুজি। ধ্যানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রিন্‌জাই উপ-সম্প্রদায়ের পঞ্চ মহামন্দিরের অন্যতম মহামন্দির। এক টুকরো ভারত। এক রত্তি পালযুগ। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আসতে কয়েক শতাব্দী সময় নিয়েছে। তার পর জাপান নামক দ্বীপের দ্বৈপায়নতার কল্যাণে অবিকৃতভাবে বিরাজ করেছে।

জাপানে বৌদ্ধমন্দিরের নামের অন্তে "জি" থাকে লক্ষ করেছি। এটাও কি ভারতের স্মারক? জানিনে। ছেলেবেলায় শুনেছি, "বলদেবজী যাচ্ছি।" তার মানে বলরামের মন্দিরে যাচ্ছি। কানটা এ রকম প্রয়োগে অভ্যস্ত। জাপানীরা তাদের ভাষায় "তেনরিয়ুজি মন্দির" বলে না। শুধু "তেনরিয়ুজি" বললেই তেনরিয়ুজি মন্দির বোঝায়। তেমনি হোরিয়ুজি, তোদাইজি, হোঙ্গানজি। "তেন" মানে স্বর্গ। "রিয়ু" মানে ড্রাগন। "জি" মানে মন্দির।

মণ্ডপে বসে প্রান্তভাষণ শুনতে শুনতে এদিকে আমাদের গলা কাঠ আর পা ঝিমঝিম। ছাড়া পেয়ে আমরা কোনো মতে গাত্রোত্তলন করলুম। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আড্ডা জমালুম। প্রত্যেকের হাতে চাওয়ান বা চায়ের পেয়ালা। হাতলহীন। তাতে সবুজ চা। সফেন। তিক্তস্বাদ। মিষ্টি মুখের জন্যে জাপানী কেক এলো। কাঠি বেঁধা। কাঠি ধরে তুলে নিয়ে মুখবিবরে পুরে কাঠি খুলে নিতে হয়। চায়ে চুমুক দিতে আপনি বাধ্য, কিন্তু খেয়ে শেষ করতে বাধ্য নন। গল্প করতে করতে চা খাওয়া জাপানী মতে বারণ। ওরা খায় তারিফ করতে করতে। কিন্তু আমরা হলুম বর্বর। আমাদের আশা ওরা ছেড়ে দিয়েছে। আমরাও তাই

প্রাণ ভরে আলাপ করে নিচ্ছি। আবার যে কোনো দিন এমনি জমায়েৎ হবে সে ভরসা তো নেই। পরের দিন সন্ধ্যায় আমাদের ছাড়াছাড়ি। আর ত্রিশ ঘন্টা বাকী। এখন থেকেই ঘণ্টা গুনছি। মিলনের স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করছি।

মন্দিরের এক স্থানে দেখি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ। চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন সর্বজীবের মিত্র। সর্বজীব এসেছে তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে। যেমন গান্ধীকে দেখতে গেছল দিল্লীর সর্বজন। এসেছে দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ মানব। এসেছে পশুপাখীসরীসৃপ। সবাইকে আমার স্মরণ নেই। মনে আছে বেচারা সাপকে আর বেচারি কচ্ছপকে। মিতা চলে গেলেন, আর কে ভালোবাসবে! তারাও শোকে মুহ্যমান।

বৌদ্ধমন্দিরে আমিষ একেবারে অচল। কিন্তু সাকে বা সোমরস নিষিদ্ধ নয়। সেটা অবশ্য সোম থেকে তৈরি হয় না। হয় তণ্ডুল থেকে। চীনা-মাটির ছোট্ট একটি বাটিতে ঢেলে দিয়ে যায়। গরম গরম চুমুক দিতে হয়। এত দিন এড়িয়ে এসেছি। এবার নিয়মভঙ্গ করলুম। দিয়ে যাচ্ছেন কারা? গেইশা নয়, গৃহস্থকন্যা নয়, স্বয়ং স্বামীজীরা। এখানে বলে রাখি যে বহু শতক আগে এক স্বামীজী বিবাহপূর্বক স্বামী হলেন। তাঁকে একঘরে করে যা হলো তা তো রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে বলে গেছেন। "পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কী, সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়িয়ে।" যিনি ভস্ম করেছিলেন তিনিও তো পরে বিবাহ করলেন। তেমনি যাঁরা একঘরে করেছিলেন তাঁরাও। তখন থেকে জাপানের বৌদ্ধ স্বামীজীরা স্বামী হতে আরম্ভ করেন। সবাই না, অনেকেই বিবাহিত। তা কিন্তু তাঁদের মুণ্ডিত মস্তক ও ভেক দেখে বোঝা কঠিন।

স্বামীজীরা আমাদের নিরামিষ খেতে দিলেন, আমিষ নয়। কিন্তু সে খাদ্য এত চমৎকার আর তার পাত্র এমন মনোহারা আর তার সঙ্গে যে ন্যাপকিন আর তোয়ালে ছিল তাও শিল্পের দিক থেকে এরূপ মূল্যবান যে আমরা সাধু-দের সাধুবাদ দিতে দিতে পঙ্‌ক্তিভোজনে বসে দেশকাল ভুলে গেলুম। জল-চৌকির মতো নিচু টেবল জুড়ে জুড়ে লম্বা করলে যেমন দেখায় তার দু'ধারে দু'সার অতিথি। পর পর অনেকগুলি সারি। আড়ালে বুদ্ধমূর্তি। তখন লক্ষ করিনি। পরে গিয়ে প্রণাম করে এলুম।

ভেবেছিলুম আমার জাপানী প্রতিবেশিনীর প্রতিবেশী হব আবার, কিন্তু তা হলে আমার সহযাত্রীরা ভাবতেন, তাই তো! কিয়োতোয় এসে হৃদয় হারানোর তাৎপর্য কী! তা ছাড়া নতুন কিছু শোনবার ছিল না তাঁর কাছে। সমস্যা তো সব দেশেই আছে, কেন তা নিয়ে আলোচনা করে দুর্লভ সময় অপচয় করি! সেই সময়টুকু বরং যাঁরা আমাকে চান তাঁদের দেওয়া যাক। আমি না হলে ভারত পাকিস্তানের মাঝখানে মধ্যস্থ হবে কে? শেষে কি আবার একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে? আর আজ বাদে কাল পাকিস্তানকে কাছে পাচ্ছি কোথায়? কান মলে দিতে হলেও তো এই তার সুযোগ। বসলুম আমার দুই বোনকে দু'পাশে বসিয়ে। গরম তোয়ালে তুলে নিয়ে হাত মুছলুম, মুখ মুছলুম। ঐ ভাবেই হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেল। তারপর ন্যাপকিন সরিয়ে রেখে চপ স্টিক ডান হাতে নিলুম।

একটু পরে কুরাতুলাইন হায়দর আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর অপর পার্শ্ববর্তী ফরাসী লেখকের সঙ্গে। অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্ছ্বাস মিশিয়ে যা বললেন ভদ্রলোক তার বাংলা হলো, "জানিনে কেন যে আমি প্যারিসে আমার জীবনপাত করছি। এমন বেকুব কেউ হয়! এতখানি বেকুব!" তা শুনে আমার মুখের গ্রাস মুখেই রইল। উত্তর দেব কী করে! উত্তর দেবার আছেই বা কী! হৃদয় তো আমরা সকলেই হারিয়েছি। কেউ কম কেউ বেশী।

গল্প করতে করতে আনমনা ছিলুম। লক্ষ করিনি কখন এক সময় বাবাজীরা এসে বাসন তুলে নিয়ে গেছেন। পড়ে আছে সাকের পাত্র, সাকের আধার। সুশ্রী চীনামাটির কাজ। পড়ে আছে বাঁশের ফুলদানী, ফল রাখার চাঙাড়ি। বিশ্বকর্মার আপন হাতের তৈরি। পড়ে আছে নক্শী ন্যাপকিন, সেটা ঠিক হাত মোছার জন্যে নয়, খাবার ঢাকা দেওয়ার জন্যে। হাত মোছার জন্যে ছিল সুচারু কাগজের সার্ভিয়েট। হঠাৎ দেখি হরির লুট। যে যার ব্যবহৃত অব্যবহৃত সরঞ্জাম নিয়ে ছাঁদা বাঁধতে যাচ্ছেন। সাধুজীরা বলছেন, "নিন। নিন। যেটা খুশি নিয়ে যান। যতগুলো খুশি নিয়ে যান।"

জাপানের স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে প্রস্থান করলুম আমরা। কারো কারো বোঁচকা ফুলে ঢোল। অতঃপর চটি ছেড়ে জুতো পায়ে দেওয়া। ইয়া ইয়া "জুতোর চামচ" নিয়ে এলেন স্বামীজীরা। যাকে আমরা বলি শু-হর্ন।

আকারে আমাদের গু-হর্নের তিন চার গুণ। জুতো খুঁজে পেতে এক মিনিটও লাগল না। চাকতি দেখাতেই জুতো হাজির। তার পর জুতো পায়ে বাগানের এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে বাসে উঠে বসা।

সন্ধ্যায় নোমুরা ভিলায় নিমন্ত্রণ। পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্রাবলোকন। কী জানি কেন এই পূর্ণিমাটিতেই চাঁদ দেখার উৎসব অনুষ্ঠিত হয় জাপানের সবখানে। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতিথি। কী ভাগ্যি টাইফুন আসেনি। দিনটি পরিষ্কার। হাতে তিন ঘণ্টা সময়। বাস চলল আমাদের নিয়ে নগর পরিক্রমায়। কিয়োতোর কয়েকটি বিখ্যাত কীর্তি দেখাতে। সব ক'টির জন্যে তিন ঘণ্টা কেন তিন মাসও যথেষ্ট নয়। প্রথমে কাৎসুরা বিচ্ছিন্ন প্রাসাদ। সোজা বাংলায় রাজকুমারের বাগানবাড়ী। তার পরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। এখনো সেখানে নতুন সম্রাটের অভিষেক হয়। নয়তো শূন্য পড়ে থাকে। তার পরে কিন্‌কাকুজি বা সোনার মণ্ডপ। আসল নাম রোকুওনজি মন্দির। এই তিনটি ছাড়া ছাড়া জায়গায় যেতে যেতে থামতে থামতে সবাইকে কুড়িয়ে বাসে ওঠাতে ওঠাতে পাঁচটা বেজে গেল।

কাৎসুরা বাগানবাড়ীর বৈশিষ্ট্য তার বিচিত্র উদ্যান ও স্থকিয়া শৈলীর গৃহ। কাজ আরম্ভ হয় ১৫৯০ সালে। কিছু কম চার শ'বছর আগে। পরিকল্পনাটা শোনা যায় কোবোরি এন্‌শু নামক প্রখ্যাত বাস্তশিল্পীর। তিনি ছিলেন চা-অনুষ্ঠানেরও ওস্তাদ। বাগানবাড়ীর পরিবেশ শান্ত ও সুন্দর। শহরের বাইরে। সেখান থেকে আরাশিয়ামা ও কামেয়ামা পাহাড় দেখা যায়। কোন এক শাহজাদার জন্যে এটি নির্মিত হয়েছিল। আমাদের শাহজাদাদের মতো জাঁকালো রুচি ছিল না তাঁর। ছোট ছোট গুটি তিনেক কাঠের তৈরি বাংলা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। জাপানী ধরনের বাংলা। ভিতরে মাদুরে মোড়া মেজে। কাগজের দেয়াল। আসবাব বলতে বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু রূপে আর সুষমায় অনুপম। উদ্যানের তো কথাই নেই।

উদ্যানের মাঝে মাঝে সরোবর। পাথরের লণ্ঠন। জায়গায় জায়গায় বর্ষাকালের ঝরণার ধারা পার হবার জন্যে গোল গোল পাথরের পৈঠা। পা ফেলে পা তুলে হুঁশিয়ার হয়ে হাঁটতে হয়। মনে হয় বনস্থলীর ভিতর দিয়ে চলেছি। জাপানের উদ্যানশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইংরেজীতে একে বলে

ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেন। প্রকৃতির রচিত বন যেমন মানুষের রচিত উপবন তেমনি। অপ্রকৃতি নয়, বিকৃতি নয়, প্রকৃতির ভাবে বিভোর হয়ে প্রকৃতির প্রকৃতি অবগত হয়ে আয়ত্ত করে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের মানস কৃতি। জাপানের উদ্যানশিল্পীরা ধ্যানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের না হলেও তাঁদেরি স্বজাতি। এ ক্ষেত্রেও এস্থেটিক ও আধ্যাত্মিক এক হয়ে গেছে, যেমন চা অনুষ্ঠানে। সেইজন্যে বাগানবাড়ী বলে এর পরিচয় না দেওয়াই ভালো। তাতে ভুল ধারণা জন্মায়। এ হয়েছে তাদের জন্যেই, যারা সংসার ছাড়বে না সাধুদের মতো, অথচ সংসার করবে না বারো মাস অষ্টপ্রহর। সদর থেকে অন্দরে যাবার মতো সংসার থেকে প্রকৃতির কোলে যাবে ও সংসার ভুলে খোলা চোখে ধ্যানস্থ হবে। পরজন্ম ও পরকালের জন্যে নয়, আত্মজ্ঞানের জন্যে।

মূল রাজপ্রাসাদের থেকে বিচ্ছিন্ন এই প্রাসাদ দেখে রওনা হলুম আমরা মূল রাজপ্রাসাদের দিকে। শহরতলী থেকে শহরে। অষ্টম শতাব্দীর শেষপ্রান্তে সম্রাট কাম্মু যেখানে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন এখনকার প্রাসাদ সেখানে নয়, তার পূবে। এই প্রাসাদও বার বার পুড়ে যাওয়ার পর পুনর্নির্মিত হয়েছে এক শ' বছর আগে। বাদশাহী প্রাসাদ বললে আমাদের কল্পনায় যে দৃশ্য পরিস্ফুট হয় এ দৃশ্য তেমন নয়। কাঠের তৈরি, টালি দিয়ে ছাওয়া। ভূমিকম্পের দেশে তখনকার দিনে এরই উপর কারিগরি ফলানো হতো। ছবি টানিয়ে দেওয়া হতো। সমস্ত ঘুরে দেখার সময় ছিল না, চোখ বুলিয়ে নেওয়া গেল। সুরম্য উদ্যান। প্রশস্ত অঙ্গন। তবে তোকিয়োর মতো চার দিকে পরিখা নয়, প্রাচীর শুধু।

কিন্‌কাকুজি মাত্র দু'বছর আগে পুনর্নির্মিত হয়েছে। সাত বছর আগে পুড়ে যায়। আসল মণ্ডপটি চতুর্দশ শতাব্দীর কীর্তি। আশিকাগা য়োশিমিৎসু নামক শোগুন সেটি নির্মাণ করেছিলেন ভোগের জন্যে। সোনা দিয়ে মোড়া হয়েছিল এর দেয়াল, এর মেজে, এর থাম। সেইখানে বসে তিনি চা খেতেন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃৎ সে-আমির সঙ্গে। নো নাটক রচয়িতা সে-আমি। জাপানের রাজার সঙ্গে নাট্যকারের বন্ধুতা। কেমন নাটকীয় শোনায়! ধ্যানী বৌদ্ধ রণপতি চা সেবার সঙ্গে সৌন্দর্য উপভোগ মিলিয়ে ধর্মসাধনার উপযোগী পরিবেশ পেতেন যেখানে এখন সেখানে ধ্যানী বৌদ্ধ মন্দির তথা সরোবর ও উদ্যান। ঘুরে ফিরে দেখলুম কেমন করে গাছকে

কচি বয়স থেকে তালিম করা হয়। মানুষের হাতে গড়া গাছ আকারে প্রকারে অন্য গাছের মতো নয়। পাইন তরু হয়েছে নৌকার মতো।

কিন্‌কাকুজিতে লোকের ভিড়। তাই তার বহির্দ্বারে স্মারকচিহ্নের দোকান। কেক বেচতে এসেছিল গ্রামের মেয়েরা। পরনে রঙচঙে আঞ্চলিক পরিচ্ছদ। কিমোনো নয়। মোম্পে নয়। চৈনিক বা পাশ্চাত্য নয়। বিনা প্রয়োজনে জাপানী কেক কিনলুম এক শ' ইয়েন দিয়ে। শুধু তাদের হাসির ভাগ নিতে। তকতকে কাগজে মোড়া। মাছি বসে না। ধুলো লাগে না। গ্রামের মেয়েদেরও স্বাস্থ্যবোধ আছে। রুচিবোধের তো কথাই নেই।

নোমুরা ভিলায় যাবার আগে হোটেলে গিয়ে কাপড় ছেড়ে সান্ধ্য পোশাক পরতে হলো। তার মানে কালো শেরোয়ানি। এটা সঙ্গে এনে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি। অচেনারাও এসে আলাপ জমায়। তবে ওটা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। ওই যে বলে, সুন্দর দেখায়। তরুণ দেখায়। তা নয়। আমি স্বদেশের খাতিরেই স্বদেশী সাজি। কিন্তু চুড়িদারকে নিয়ে জ্বালাতন হওয়া আমার ঘুচল না। ফিতে যদি বা কিনতে পাওয়া গেল ছুঁচ সুতো কিনতে উৎসাহ নেই। সেলাই খুলে গেলে আমি অপ্রস্তুত ও অসহায়। ট্রাউজার্সের উপর শেরোয়ানি পরতে আমার বিবেকে বাধে। অগত্যা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হয়। শেরোয়ানি দিয়েই পায়জামার ফাঁক। একটু সচেতনভাবে চলাফেরা করতে হয়।

নোমুরা ভিলার চারদিকে বিস্তৃত জাপানী উদ্যান। চার একর জমি জুড়েছে শহরের মাঝখানে। আর কোনো বড়লোক হলে বাগানের বদলে ম্যানসন তৈরি করে ভাড়া দিতেন। কিন্তু নোমুরা ছিলেন বড়লোকদের মধ্যেও বড়লোক। জাপানের দশরত্নের দশম রত্ন। জাইবাৎসুর নাম শুনেছেন? মিৎসুই, মিৎসুবিশি, সুমিতোমো, য়াসুদা। এঁরা হলেন জাপানের চার মহাশ্রেষ্ঠী। অর্থনৈতিক সম্রাট চতুষ্টয়। এঁদের পরে আরো ছ'টি এমনিতর পরিবার। আয়ুকাওয়া, আসানো, ফুরুকাওয়া, ওকুরা, নাকাজিমা, নোমুরা। ম্যাকআর্থার এঁদের মৌচাক ভেঙে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এঁরা আবার জমিয়ে বসেছেন। মার্কিনদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়।

তোকুশিচি নোমুরা এখন জীবিত নেই। চল্লিশ বছর আগে তিনি এই

উত্থান আরম্ভ করেন। ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনের জন্যে প্রথমে বেছে নিতে হয় এমন একটি স্থল যেখানে প্রকৃতি স্বয়ং সুন্দরী। প্রকৃতির সোনার সঙ্গে আর্টের সোহাগা মেশাতে যারা জানে তারাই জাপানের মালঞ্চের মালাকর হয়। বাগানে যে বাড়ী থাকে তাতে মেশাতে হয় সরলতার সঙ্গে মহত্ব। আর নানা দুর্গম স্থান থেকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসতে হয় দুর্লভ দুর্মূল্য পাথরের লণ্ঠন, পাথরে গড়া হাত ধোবার কুণ্ড, শিলা, তরু ইত্যাদি। এসব তো ছিলই। আর ছিল সরোবর ও হংস। এক সন্ধ্যার জন্যে আমরা এখানে স্বচ্ছন্দচারী স্বেচ্ছাগতি।

প্রবেশ করতেই অভ্যর্থনা করলেন নোমুরা কারবারের একজন কর্তাব্যক্তি। ঢুকে দেখি প্লেটের গায়ে অতিথিদের বলা হচ্ছে ছবি আঁকতে। তুলি আর রং মজুত। গোল বা চার কোণা প্লেট। গ্লাসও ছিল। ছবি আঁকতে না জানলে নাম লিখতে পারেন, কথা লিখতে পারেন। পরে গ্লেজ করা হবে। যে যার প্লেট বা গ্লাস পাবেন। একে বলে রাকুয়াকি। কিয়োতোর একটি বিশিষ্ট শিল্প। আমিও একটি নাম লিখলুম। আমার বড়মেয়ের নাম। তার পর কয়েক পা যেতেই দেখি তুলি দিয়ে কবিতা লেখা হচ্ছে। তার জন্যে লম্বা মোটা রঙিন একরকম কাগজ থাকে। সোনার জল বা রুপোর জল মাখা। আমিও একটি কবিতার কয়েক ছত্র লিখলুম। আমারি পুরোনো লেখা। এটা কিন্তু ওঁরাই রাখবেন। অতিথির স্মৃতিচিহ্ন। বাংলা হরফের বাংলা ভাষার নিদর্শন।

দীঘিটি গোলও নয়, চৌকোণও নয়, অনেকটা কৃষ্ণসাগরের মতো আকৃতি। তার কিনারে কিনারে বা দক্ষিণের রাস্তার ধারে ধারে চা কফি বীয়ার সুশি তেম্পুরা মুরগি সোবা ককটেল স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদির আড্ডা। দীয়তাং নীয়তাং। দীয়তাং বলার আগেই নীয়তাং। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাইয়তাং পীয়তাং। ডালায় করে পানীয় নিয়ে ঘুরছিল অল্পবয়সী মেয়েরা। তাদের একদলের সাজ পশ্চিমের ব্যালেরিনার মতো। ফুরফুরে মিহি শাদা কটিবাস। বব করা চুল। তখন আমি জানতুম না, পরের দিন শুনলুম যে ওরা মডার্ন গেইশা। চাঁদ দেখতে গেছি আমরা। দেখি চাঁদের হাট।

উত্তর কিনারে একটি যাদুঘরের মতো ছিল। সেখানে নো নাটকের অতি পুরাতন সাজপোশাক। ভীষণ মূল্যবান। তেমনি জমকালো। তার

পাশে ছিল নো নাটকের মঞ্চ। নাটক দেখার আগে আমরা দেখা করলুম গৃহকর্ত্রী মোমুয়া ঠাকুরানীর সঙ্গে। অনাড়ম্বর নিরহঙ্কার ভদ্রমহিলা। কিয়োনা পরিহিতা বৃদ্ধা। আমাদের দেশের গিন্নীবান্নী মানুষ।

নো নাটক পুরুষরাই করে। কিন্তু আমরা যা দেখলুম তা পুরুষবর্জিত সংস্করণ। নো নয়। কিয়োমাই। নাটক নয়, নৃত্যনাট্য। প্রথম নাট্যে অংশ নিল কিয়োতোর নাম-করা নটীরা, যাদের বলে মাইকো। দ্বিতীয় নাট্যে কেবল একজনের ভূমিকা। ইনি জাপানের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী য়াচিয়ো ইনোউএ। চার পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু করে পঞ্চাশ বছর ধরে ইনি এই নাট্যপ্রকরণের সনাতন ধারার শুদ্ধি রক্ষা করে আসছেন। এসব ক্লাসিকাল নৃত্যের মর্ম আমাকে বুঝিয়ে দেবে কে? তবু বুঝতে পারলুম যে এর পিছনে রয়েছে কঠোর সাধনা। শুনলুম বড় বড় পরিবারের নিজেদের স্থায়ী নো মঞ্চ থাকে। বৃত্তিভোগী অভিনেতা বা নর্তকী সম্প্রদায় থাকে।

সরসীর অন্য প্রান্তে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে গাগাকু সঙ্গীতের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ঘোরাঘুরি করে গানবাজনা শুনতে না পেয়ে মন দেওয়া গেল পানভোজনে। তার চেয়ে বড় কথা চন্দ্রাবলোকনে। মাটির চাঁদ নয়, আকাশের চাঁদ। জলে হাঁস, ডাঙায় মানুষ, দূর পাহাড়ের চূড়ায় আগুন কি আলোকমালা। কানে এলো একপ্রকার সঙ্গীত। কিন্তু তার সন্ধানে যেতে না যেতে মিলিয়ে গেল। কাছে গিয়ে দেখি গাগাকু মঞ্চ থেকে কারা সব অপরূপ পোশাকে বেরিয়ে যাচ্ছে। জলের ধারে কান পেতে বসলুম। যদি আবার আসে। না। আর এলো না। জ্যোৎস্নায় দশদিক ভেসে যাচ্ছে। আমরাও ভেসে গেলুম জনতা থেকে বিজনতায়। বিজনতায়।

হোটেলে ফিরে মোরাভিয়াকে দেখি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে। এই ক'দিনে কত লেখকের সঙ্গে মুখ চেনা হয়েছে। দুটি একটি কথাও। ইংরেজ লেখক আলেক ওহ্ (Alec Waugh) থাকেন জাপানী সরাইতে। তিনি যা বর্ণনা দিলেন তা শুনে আমারি আফসোস হলো কেন হোটেলের বদলে সরাই মনোনয়ন করিনি। এক একটি অতিথির জন্যে এক একটি পরিচারিকা। সাহেব আছেন রাজার হালে। আমার অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন

কিছুকাল আগে তো ইংলণ্ডেও স্বতন্ত্র স্নানাগার পাওয়া যেত না। হয় একটু অসুবিধা। তা সেটা সহনের অতীত নয়। ইন্দোনেশিয়ার লেখক আলীশাবানাও থাকেন জাপানী সরাইতে। হোটেল তো আজকাল সব দেশে। জাপানী সরাই কেবল জাপানেই। এটা এমন একটা অভিজ্ঞতা যা হারালে পরে পশ্তাতে হবে। যারা অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে বেরিয়েছে এটাও তাদের একটা অ্যাডভেঞ্চার বলে ধরে নিলেই হয়।

এয়ারকণ্ডিশনের একটা যন্ত্র ছিল আমার ঘরে। কেমন আরাম! দেয়াল-জোড়া কাচের জানালা। ঘরে বসেই পাহাড় দেখতে পাই। পাহাড়ের সঙ্গে আমার ছেলেবেলায় আত্মীয়তা। ঘরের সঙ্গেই সংলগ্ন স্নানাগার। যখন খুশি গরম জল। আমিই বা কোন প্রজার হালে আছি! তা সত্ত্বেও থেকে থেকে আফসোস জাগে। আরে, এ তো সব দেশে পাওয়া যায়! এর জন্যে এত দূর আসা! পরে এমন কত হোটেলে বাস করব। কিন্তু জাপানী সরাই পাব কোথায়? তার জন্যে আবার কি আসতে হবে জাপানে? নাঃ! ভুল করেছি জাপানী সরাইয়ের জন্যে নাম না দিয়ে। হতে হতো দলচ্যুত। না হয় হওয়াই গেল। কিন্তু অমন একটা অভিজ্ঞতা হেলায় হারালুম। কেবল স্নানাগারের কথা ভেবে। অশুচিতার ভয়ে। কোথায় গেল আমার রোবাস্ট ভাব! নীতিবাইগ্রস্ত শুচিবাইগ্রস্ত হয়ে উঠেছি। আমি কি শিল্পী? না সম্ভ্রান্ত লোক?

কংগ্রেসের শেষে কিয়োতোয় দিন কয়েক থেকে আরো দেখার প্রোগ্রাম তৈরি করে দিয়েছিলেন কাসুগাই-সান। যোগবিয়োগ করেছিলেন তোদো-সান। আমি তাতে সন্নিবেশ করতে চাইলুম জাপানী সরাই। বেশী নয়। এক দিন। তোদো-সান বললেন, আচ্ছা। তিনিই ভার নিলেন সব ঠিকঠাক করার। (আমরা যেমন বলি গান্ধীজী, নেহরুজী, নেতাজী জাপানীরা তেমনি "জী"র জায়গায় "সান" যোগ করে সম্মান দেখায়। "সামা" যোগ করা হয় বিশেষ সম্মানার্থে।)

পরের দিন বিব্লি এসে এক মজার গল্প বলল। সে একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখকের ভক্ত। তাঁর অটোগ্রাফ আদায় করে দেবার জন্যে আমাকে ধরেছিল। আমি বলে রেখেছিলুম তাঁকে। সকালবেলা কার মুখ দেখে উঠেছিল বিব্লি, ভদ্রলোকের ঘরের দরজায় টোকা দিতেই ভিতর থেকে দরজা

খুলে গেল, দেখা গেল স্বনামধন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছেন। মানুষপ্রমাণ আয়নায় আদি মানবের ছবি। বাবা আদমের তবু একটা ডুমুরের পাতা ছিল। শিল্পীগুরুর তেমন কোনো পত্রাচ্ছাদন ছিল না। কোথায় অপ্রতিভ হয়ে গাউন-টাউন একটা কিছু কুড়িয়ে নিয়ে জড়াবেন! তা নয়। সম্পূর্ণ সপ্রতিভ ভাবে দাড়ি কামাতে কামাতে আয়না থেকে মুখ না ফিরিয়ে বললেন, "এই যে। এস। বস। তোমার কথা আমি মিস্টার রায়ের কাছে শুনেছি।"

সেই দিন পেন কংগ্রেসের লেখকদের নারা দর্শনের পর শেষ বিদায়। কারো উপর রাগ করা উচিত নয়। কে যে কোথায় চলে যাবে তার পর আর হয়তো এ জীবনে সাক্ষাৎ হবে না। তা ছাড়া অত বড় একজন খ্যাতিমানের সঙ্গে আমি বিবৃলির জন্যে ঝগড়া করতে যাব নাকি! বললুম, "আর্টিস্টরা ও রকম খেয়ালী হয়েই থাকে। খুব সম্ভব হাতের কাছে ড্রেসিং গাউন ছিল না। তোমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখাও অভদ্রতা হতো। অন্যমনস্ক ছিলেন, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, ভিতরে আসুন। ভেবে দেখ কত বড় সৌভাগ্য তোমার যে ঘরে ঢুকে তাঁর মতো লোকের অটোগ্রাফ আদায় করে আনতে পারলে! আর কেউ হলে পারত?"

সেদিন আমরা সদলবলে নারা চললুম বাস-যোগে। প্রাতরাশের পর। বাসে যেতে যেতে কেবলি মনে হচ্ছিল আর দেখা হবে না, আর দেখা হবে না। আজকেই সন্ধ্যাবেলা আমাদের শেষ বিদায়। কাল সকাল পর্যন্ত জন কয়েক থাকবে আমার মতো। তারা নিঃসঙ্গ। কেমন করে তাদের ভালো লাগবে নিঃসঙ্গ বিচরণ!

কিয়োতোর আদি নাম ছিল হেইআন-কিয়ো। ৭৯৪ সালে রাজধানী সরে আসে সেখানে। সরে আসে নারা থেকে। নারাতেও রাজধানী এক শতাব্দীর চেয়ে অল্পকাল ছিল। দুই রাজধানীর তখনকার দিনের মানচিত্র দেখলে বিস্মিত হতে হয়। যেন দু'খানি শতরঞ্চের ছক। সরল রেখার সঙ্গে সরল রেখা কাটাকুটি করে জ্যামিতিক চতুষ্কোণ রচনা করেছে। উত্তর দিকের মাঝের চতুষ্কোণটি রাজপ্রাসাদ। একালের মানচিত্রে অনেক অদলবদল হয়েছে। তবু মোটের উপর তেমনি দাবাখেলার ছকের মতো দেখতে। পৃথিবীর সব চেয়ে আধুনিক শহরের নকশা কি এর চেয়ে আধুনিক? সেকালের জাপানের এই নগরবিন্যাসের

রীতি এসেছিল সাগরপারের কন্টিনেন্ট থেকে। ইংরেজদের কাছে কন্টিনেন্ট মানে অবশিষ্ট ইউরোপ। জাপানীদের কাছে কন্টিনেন্ট মানে অবশিষ্ট এশিয়া। বিশেষ করে কোরিয়া ও চীন। তথা ভারত। এই দুটি শহরের সমবয়সী সে-সব দেশে থাকলেও এরূপ নগরবিন্যাস এখনো আছে কি না আমার জানা নেই। জাপানে কিন্তু যাদুঘরের মতো রক্ষিত হয়ে এসেছে, সুরক্ষিত রয়েছে, এই দুটি যাদু শহর।

সাগা নোগোমি নিংগিয়ো

॥ এগারো ॥

টাইফুন অন্য দিক দিয়ে ছুঁয়ে গেল, এমন কিছু ক্ষতি করে গেল না। আমরা যা পেলুম তা ঝড় নয়, জল। ভিজতে ভিজতে নারা হোটেলে উঠলুম। তীর্থদর্শন পরে হবে, আগে তো একটু চাঙ্গা হয়ে নেওয়া যাক। চা! চা! কোথায় চা! খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার করা গেল একটা ঘর, সেখানে চা কফির আড্ডা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পান করলুম আমরা ক'জন আবিষ্কারক। চায়ের স্বাদ এত ভালো এর আগে পাইনি। তোকিয়োতে। কিয়োতোয়। নারার উপর পক্ষপাত জন্মাবে না? তখনো তাকে দেখিনি যদিও।

তা ছাড়া আমরা ভারতীয়রা এমনিতেই নারার পক্ষপাতী। ভারতের প্রভাব যদি কোথাও থাকে জাপানের তবে তা এইখানে। আমাদের দেশে যখন গুপ্তযুগ তখন কোরিয়া থেকে জাপান সম্রাটের কাছে ৫৩৮ সালে উপঢৌকন-রূপে এলো বৌদ্ধমূর্তি, সূত্র ও ভাষ্য। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সদ্ধর্ম। নারার কাছাকাছি আস্কা ছিল জাপানের রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়া ছিল ধর্মের পক্ষে ও শিল্পের পক্ষে অনুকূল। মন্দির আর মূর্তি নির্মাণ শুরু হলো। ৬০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো হোরিয়ুজি মন্দির। নারার আরো কাছে। ৭১০ সালে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো নারায়। নামকরণ হলো হেইজোকিয়ো। আরো কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ৭৫২ সালে উন্মোচন করা হলো তোদাইজি মন্দিরের বিশ্ববিখ্যাত বৈরোচন বুদ্ধবিগ্রহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন ভারত থেকে আগত মহাশ্রমণ। গৌড়ে তখন পালযুগ সবে আরম্ভ হচ্ছে। বঙ্গ আর জাপান দুই তখন বৌদ্ধ। মহাযান দুই দেশের সেতুবন্ধ। মহাশ্রমণ কি তিব্বত চীন অতিক্রম করে কোরিয়া হয়ে জাপানে গেলেন? না তাম্রলিপ্ত থেকে জাহাজে করে উপকূল ধরে সরাসরি সমুদ্রপথে? কে জানে! হয়তো গান্ধার থেকে খাসগড়ের রাস্তায় মঙ্গোলিয়া ঘুরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রেশম মার্গে।

ক্রমে রাজদরবারের উপর বৌদ্ধ মঠগুলির প্রভাব বাড়তে বাড়তে এমন হলো যে নারা নগরীর পাঁচ লক্ষ অধিবাসীকে পরিত্যাগ করে সম্রাট তাঁর রাজধানী সরিয়ে নিলেন ছাব্বিশ মাইল দূরে ৭৯৪ সালে হেইআন-কিয়ো

শহরে। রাজনীতির উপর ধার্মিকদের হস্তক্ষেপ সমসাময়িক খ্রীস্টান ও মুসলমানদেরও রীতি ছিল। তার দরুন রাজারা রাজধানী পরিবর্তন করেছেন বলে শুনিনি। মনে হয় অন্য কোনো কারণ ছিল। যা হোক বৌদ্ধরা অত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। কিয়োতো ভরে গেল বৌদ্ধ মঠে ও মন্দিরে। এক একজন সাধু চীনদেশে যান, সদ্ধর্ম শিখে আসেন ও এক একটি সম্প্রদায় স্থাপন করেন কিয়োতোয় বা তার আশেপাশে। নারার কপালে সায়োনারা। প্রভাব কাটিয়ে যাওয়া কেবল নারার থেকে নয়। ভারতের থেকেও। নারার বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি যতখানি ভারতীয় কিয়োতোর নববৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি ততখানি নয়। তারা ততোধিক চৈনিক কিংবা স্বদেশী।

আমাদের বাস চলল নারা পার্কের ভিতর দিয়ে। বারো শ' একর জমি জুড়ে পার্ক। আট মাইল রাস্তার এক ধারে ময়দান, আরেক ধারে বন ও শৈল। বনে থাকে নানা জাতের গাছপালা পশুপাখী। তাদের মধ্যে শ' ছয়েক হরিণ। হরিণ আছে বলে নারা পার্কের অপর নাম ডিয়ার পার্ক। বুদ্ধদেবের মৃগদাব নয় তো? হরিণকে পবিত্র প্রাণী জ্ঞানে সযত্নে রক্ষা করা হয়। হরিণহত্যা মহাপাপ তো বটেই, দণ্ডনীয় অপরাধও বটে। হরিণরা শহরের পথেঘাটেও ঘুরে বেড়ায়। লোকে আদর করে খেতে দেয়। ভাবলে অবাক হতে হয় যে হাজার দেড়েক বছর ধরে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃগযূথও জাপানের মাটিতে দৃঢ়মূল হয়েছে। শিন্তোরাও হরিণ ভালোবাসে তার প্রমাণ পেলুম নারা পার্কেরই অন্যতম দ্রষ্টব্য কাসুগা পীঠে। এটা কি নারার ঐতিহ্যগুণে না হরিণের নিজগুণে? কিন্তু শিন্তো তীর্থের কথা পরে।

ভিজতে ভিজতে নামলুম তোদাইজি মন্দিরে। ছত্র জোগালেন মন্দিরের সাধুজীরা। বিরাট এক পুরীর মহলের পর মহল পেরিয়ে অবশেষে উপনীত হলুম মহাবুদ্ধের দারুময় মন্দিরগৃহে। পদ্মের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ। ব্রঞ্জ দিয়ে তৈরি বিশাল বিগ্রহ। উপবিষ্ট অবস্থাতেই দেহের উচ্চতা তিপ্পান্ন ফুট ন' ইঞ্চি। মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্য ষোল ফুট, প্রস্থ ন' ফুট পাঁচ ইঞ্চি। এক একটি চোখের দৈর্ঘ্য তিন ফুট ন' ইঞ্চি। এক একটি কানের দৈর্ঘ্য আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি। দুই কাঁধের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আটাশ ফুট সাত ইঞ্চি। তা হলে অনুমান করুন বাকী সব। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিগ্রহ

ঢালাই করতে লেগেছিল ৪৩৮ টন তামা, ৮ টন শাদা মোম, ৮৭০ পাউণ্ডের মতো সোনা, ৪৮৫৫ পাউণ্ডের মতো পারা। তখনকার দিনের জাপানীরা বুদ্ধকে কী পরিমাণ ভক্তি করত এ যেমন সেই ভক্তির অভিব্যক্তি তেমনি তাদের শিল্পকলার জীবনীশক্তিরও। তার পর আরো শুনুন। যে পদ্মের উপর বুদ্ধ বসেছেন সেও মানুষসমান উঁচু। তার নিচে বেদী। বেদী আর পদ্ম আর বিগ্রহ মিলিয়ে উচ্চতা সাড়ে একাত্তর ফুট। বিশালকে রাখতে আরো বিশাল গৃহ। তার উচ্চতা এক শ' ছাপান্ন ফুট। বেড় পুবে পশ্চিমে এক শ' অষ্টাশি ফুট, উত্তরে দক্ষিণে এক শ' ছেষট্টি ফুট। পৃথিবীতে এত বড় ব্রঞ্জমূর্তিও নেই, এত বড় দারুমন্দিরও নেই। মন্দির নাকি আরো উচ্চ ছিল, পুড়ে যাওয়ায় পুনর্নির্মাণ কালে এক-তৃতীয়াংশ খাটো হয়েছে।

জাপানের সেই যে আতঙ্কের কথা গাইড মেয়েটি বলেছিল তার বারো আনা সত্যি। প্রথম নির্মাণের এক শ' বছর যেতে না যেতেই ভূমিকম্পে ভেঙে যায় বুদ্ধমূর্তির মাথাটি। সেটি যদি বা জোড়া গেল দ্বাদশ শতাব্দীর যুদ্ধে মন্দির গেল পুড়ে আর বিগ্রহের হলো ক্ষতি। এক শ' বছর লাগল পুনরুদ্ধার করতে। ষোড়শ শতাব্দীতে আবার যুদ্ধ। আবার তেমনি পুড়ে গেল মন্দির, জখম হলো বিগ্রহ। পুনঃসংস্কার হতে হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর আদ্য। এইসব কারণে বিগ্রহটির উত্তমাঙ্গ অষ্টাদশ শতাব্দীর, মধ্যমাঙ্গ দ্বাদশ শতাব্দীর, অধমাঙ্গ মূল অষ্টম শতাব্দীর।

সম্রাট শো-মু এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। একে বলা হয় তেম্‌পিয়ো যুগের প্রতীক। এ মন্দির কেগন সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ মহামন্দির। এর অধীনে বহু মন্দির। উপদেশ দিতে তন্ময় মহাবুদ্ধ আমাদের চিরপরিচিত হয়েও অপরিচিত। চিরপরিচিত ভাব ভঙ্গী মুদ্রা আসন। অপরিচিত নাম। বৈরোচন বুদ্ধ। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম বুদ্ধদেবের নাম যেমন গৌতম বা সিদ্ধার্থ বা শাক্যসিংহ বা তথাগত তেমনি বৈরোচন। তা নয়। তা নয়। ইনি গৌতম বুদ্ধই নন। জাপানীরা তাঁকে বলে শাক্যমুনি বুদ্ধ। ইনি বৈরোচন বুদ্ধ। অবতংসক ও ব্রহ্মজাল সূত্র পড়েছেন? আমি পড়িনি। তাতে নাকি লিখেছে বৈরোচন বুদ্ধের আসন সহস্রদল পদ্ম। প্রত্যেকটি পাপড়িতে লক্ষ কোটি ব্রহ্মাণ্ড। প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে একটি করে শাক্যমুনি বুদ্ধ। আমরা সেদিন একমাত্র বৈরোচনকেই দেখে বন্দনা করেছি, সন্ধান নিইনি সহস্রগুণিত

লক্ষ কোটি শাক্যমুনির। আমরা যাঁকে দর্শন করলুম তাঁর কেশে ২৬৬ সংখ্যক গ্রন্থি বা জট।

জাপানে না গেলে এ শিক্ষা আমার হতো না যে বুদ্ধ বলতে কেবল গৌতম বুদ্ধ বা তাঁর জন্মাজন্মান্তর বোঝায় না। জাপানে ওরা শাক্যমুনিকে যেমন মানে তেমনি আরো কয়েকজন বুদ্ধকেও মানে। এঁরাও বুদ্ধ হয়েছেন বা হয়ে উঠছেন। আমরা মনে করি অমিতাভ বুঝি সিদ্ধার্থেরই অন্য এক নাম। উঁহু। সুখাবতীব্যূহ সূত্র পাঠ করেছেন? করেননি। আমিও করিনি। তাতে নাকি লিখেছে সেকালে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম লোকেশ্বররাজ। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে ধর্মাকর নাম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের সাক্ষাতে তিনি আটচল্লিশটি ব্রত নেন। ব্রতসিদ্ধির ফলে তিনিও বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তখন তাঁর আখ্যা হয় অমিতাভ। আর তাঁর লোক হয় সুখাবতী। পশ্চিম স্বর্গ। শুদ্ধ স্বর্গ। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক নামক গ্রন্থেও নাকি তাঁর উল্লেখ আছে। মহাযান বৌদ্ধদের এমনি অনেক গ্রন্থ দেশান্তরিত হয়েছে, তাই কোথায় কী আছে তা বিদেশীয়রাই জানে। অমিতাভকে আবার বলে অমিতায়ু। যাঁর আয়ু অমিত। জাপানের লোক তাঁকেই চেনে বেশী। জাপানী অপভ্রংশ অমিদা।

মৈত্রেয় বুদ্ধের নাম আমরা সকলে শুনেছি। বুদ্ধ আবার আসবেন মৈত্রেয় রূপে, এ ধারণা কিন্তু ভুল। যিনি আসবেন তিনি বারাণসীর এক ব্রাহ্মণসন্তান, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে মৈত্রেয় নাম নিয়েছিলেন। তিনি এখন মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব রূপে তুষিত স্বর্গে বাস করছেন। শাক্যমুনির নির্বাণের পর পাঁচ শ' ছেষট্টি কোটি বছর অতীত হলে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করে মর্ত্যে আবির্ভূত হবেন। এখন তো মাত্র আড়াই হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং একটু দেরি হবে। বর্তমান কল্পের তিনি কিন্তু শেষ বুদ্ধ নন। তিনি সহস্রের মধ্যে পঞ্চম। প্রথম বুদ্ধের নাম ক্রকুচ্ছন্দ। দ্বিতীয়ের নাম কনকমুনি। তৃতীয়ের নাম কাশ্যপ। চতুর্থের নাম শাক্যমুনি। তা হলে দেখা যাচ্ছে চতুর্থ ও পঞ্চমের মাঝখানে পাঁচ শ' পঁয়ষট্টি কোটি নিরনব্বই লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচ শ' বছর ব্যবধান। জাপানীদের মধ্যে যাঁরা অমিতাভ বুদ্ধের উপাসক তাঁরা বলেন, শাক্যমুনি তো অতীতের বুদ্ধ আর মৈত্রেয় তো ভবিষ্যতের, বর্তমানকালের বুদ্ধ কে হবেন, কাকে আমরা ডাকব!

অমিতাভকে। তিনিই বর্তমানকালের বুদ্ধ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা হয়তো বলবেন, কই, চতুর্থ ও পঞ্চমের মাঝখানে তো আর কোনো নাম নেই ? থাকতেও তো পারে না ? যাক, ওসব তর্ক আমাদের জন্যে নয়। আমরা জেনে আশ্চর্য হচ্ছি যে অমিতাভ বুদ্ধের উপাসনা ও বৈরোচন বুদ্ধের উপাসনা একদা ভারতেও প্রচলিত ছিল।

এই কি সব ? না, আরো আছেন। ভৈষজ্যগুরুবৈদূর্যপ্রভাস। ইনিও একজন বুদ্ধ। অমিতাভ যেমন পশ্চিম স্বর্গের ইনি তেমনি পূর্ব জগতের। যে জগৎ বিশুদ্ধ মরকতের। অন্যান্য বুদ্ধের মতো এঁরও সেই একই প্রকার মূর্তি হয়। শুধু বামহস্তের করতলে থাকে একটি ভেষজপাত্র বা মণি। এঁর পরেও আছেন বুদ্ধ প্রভূতরত্ন। সাধারণত ইনি শাক্যমুনির পাশাপাশি বসেন। স্বতন্ত্র উপাসনার রীতি নেই। চতুর্থ বুদ্ধ ও পঞ্চম বুদ্ধের মাঝখানে এতগুলি বুদ্ধের অস্তিত্ব যে জাপানের উদ্ভাবন নয় তা তো সংস্কৃত নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সদ্ধর্মপুণ্ডরীকেও নাকি বুদ্ধ প্রভূতরত্নের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষেই এঁরা ছিলেন। ইতিহাসে না কল্পনায় তা পণ্ডিতরা বলবেন।

বৌদ্ধরা দেবদেবীর উপাসনা করেন না। কিন্তু দেবদেবীরা বুদ্ধের উপাসনা করেন। সেইজন্যে বৌদ্ধ মন্দিরে দেবদেবীও দেখা যায়। তাঁরা প্রধানত ভারতীয়। তবে তাঁদের ডাক নাম জাপানী। হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে সব আগে নাম করতে হয় শক্রের। ইন্দ্রের। ইনি বাস করেন সুমেরুশিখরে। তেত্রিশ প্রাসাদের মধ্যে একটি এঁর। সেটি কেন্দ্রস্থলে। সুমেরুশিখর থেকে অর্ধেক পথ নেমে আসতে পথে পড়ে চার রাজার রাজবাড়ী। চার দিক্‌পাল। পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূধক, পশ্চিমে বিরূপাক্ষ, উত্তরে বৈশ্রবণ। এঁদের মধ্যে বৈশ্রবণই শ্রেষ্ঠ। ইনি মাসের মধ্যে ছ'টি দিন লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে সুখ বিতরণ করেন। এঁর পত্নীর নাম শ্রীমহাদেবী। জাপানী ডাকনাম কিচিজো-তেন।

তেমনি সূর্য, চন্দ্র, স্কন্দ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এঁরাও এক একটি দেব। মহেশ্বরের পুত্র গণপতিও। যমরাজকেও পাওয়া যাচ্ছে। আর দেবীদের মধ্যে সরস্বতীকেও। ইনিও বীণাবাদিনী। অভাবে কোতোবাদিনী। এঁর জাপানী নাম বেনজাই-তেন বা বেন-তেন। সরস্বতী নামক একটি হারিয়ে-যাওয়া নদীর ইনি দেবীরূপ। সেই কারণে এঁকে স্থাপন করা হয় সরসী বা সরোবর তটে।

ইনি সাতজন সুখের দেবতার একজন। বাকী ছ'জনের মধ্যে আরো একজন ভারতীয়। আরেক বৈশ্রবণ। তিনজন চীনা। ছ'জন জাপানী।

সরস্বতী বেচারির স্বর্গে ঠাঁই হলো না, এ কি কম আফসোসের কথা! কিন্তু হবে কী করে! সুমেরু শিখরের চূড়ায় তো মাত্র তেত্রিশটি দেবতার জন্যে তেত্রিশটি প্রাসাদ। তাঁদের মধ্যমণি শক্র। তেত্রিশ কোটি নয়, লক্ষ নয়, হাজার নয়, শ' নয়। নিতান্তই তেত্রিশ। প্রাসাদগুলির আটটি পূবে, আটটি পশ্চিমে, আটটি উত্তরে, আটটি দক্ষিণে, একটি কেন্দ্রস্থলে। কেমন সুন্দর পরিকল্পনা! রাষ্ট্রপতিভবনকে ঘিরে যেমন মন্ত্রীভবন রাজ্যমন্ত্রীভবন উপ-মন্ত্রীভবন সচিবভবন। তার পর সুমেরুর ঠিক শিখরে নয় অর্ধশিখরে চার রাজার চার রাজবাড়ী। এঁরা যেন রাজ্যপাল। এঁদের অঞ্চলটাও স্বর্গের এলাকায় পড়ে। মর্ত্যের এলাকায় নয়। তা হলে এক সুমেরু পর্বতেই গোটা দুই স্বর্গ।

সুমেরুর চেয়ে আরো উঁচুতে আরো চারটি স্বর্গ। তাদের মধ্যে যেটি উচ্চতম সেটির একমাত্র অধিকারী কে, জানেন? বাজি রেখে বলতে পারি জানেন না। বোধিদ্রুমের তলায় সিদ্ধার্থকে যিনি পরীক্ষা করেছিলেন সেই যে মার তাঁকেই দেওয়া হয়েছে এই স্বর্গ। মার পাপীয়স্। লীডার অফ দি অপোজিশন। উচ্চতম স্বর্গের অধিকারী হলে কী হবে, শেখ আবদুল্লার চেয়েও একা। নিজের সঙ্গে নিজেই রাজনীতির দাবা খেলুন বসে। চক্রান্তের জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি তাঁকে দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় উচ্চতম স্বর্গ। তাঁর নাম মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব। তাঁর স্বর্গের নাম তুষিত। তুষিত আর সুমেরুর মাঝখানে আরো দুটো স্বর্গ আছে। সবশুদ্ধ ছ'টি স্বর্গ আর একটি মর্ত্য এই সাতটি মিলে একটি ভুবন। তার নাম কামনার ভুবন। কাম ধাতু।

কামনার ভুবনের ঊর্ধ্বে রূপের ভুবন, রূপ ধাতু। রূপের ভুবনের ঊর্ধ্বে অরূপের ভুবন, অরূপ ধাতু। এক এক করে তিনটি ভুবন। কামনার ভুবনে যেমন ছ'টি স্বর্গ রূপের ভুবনে তেমনি আঠারোটি আর অরূপের ভুবনে চারটি। অরূপের চারটিতে কেউ বাস করেন না। রূপের আঠারোটিকে আবার চারটি ধ্যানলোকে বিভক্ত করা হয়েছে। উপরের দিকের এক ভাগে ন'টি স্বর্গ। নিচের দিকের তিন ভাগে ন'টি স্বর্গ। এক এক ভাগে তিন তিনটি করে। নিচের

দিক থেকে প্রথম ধ্যানলোকের প্রথম স্বর্গে ব্রহ্মা। চতুর্থ ধ্যানলোকের নবম স্বর্গে মহেশ্বর। অর্থাৎ ব্রহ্মা সকলের নিম্নে, মহেশ্বর সকলের ঊর্ধ্বে। তা হলে দাঁড়ায় এই যে মহেশ্বর হলেন মহত্তম ধ্যানী। তা হলেও রূপের ভুবনেই তাঁর স্থিতি। অরূপের ভুবনে নয়। আরো উপরে উঠতে হলে তাঁকেও আরো চার চারটে সিঁড়ি ভাঙতে হবে। নিরাকার সিঁড়ি। তারও উপরে ত্রিভুবনের উপরে স্বর্গমর্ত্যের উপরে কে? বুদ্ধ।

বোধিসত্ত্বরা বুদ্ধ নন। বুদ্ধ হওয়ার পথে। জাপানে মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের প্রভূত সম্মান। কিন্তু প্রভাব সব চেয়ে বেশী অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের। কান্নন নামে নারীরূপেই এঁর আরাধনা। সাধারণের কাছে বুদ্ধ অনেক দূর আর কান্নন অনেক আপন। কান্ননের প্রতিমা কিন্তু বুদ্ধের মতো একই পদ্ধতির নয়। সহস্রভুজ সহস্রনেত্র অবলোকিতেশ্বর বা সেন্‌জু কান্নন যিনি তাঁর হাজারটি হাত বড় একটা দেখা যায় না, সচরাচর বিয়াল্লিশটি দিয়ে হাজারের কাজ সারতে হয়। হয়গ্রীব অবলোকিতেশ্বর বা বেজু কান্নন যিনি তাঁর মাথাটি ঘোড়ার মাথা কিংবা তাঁর মাথার উপরে ঘোড়ার মাথা। একাদশমুখ অবলোকিতেশ্বর বা জ্‌চিমেন কান্ননের একাদশ আনন। তিনটি সামনে, তিনটি ডাইনে, তিনটি বাঁয়ে, একটি পিছনে, একটি মাথার উপরে। চিন্তামণি অবলোকিতেশ্বর বা নিয়োইরিন কান্নন ষড়্‌ভুজ। ডাইনে তিনটি, বাঁয়ে তিনটি। এঁর একটি মণি আছে। অমোঘপাশ অবলোকিতেশ্বর বা ফুকু কেন্‌জাকু কান্নন বোধিসাগর তীরে নৈশ্চিত্যের ছিপ দিয়ে দেবমানবের জন্যে মাছ ধরেন। এমনি আরো কয়েকটি রূপ আছে অবলোকিতেশ্বরের। নারীরূপ। লোকচক্ষে দেবীরূপ।

মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের নাম করেছি। আর একজনের নাম করতে হয়। ইনি ক্ষিতিগর্ভ। জাপানী নাম জিজো। আর সব বোধিসত্ত্বের কেশবেশ মুকুট অলঙ্কার রাজারাজড়ার মতো, আর এ বেচারার সাধুসন্ন্যাসীর মতো। মুণ্ডিত মস্তক। চীবর জড়িত অঙ্গ। জিজোরও নানা রূপ, রূপ অনুসারে নাম। এম্মেই জিজো দেন দীর্ঘ জীবন। আর কোয়াসু জিজো ছোট ছেলেদের নরক থেকে বাঁচান। হাঁ, নরকও আছে। স্বর্গ থাকবে, নরক থাকবে না? ছোট ছেলেরা পুণ্য কর্ম করে সদ্গতি লাভের আগেই যদি দুষ্টুমি করে মারা যায় তবে তো তাদের যেতে হয় ছোটদের নরকে। যার

নাম সাই নো কাবারা। কী উপায়? উপায় কোয়াস্থ জিজোর আরাধনা। মা-ষষ্ঠীর মতো কোয়াস্থ জিজো ঘরে ঘরে বা গ্রামে গ্রামে।

নরকের প্রসঙ্গ উঠল। স্বর্গে যেমন দেবগণ মর্ত্যে যেমন মানবগণ পাতালে তেমনি যক্ষ রক্ষ প্রেত পিশাচ নাগ পুতনা কুষ্মাণ্ড। তা ছাড়া স্বর্গে মর্ত্যেও দেবমানব ভিন্ন আরো কয়েক শ্রেণী আছে। তাদের মধ্যে গন্ধর্ব। সমুদ্রেও তেমনি দানো আছে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম জাপানে যাবার সময় ভারত থেকে এসব নিয়ে গেছে। পথে চীন থেকে কিছু কুড়িয়ে পেয়েছে। জাপানে পৌঁছে কিছু জুড়েছে। দেবতার চেয়ে অপদেবতার সংখ্যা আর গুরুত্ব কম নয় বললে কম করে বলা হয়। হারিতী নামে যে যক্ষিণী নিজের হাজারটি শিশুকে খাওয়ানোর জন্যে মানুষের শিশুদের হত্যা করে বেড়াত বুদ্ধের কাছে অনুতপ্ত হয়ে সেই হলো জাপানে গিয়ে কিশিমোজিন। তার মানে "শয়তান মা দেবী।" শিশুদের সে বিপদ থেকে রক্ষা করে।

অষ্টম শতাব্দীর মহাযানবৌদ্ধ মন্দির পরিক্রমা করে অনেক রকম মূর্তি দেখা গেল। তাদের কতক আদি কালের, কতক পরবর্তী সংযোজন। দেবরাজ বলতে ওরা বোঝে দিক্‌পাল রাজা। মন্দিররক্ষী। এক জোড়া সিংহ দেখলুম। পাথরের সিংহ। সিংহকে নাকি আগেকার যুগে কুকুর বলে ভুল করা হয়েছিল।

মন্দির মেরামতির জন্যে এক জায়গায় দেখলুম টালি জড় করা হয়েছে। ইচ্ছা করলে তার একটিতে নিজের নাম লেখা যায় তুলি দিয়ে। দান করতে হয় এক শ' ইয়েন। এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা। ভক্তরা নাম লিখে গেছেন নানান অক্ষরে। আমি লিখলুম বাংলায়। তার পর ইংরেজীতে। খুব সস্তায় নাম রেখে এলুম বলতে হবে। কেবল আমি নয়, আমরা।

তার পর তোদাইজি থেকে গেলুম কাসুগা পীঠস্থানে। শিন্তোরা মন্দির বলে না। প্রথমেই দেখি এক পাল হরিণ। এদের না খাইয়ে পীঠস্থানে প্রবেশ করলে পুণ্য হবে না। দিলুম কিনে বিস্কুট। নিজের হাতে খাওয়ালুম। চোখ দেখে এমন মায়া হয়। কিন্তু খিদে কি এদের কিছুতেই মিটবে? গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। আদর করি। কিন্তু খোরাক যেই ফুরোল অমনি চলল আর কারো কাছে। এক ভদ্রমহিলা তো হরিণ নিয়ে ফোটো তোলালেন শকুন্তলার মতো। ভুল করে সামনে গিয়ে পড়লুম তো শুনিয়ে

দিলেন দশ কথা বিশুদ্ধ ফরাসীতে। তাঁর হরিণটা সেই যে সরে গেল তার পর অরণ্যে রোদন।

ওদিকে কাসুগা পীঠস্থানের শিন্তোরাও দাবী করছে যে হরিণ হলো ওদেরই দেবতার বাহন। ওদের জনশ্রুতি হচ্ছে চার ধাম থেকে চার দেবতা এসেছিলেন কাসুগা পীঠে। এঁরা সব শিন্তো দেবতা। বৌদ্ধ দেবতার মতো স্বর্গবাসী নন। একজন থাকতেন কাশিমায়। একজন কাতোরিতে। দু'জন হিরাওকায়। বলা যেতে পারে গ্রামদেবতা। এঁরা এখন কাসুগায় বিরাজ করছেন। এঁদের মধ্যে সেই যিনি কাশিমা থেকে এসেছিলেন তাঁকে বহন করে এনেছিল একটি হরিণ। সেই থেকে কাসুগা হলো হরিণেরও আস্তানা।

শিন্তো পীঠের তোরণ দেখলেই চেনা যায়। ল্যাকারের কাজ। সিঁদুরে রং। ইংরেজী 'এইচ' লিখতে গিয়ে পেট না কেটে গলা কাটলে ও মাথায় বাংলা হরফের মতো লাইন টানলে যেমন দেখায় তেমনি দেখতে। আরো খুঁটিনাটি আছে। তোরণ পার হয়ে সুরম্য উপবন-পথে পদব্রজে চললুম আমরা। তার পর দখিন দুয়ার। নান-মন। দারুময় সিন্দুরবর্ণ জমকালো হর্ম্য। অভ্যন্তরে যাবার করিডোরের দু'ধারে ব্রঞ্জনির্মিত বহুতর লণ্ঠন। তা ছাড়া শিলালণ্ঠন তো সংখ্যায় আঠারো শ'। ভক্তদের দান। বছরে দু'বার জ্বালানো হয়। কতকটা তাঁবুর মতো দেখতে চারখানি অপূর্ব ঘর নিয়ে মূল পীঠ। ভিতরে যাইনি। সেদিকে যাবার আগে যেতে হলো যেখানে নাটশালা। শিন্তোরা দেবস্থানেও নাচে। সেটাও তাদের ধর্মের অঙ্গ। সেইখানে আমাদের বসতে দেওয়া হলো কাষ্ঠাসনে। পাখা হাতে নাচছিল লোহিতবর্ণ তলবসনের উপর শুভ্র বাস পরিহিত ভেস্টাল ভার্জিন। উৎসর্গ-করা কুমারী। তাদের সে নাচ তালে তালে। ফিরে ফিরে। মার্চ করে এগিয়ে যাওয়া পেছিয়ে আসার মতো কতকটা। পাখা ছেড়ে তারা ঝুমঝুমির মতো একরকম বাজনা হাতে নিল। তাতে একরাশ ঘন্টি লাগানো। নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে চকিতের মতো বাজায়। বাজনা থামে। নাচ চলে। একে বলে কাগুরা নৃত্য। অবর্ণনীয় ভাবগর্ভ দেবনৃত্য। বিনোদনের জন্যে নয়।

একই মানুষ একই সঙ্গে শিন্তো হতে পারে, বৌদ্ধ হতে পারে। একই

পরিবারে শিন্তো আর বৌদ্ধ দুই আছে। তত্ত্বের দিক থেকে বিরোধ থাকতে পারে, কার্যত তেমন কোনো বিরোধ নেই। বেশ মিলেমিশে আছে শিন্তো আর বৌদ্ধ। বৌদ্ধ মন্দিরের যেমন লেখাজোখা নেই শিন্তো পীঠেরও তেমনি লেখাজোখা নেই। গাছতলাতেও শিন্তো পীঠ। প্রকৃতির সর্বত্র ছড়ানো। এঁদের সর্বপ্রধান দেবতা সূর্য। তিনি কিন্তু দেব নন, দেবী। তাঁরই বংশধর জাপানের সম্রাট। কাসুগা পাহাড় অতি প্রাচীন কাল থেকেই দেবতাদের নিবাস বলে বিদিত। এখানকার পীঠস্থানের প্রতিষ্ঠা ৭৬৮ সালে। লণ্ঠনগুলির কতক চতুর্দশ শতাব্দীর। এর মতো প্রসিদ্ধ ও পুরাতন পীঠ জাপানে বেশী নেই। প্রখ্যাত ফুজিওয়ারা বংশের স্মৃতিবিজড়িত। ফুজি বা উইসটারিয়া পুষ্পসমাকীর্ণ।

কাসুগা পীঠ থেকে আমরা ফিরে চললুম নারা হোটেলে। নারা পার্কের ভিতর দিয়ে। দারুণ বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে বাস থামিয়ে বাঁশি বাজিয়ে ডাক দেওয়া হলো বনস্থলীর হরিণদের। এরা কোন সুদূরে ছিল, দলে দলে দৌড়তে দৌড়তে এলো, বেড়া টপকাতে টপকাতে এলো। ছেলে বুড়ো মদ্দা মাদী। দেখতে দেখতে হরিণের জনতা। যতগুলি মানুষ নয় ততগুলি হরিণ। এই জনতাকে খাওয়াব কী! ধারে কাছে দোকান কোথায় যে কিনে খাওয়াব! সঙ্গেও তো কিছু আনিনি। বৃষ্টিতে নামতে স্পৃহা ছিল না। বসে রইলুম বাসে। লক্ষ করলুম নেমে গেলেন আঁদ্রে শাঁসঁ। মাদাম শাঁসঁ। ধন্য তাঁদের জীবে দয়া! কে একজন দয়ালু ফিরিওয়ালাও কেমন করে জুটে গেল। ইচ্ছা থাকলে উপায়ও থাকে। হরিণভোজনের জন্যে বিস্কুট মিলে গেল। হরিণকে ভোজন করার জন্যে নয়। ভোজন করানোর জন্যে। যেমন ব্রাহ্মণভোজন। এরা পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল কি না জানিনে, কিন্তু এদের পূর্বপুরুষ যে ভারতীয় ছিল এটা ধ্রুব। তাই বসে বসে আফসোস হচ্ছিল, পুণ্য করলেন আঁদ্রে শাঁসঁ। আর সুযোগ হাতছাড়া করলুম আমি।

নারা হোটেলে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন। এবার হরিণের নয়, মানুষের। পুণ্য করলেন নারার গভর্নর ও মেয়র। লেখকভোজন তো দিনের পর দিন দেখলুম, কিন্তু এর মতো কোনোটা নয়। তেনরিয়ুজিরটা সাত্ত্বিক। এটা রাজসিক। এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায় ছাখ। পেন কংগ্রেসের লেখকদের

মধুরেণ সমাপয়েৎ করালেন নারার দুই প্রধান। ভোজসভায় ভাষণের প্লাবন হলো। না, আর কিছুর প্লাবন নয়।

নারা হোটেলেই খান কয়েক বই কিনেছিলুম আমি। তার একখানা কাওয়াবাতার "তুষারভূমি"র ইংরেজী অনুবাদ। বাসে উঠে তাঁকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিলুম। আর দু'খানা উপহার দিলুম। কাকে কাকে বলব না। বিদায় আসন্ন। কিছু ভালো লাগছিল না। কিন্তু তখনো আমাদের দেখার বাকী এ যাত্রার বৃহত্তম বিস্ময়। হোরিয়ুজি। বাস চলল সপ্তম শতাব্দীতে। অতীত থেকে আরো অতীতে। আরো এক পা ভারতের দিকে।

তোচিগি কিবুনা

॥ বারো ॥

অনেক বছর আগে এক ফরাসী পরিব্রাজক হোরিয়ুজি মন্দির দেখে অভিভূত হয়ে স্বগতোক্তি করেন, "আমি কি তবে ভারতবর্ষে!"

তাঁর সেই স্বগতোক্তি আমারও। আমি কি তবে ভারতবর্ষে! ভারতবর্ষের সপ্তম শতাব্দীতে! এমনি সব মহাযানবৌদ্ধ মন্দির ছিল পালযুগের মগধে ও গৌড়ে। হর্ষবর্ধনের আর্যাবর্তে। অজন্তার অদূরে দক্ষিণাপথে। আজ তার ধ্বংসাবশেষ নেই। তবে তার মোটামুটি একটা ছাঁচ আছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে গেলে যেমন দেখতে পাই প্রথমেই এক বিরাট সিংহদ্বার, চার দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টনী, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিপুলায়তন পুরী, একটি মহামন্দিরকে ঘিরে বহুসংখ্যক মন্দির বা মণ্ডপ বা সৌধ, হোরিয়ুজিও কতকটা সেই ধরনের ব্যাপার। তার চেয়েও প্রাচীন। তার চেয়েও সুন্দর। বনজঙ্গলের মাঝখানে অবস্থিত মায়াপুরী।

পুরীর মন্দির তো যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে, পরিবর্ধিত হয়েছে, কিন্তু হোরিয়ুজি সেই সপ্তম শতাব্দীতে যেমনটি ছিল তেমনিটি আছে, তার জীর্ণ সংস্কার হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। রূপকথার ঘুমন্ত পুরীর মতো যে যেখানে ছিল সে সেইখানে আছে। কালান্তরের ছাপ পড়েনি। মন্দিরের বিরাট চত্বর। চকবন্দী। চার দিকে বেড়ার মতো করিডোর। দোচালা। ঘেরা জায়গায় প্রায় চল্লিশটি বাড়ীঘর। সারা পৃথিবীতে নাকি এত পুরোনো কাঠের বাড়ী নেই। বাড়ীগুলি এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠেনি, পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছবির মতো সাজিয়ে গড়া। সম্রাজ্ঞী ছিলেন সুইকো। তাঁর হয়ে রাজ্য চালাতেন রাজকুমার শোতোকু। জাপানের ইতিহাসে স্মরণীয় পুরুষ। তাঁরই আদেশে নির্মিত হয় হোরিয়ুজি। যার জন্যে হয়েছিল সেই সানরন সম্প্রদায় এখন অবলুপ্ত। হস্সো বলে অপর এক সম্প্রদায় এখন বাঘের ঘরে ঘোগ হয়ে বসেছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ভারতে তখনো গুপ্তযুগ শেষ হয়নি। কোরিয়া থেকে জাপানে প্রবেশ করল বৌদ্ধধর্ম বা সদ্ধর্ম। প্রথম সত্তর বছর শিন্তো ধর্মের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলির অবকাশ মেলেনি। যেই একটু দাঁড়াবার ঠাঁই মিলল অমনি আরম্ভ হলো সম্প্রদায়ভেদ।

একে একে চীন থেকে আমদানি হলো সানরন, জোজিৎসু, হস্‌সো, কুশা, কেগন ও রিৎসু। জাপানের ইতিহাসে তখন আসুকা যুগ গিয়ে নারা যুগ আসছে। তাই এই ছয় সম্প্রদায়কে নারা সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করা হয়। তা বলে এদের একের সঙ্গে অপরের মিল খুব বেশী নয়। এক একটির ঝোঁক এক একটি তত্ত্বের বা নীতির উপরে। কোনো কোনোটা থেরবাদী বা হীনযান মার্গের। বেশীর ভাগই মহাযান মার্গের। এখন আর থেরবাদী বলতে কেউ নেই। সানরনের মতো জোজিৎসু আর কুশা অদৃশ্য। হস্‌সো, কেগন ও রিৎসু এখনো অস্তিত্ব রক্ষা করছে, তবে তাদের চেয়ে প্রতাপ এখন পরবর্তী যুগের তেন্দাই, শিন্‌গন, জেন, জোদো আর নিচিরেন সম্প্রদায়ের। এদের প্রত্যেকেরই আবার একরাশ উপসম্প্রদায়। যার যার নিজের নিজের মন্দির, মঠ, পাঠশালা, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়। এমন কি প্রচারকর্মের জন্যে সিনেমাবাহিনী। একেকটি মন্দিরের অধীনে একেক প্রস্থ উপমন্দির, তার অধীনেও তেমনি উপোপমন্দির।

জাপানে বৌদ্ধ মন্দির বলতে বোঝায় বেশ খানিকটা ঘেরা জায়গা। মাঝখানে বুদ্ধগৃহ। সেখানে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ও দেবগণের মূর্তি। তার সঙ্গে সম্প্রদায় প্রবর্তকের বা সন্তগণের মূর্তি। যার যার নিজের সন্ত। ল্যাকারের পাত্রে সদ্ধর্মের সূত্র। ধূপধুনো। ঘন্টি। তা ছাড়া সময় নির্দেশ করার জন্যে প্রকাণ্ড এক ঘণ্টা। আলাদা ঘণ্টাঘর। ছাদ থেকে ঝুলন্ত সেই ঘণ্টার ওজন এত বেশী যে হাত দিয়ে তাকে নড়ানো যায় না। তা হলে সে বাজবে কী করে? আচ্ছা, ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ঘণ্টার দিকে মুখ একটা কড়িকাঠের এক প্রান্ত ধরে জোরসে টেনে রাখুন। তার পর তাকে ছেড়ে দিন। ছাড়া পেয়ে সে লড়ুয়ে ষাঁড়ের মতো এগিয়ে গিয়ে ঘণ্টার গায়ে ঢুঁ মারবে এমন এক জায়গায় যেখানকার ধ্বনি সব চেয়ে গম্ভীর, সব চেয়ে বেশীক্ষণ অনুরণিত। এসব ঘণ্টার নির্মাণকৌশল নির্মাতারাই জানতেন। এক একটা ঘণ্টার বয়সের গাছপাথর নেই। ঘণ্টাঘর ছাড়া আরো অনেক রকম ঘরবাড়ী থাকে প্রত্যেক মন্দিরে। একটি তো প্যাগোডা। শুনেছি প্যাগোডা হচ্ছে স্তূপেরই বিবর্তন। স্তূপও থাকে। ভারতের মতো। কিন্তু আকারে ছোট। আর যা যা থাকে তার সংখ্যা মন্দিরভেদে কমবেশী। মন্দিরের অবস্থাভেদে। হোরিয়ুজি মন্দিরে যখন চল্লিশটি বাড়ীঘর ও পূর্ব

পশ্চিম দুই স্বতন্ত্র অঞ্চল তখন তার অবস্থা খুব ভালো বলতে হবে। হসসো সম্প্রদায়ের হর্ষবর্ধন করবার মতো।

যেমন তোদাইজিতে তেমনি হোরিয়ুজিতে আমাদের অভ্যর্থনা করতে অপেক্ষা করছিলেন সাধুরা। হোরিয়ুজিতে শুধু অভ্যর্থনা নয়, সেইসঙ্গে আপ্যায়ন। জাপানী সবুজ চা। জাপানী পিঠে। খেয়ে আমাদের হর্ষ। খাইয়ে মোহন্ত মহারাজের হর্ষ। এর পর আমরা সহর্ষে ঘুরে দেখতে লাগলুম। কেউ ছত্র মাথায়। কেউ নাঙ্গা শিরে। বৃষ্টিও আমাদের খাতিরে বিরাম নিয়েছিল। সিংদরজা নিজেই একটা দ্রষ্টব্য। জাপানে দ্বারকে বলে "মন"। একেক দ্বারের একেক নাম। হোরিয়ুজির দক্ষিণ দ্বারের নাম নান্দাইমন। যেমন আকুতাগাওয়ার সেই বিখ্যাত কাহিনীর কুরোসাওয়া-কৃত ফিল্মের নাম "রাশোমন"। সিংদরজা থেকে বুদ্ধগৃহ "কন্দো" অভিমুখে চলেছি তো চলেছি। পথ আর ফুরোয় না। এত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। চলতে চলতে কাছাকাছি আঁদ্রে শাঁসঁ আর আমি।

তিনি বললেন, "খ্রীস্টান সহস্র তপস্যা করলেও খ্রীস্ট হতে পারে না, কিন্তু বৌদ্ধ একদিন না একদিন বুদ্ধ হতে পারে। ভগবানের পুত্রের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কোনো দিন ঘুচবে না, যদিও মানুষমাত্রেই ভগবানের পুত্র। কিন্তু বুদ্ধের সঙ্গে মানুষের তেমন কোনো তফাৎ নেই।" স্মৃতি থেকে লিখছি। উক্তি না হোক যুক্তি।

হিউমানিস্টদের পক্ষে বুদ্ধকে গ্রহণ করা যত সহজ খ্রীস্টকে গ্রহণ করা তত সহজ নয়, কারণ মানবজাতির অনন্ত বিকাশের অসীম সম্ভাবনা মেনে নিলে প্রতি মানব বুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু কোনো মানব খ্রীস্ট হতে পারে না। তা হলে বলতে হয় অনন্ত বিকাশ অনন্ত নয়, অসীম সম্ভাবনা অসীম নয়। হিউমানিস্টদের চক্ষে এটা স্বতোবিরুদ্ধ। তাই ইউরোপের মনীষীরা খ্রীস্টকে নিয়ে দোটানায় পড়েছেন। গ্রহণ করতেও বাধে, আবার বর্জন করতেও মন সরে না। দু'হাজার বছরের আত্মীয়তা। এই দোটানার ফাঁকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পশ্চিমের মনীষী মহলে ক্রমে বাড়ছে। বলা বাহুল্য সে ধর্ম ভারতের আদিবৌদ্ধ ধর্ম। যে ধর্ম সম্প্রদায়ভেদের পূর্বে ও ঊর্ধ্বে। হীনযান বা থেরবাদ নয়। মহাযান নয়। জাপানের মাটিতে পুনরায় রোপণের পরবর্তী শাখাপ্রশাখা নয়।

কন্দো নামক বুদ্ধগৃহে তখন দিব্যি ভিড়। বাইরে থেকে একদল ছাত্র-ছাত্রী এসেছে। ভিড়ের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ঠেলাঠেলি করতে কেমন ভালো লাগে। কিন্তু ঠেলাঠেলি খেতে তেমন ভালো লাগে না। কিছুদূর চালিত হয়ে আবার পিছু হটলুম। অবশেষে ঢোকা গেল ভিতরে। মাঝখানে শাক্যমুনি বুদ্ধ। দু'পাশে দুই বোধিসত্ত্ব। ভৈষজ্যরাজ ও ভৈষজ্যসমুদ্গত। ব্রঞ্জ দিয়ে গড়া শাক্যত্রয়ী। রাজকুমার শোতোকু যখন রোগশয্যায় তখন নাকি তাঁর আরোগ্যের আশায় এই দুই ভীষক্ বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মিত হয়। আর কোথাও নাকি এঁরা বুদ্ধের পার্শ্বচর নন। অন্যত্র তাঁর পার্শ্বরক্ষা করেন মঞ্জুশ্রী ও সমন্তভদ্র। মঞ্জুশ্রী আবার একা থাকবেন না। সঙ্গে থাকবে তাঁর বাহন। প্রজ্ঞার বাহন কিনা সিংহ। মঞ্জুশ্রী একালে আমাদের মেয়েদের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার দিনে ছিল পুরুষদের। তবে বোধিসত্ত্বরা যখন পুরুষও নন নারীও নন তখন একজনকে পুরুষ বলে দাবী করলে আরেকজনকে নারী বলে দাবী করাই ন্যায়সঙ্গত। তবে জাপানীরা একমাত্র অবলোকিতেশ্বরকেই নারী ভাবে।

ট্র্যাজেডী আর বলে কাকে! যে চিত্রসম্পদ তেরো শ' বছর ধরে ঝড় ভূমিকম্প আগুন এড়িয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরমাণু বোমাকেও এড়াতে পেরেছিল তারই অনেকাংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেল ১৯৪৯ সালে কেমন করে আগুন লেগে। একটি দিনে ধ্বংস হয়ে গেল তেরো শ' বছরের সঞ্চয়। সুখের বিষয়, সব ভস্ম হয়নি। তবে যা বেঁচেছে তাকে কোথায় যেন সরিয়ে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে আছে আমাদের অজন্তার অনুরূপ মুরাল চিত্র। সে সময় আমার খেয়াল হয়নি, হলে আমি আবদার ধরতুম আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে লিখেছে আমি পশ্চাদ্‌বুদ্ধি। পরে যখন মনে পড়ল তখন আমি নিরুপায়। প্রতিলিপি দেখে বোঝা যায় আঁকিয়েরা ছিলেন ভারতীয় কিংবা ভারতীয় ভাবাপন্ন। চিত্রার্পিতের মুখ চোখ চেহারা অবিকল ভারতীয়। জাপানের আর কোনোখানে এর দোসর নেই। এও যে আছে, সে আমাদের অশেষ ভাগ্য। আছে বলেই বুঝতে পারছি অজন্তার যুগ একটা অখণ্ড যুগ। দেশ যাকে খণ্ডিত করেনি। আধুনিক যুগের প্রবাহ যেমন ইউরোপে আরম্ভ হলেও ইউরোপেই আবদ্ধ নয় তেমনি অজন্তার যুগ ছিল ভারত

থেকে শুরু করে এশিয়ার উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে প্রসারিত, কিন্তু পশ্চিমে সীমান্বিত। আমরা যারা শুধু ভারতের ইতিহাস পড়তে অভ্যস্ত তারা একটি সূত্রের একটি প্রান্তই দেখি। আর বলি বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে বাইরে চলে গেল। ভাবনাকে দেশকেন্দ্রিক না করে যুগকেন্দ্রিক করলে অন্য সিদ্ধান্ত সম্ভব। যুগটা কয়েক শতাব্দী ধরে এশিয়াময় ব্যাপ্ত ছিল। তারপর পশ্চিম এশিয়া হারালো, কিন্তু পূর্ব এশিয়া পেলো। পরে ভারতকেই হারালো, কিন্তু থেরবাদ বা হীনযান রূপে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এবং মহাযান রূপে উত্তরপূর্ব এশিয়ায় স্থিতিবান হলো। অন্তত কয়েক শতাব্দীর জন্যে ভারত তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া কোরিয়া জাপান একসূত্রে গ্রথিত ছিল। সে সূত্র মহাযান বৌদ্ধধর্মের "সূত্র"। যথা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র। অবতংসক সূত্র। গন্ধবিহ্বল সূত্র। সুবর্ণপ্রভাস সূত্র। সুখাবতীব্যূহ সূত্র। এমনি কতরকম সূত্র, ভারতে যার আর নামগন্ধ নেই।

অজন্তা যখন দেখি তখন আমাদের মনে থাকে না যে এর পিছনে ছিল একটা জীবনদর্শন। সে দর্শন ঠিক থেরবাদী জীবনদর্শন নয়। কারণ অজন্তা ও মহাযান সমসাময়িক। মহাযানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধারণত দেবদেবী দেখে। শাস্ত্র পড়ে নয়। শিল্পের সঙ্গে শাস্ত্রের সম্পর্ক স্পষ্ট না হলেও অনস্বীকার্য। সেইজন্যে শাস্ত্রেরও খোঁজখবর নিতে হয়। এখন এই যে হোরিয়ুজি মন্দির এ হলো সানরন সম্প্রদায়ের কল্পনা। একে চিনতে হলে সানরন সম্প্রদায়ের বক্তব্য জানতে হয়। হোরিয়ুজি মন্দির আকারে সে কী বাণী শোনাতে চেয়েছিল? "শৃণ্বন্তু বিশ্বে" বলে ডাক দিয়ে সে যা প্রকাশ করতে চেয়েছিল তার মর্ম নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন। "সানরন" কথাটির অর্থ হলো "তিন শাস্ত্র"। তিনখানির প্রথমখানির নাম মাধ্যমিক শাস্ত্র। দ্বিতীয়খানির নাম শতশাস্ত্র। দু'খানিই নাগার্জুনের রচনা। তৃতীয়খানির নাম দ্বাদশনিকায়শাস্ত্র। শাস্ত্রকারের নাম দেব। সম্ভবত নাগার্জুনের এক শিষ্য। সানরন সম্প্রদায়ের আদিগ্রন্থ বলতে বোঝায় এই তিনখানি সংস্কৃত পুঁথি। নাগার্জুনের শিক্ষাদানের অবলম্বন ছিল প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থমালা। তার সংক্ষিপ্তসার হলো প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র। আজও সুদূর প্রাচ্যের সহস্রাধিক বিহারে বা বৌদ্ধমঠে প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়-সূত্র প্রত্যহ আবৃত্তি করা হয়। একদা ভারতেরও সহস্রাধিক বিহারে

মহাযান বৌদ্ধদের এই সর্বস্বীকৃত শূত্র নিত্য আবৃত্তি করা হতো। এর সার কথা রূপমাত্রেই অসার। এ উপলব্ধি যার হয়েছে তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ ভিত্তির উপর আচার্য নাগার্জুন যে বিশেষ তত্ত্বটিকে স্থাপন করেছিলেন সেই মাধ্যমিক এখন আর কোনো এক সম্প্রদায়ের জীবনদর্শন নয়। সানরন আর নেই।

নাগার্জুনের মতো অত বড় দার্শনিক বৌদ্ধ জগতে আর হননি। ভারতেও খুব কম হয়েছেন। তাঁর মাধ্যমিক দর্শনে তিনি এক এক করে যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। নেই। নেই। নেই। কোনো কিছুই নেই। তার পর সেই নেইকেও তিনি অস্বীকার করলেন। অস্তিত্বের মতো অনস্তিত্বকেও অস্বীকার করে যেখানে গিয়ে তিনি শেষে দাঁড়ালেন তারই নাম মধ্যপন্থা। জন্ম নেই। জন্মের বিপরীত হলো মৃত্যু। মৃত্যুও নেই। স্থিতি নেই। স্থিতির বিপরীত হলো বিনাশ। বিনাশও নেই। এক নেই। একের বিপরীত হলো বহু। বহুও নেই। আগমন নেই। আগমনের বিপরীত হলো গমন। গমনও নেই। এই যে একেক জোড়া "নেই" এরই মাঝখানে আছে রিয়ালিটি। মাঝখানের এই রিয়ালিটিই মাধ্যমিক। নাগার্জুনকে আমরা ভুলে গেছি। তাঁর মতবাদ আমাদের অজানা। তাই শূন্য বলতে আমরা ভাবি অনস্তিত্ব। তা নয়। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্যার্থীরা সমবেত হয়ে সেকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে শিক্ষা পেয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ও এমনি যতসব তত্ত্ব বয়ে নিয়ে গেছে।

কালক্রমে সানরন সম্প্রদায়ের বিলুপ্তির পরে হোরিয়ুজি যাদের হাতে পড়ে সেই হস্সো সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক শাস্ত্রের সারসংগ্রহ হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি শাস্ত্র। হস্সো কথাটি এসেছে "যোগ" বা "যোগাচার্য" থেকে। "যোগাচার্যে"র অপর নাম "ধর্মলক্ষণ।" অসঙ্গ ও বসুবন্ধু এর প্রতিষ্ঠাতা। হস্সো সম্প্রদায়ের মতে কামধাতু বা কামনার জগৎ, রূপধাতু বা রূপের জগৎ, অরূপধাতু বা অরূপের জগৎ, এই তিনটি জগতেরই অস্তিত্ব কেবল চিন্তায়। চিন্তার বাইরে ত্রিজগতের অস্তিত্ব নেই। সাত রকম চিন্তা আছে। তাদের সকলের গোড়ায় অষ্টম এক চিন্তা। বিশুদ্ধ আর আদিম। একে বলে আলয়বিজ্ঞান। স্বচ্ছ পর্দার উপর ছায়াপাত করে এই অষ্টম চিন্তা। আর সেই যে ছায়ার

মায়া যার আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই তাই হলো রূপ, বর্ণ, ধ্বনি, আইডিয়া, হৃদয়াবেগ।

সানরন, হস্সো, কুশা (সর্বাস্তিবাদী), জোজিৎসু (সত্যসিদ্ধি), রিৎসু (বিনয়) ও কেগন (অবতংসক) সম্প্রদায় যে কালে জাপানে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব সংস্কৃত পুঁথির সাহায্যে ব্যাখ্যান করে সে কালে ভারতেও বৌদ্ধযুগ সহর্ষে বিদ্যমান। হর্ষবর্ধনের যুগ। তা হলে বৌদ্ধধর্ম কোন দুঃখে দেশান্তরী হবে! এ-দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ও-দেশে গেল এ ধারণা তথ্যের সঙ্গে মেলে না। এ-দেশ থেকে মিশন নিয়ে ও-দেশে গেল এই বরং সত্য। তার পরে আরো চার পাঁচ শতাব্দী কাটে। তীর্থঙ্কররা আসছে, যাচ্ছে স্মারক নিয়ে। মিশনারীরা যাচ্ছে পুঁথি নিয়ে। কেউ গান্ধার ও খাসগড়ের পথে। কেউ নেপাল ও তিব্বতের পথে। কেউ শ্যাম ও চীনের পথে। কেউ মালয় ঘুরে সমুদ্রপথে। সদ্ধর্ম যদি ভারতে তার পায়ের তলায় মাটি হারিয়ে থাকে তবে তার কারণ এ নয় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাকে বেদখল করেছে। অথবা আত্মসাৎ করেছে। জাপানে তার মহিমা দেখে এই কথাই মনে হয় যে এশিয়ার উপর দিয়ে একটা প্লাবন বয়ে গেছে এক প্রান্ত থেকে আর সব প্রান্তে। মূলপ্রান্তে নিঃশেষ হয়েছে।

রাজকুমার শোতোকুর নাম কেবল হোরিয়ুজি মন্দিরে নয়, জাপানের ইতিহাসে চিরস্থায়ী। তাঁর মৃত্যুর শত খানেক বছর পরে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে হোরিয়ুজি প্রাঙ্গণেই একটি অষ্টকোণ ভবন রচিত হয়। ত'কে বলে য়ুমেদোনো বা স্বপ্নপুরী। এমন সুন্দর বাড়ী নাকি সারা জাপান মুলুকে নেই। পরিক্রমা করলুম আমি একা। কখন এক সময় চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। আমার দল চলে গেছে আমাকে ফেলে। দৌড়। দৌড়। অবশেষে দেখা মিলল কয়েক জনের। করিডোর দিয়ে চলেছেন মন্দিরের অপর অঞ্চলে। যেখানে কান্নন বোধিসত্ত্বের প্রতিমা। উমাশঙ্কর বলেন করুণাদেবী। ওটা পাশ্চাত্য বর্ণনার সংস্কৃত অনুবাদ। আসলে ইনি আমাদের অবলোকিতেশ্বর। কিন্তু মুখ চোখ চেহারা ভারতীয় ধাঁচের নয়। মনে হলো আবার আমি জাপানে। কিন্তু অজন্তার যুগের জাপানে। না, জাপানে নয়। কোরিয়ায়। এই কান্নন মূর্তিকে বলে কুদারা কান্নন। কুদারা ছিল কোরিয়ার অন্তর্গত একটি রাজ্য। বৌদ্ধধর্ম জাপানে আসে কুদারা হয়ে। ৫৩৮ সালে।

এটি দারুমূর্তি। এমনি শ'তিনেক "জাতীয় সম্পদ" সুরক্ষিত হয়েছে

হোরিয়ুজি মন্দিরে। একবার চোখ বুলিয়ে যেতেও সময় লাগে। আমাদের ওই জিনিসটিরই অভাব। তুয়ারে প্রস্তুত যান, বেলা ত্রিপ্রহর। সময় থাকলে পার্শ্ববর্তী চুগুজি কন্‌ভেন্টে গিয়ে দেখে আসা যেত নিয়োইরিন কাম্নন মূর্তি। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জন্যে প্রখ্যাত। নিয়োইরিন কাম্নন হলেন চিন্তামণি অবলোকিতেশ্বর। কিন্তু পণ্ডিতরা বলছেন মূর্তিটি তাঁর নয়, মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের। এত কাল লোকে জানত, এখনো বলে, নিয়োইরিন কাম্ননের। যাক, নামটা যারই হোক প্রশংসাটা পৌঁছচ্ছে ঠিক জায়গায়। ভাস্করের পরলোকগত আত্মার সকাশে। যদি আত্মা থাকে।

এর পর আমরা নারা ফিরে চললুম। আবার সেই নারা হোটেল। সেখান থেকে বাস চলল কিয়োতো। এবার আমি মিনিট গুনতে লাগলুম। আর একটু পরে আসবে কিয়োতো স্টেশন। সেখানে নেমে যাবেন সোফিয়াদি, আয়েঙ্গার, জম্বুনাথন, গোকক। ইচ্ছা করছিল ওঁদের সঙ্গে আমিও নেমে যাই। ওঁদের তুলে দিই তোকিয়োর ট্রেনে। কিন্তু ওদিকে যে আমার হোটেলে গাড়ী পাঠাবেন মার্কিন অধ্যাপক তথা বৌদ্ধ সাধু আইডম্যান। তা ছাড়া আবার পড়ছিল বৃষ্টি। মুষলধারায়। বাস থেকে নামতে চায় কে? যার ট্রেন সে। অন্যমনস্ক ছিলুম। কখন এক সময় দেখি বন্ধুরা উঠে বিদায় নিচ্ছেন। হাতে হাত রাখলুম। বললুম, "কে জানত এমন অকস্মাৎ ছাড়া-ছাড়ি হবে!" বাস দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ছেড়ে দিল। ফরাসীরা সবাই নেমে গেছেন। অন্যদেশীরা অনেকেই। বাস প্রায় খালি। পাশে কমলাবোন। তিনি যাবেন পরের দিন সকালে। ওসাকা। চার দিন পরে তোকিয়ো হয়ে আকাশপথে ভারতে। দেশের জন্যে তাঁর মন কেমন করছে। আর আমার মন কেমন করছে আমার ম্যানেজারি ঘুচে গেল বলে। দশটা দিনের ম্যানেজারি।

আইডম্যান নিজে এসে নিয়ে গেলেন আমাকে তাঁর বাড়ী। বাড়ীটি নিশি-হোঙ্গানজি মন্দিরের শামিল। মন্দির বলতে জাপানে সাধুদের বাসস্থানও বোঝায়। আর সাধু বলতে বোঝায় গৃহস্থ। আইডম্যান বিবাহ করতে পারতেন। জোদো-শিন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শিনরান স্বয়ং বিবাহ করেছিলেন। এঁদের সম্প্রদায়ে মাছ মাংস বারণ নয়। এঁরা অমিতাভবুদ্ধের উপাসক।

জাপানী ধরনে সাজানো ঘর ঘরের মেজে তাতামি মাদুর দিয়ে মোড়া।

চেয়ার টেবিল নেই। আসবাবের মধ্যে একটা জলচৌকির মতো ছোট নিচু চতুষ্পদ। তার এক ধারে বসলেন আইডম্যান। একধারে আমি। সামনা-সামনি দু'জনে বসে গল্প করা চলল। প্রৌঢ়া পরিচারিকা এসে জাপানী মতে চা পরিবেশন করে গেল। তার পরে এলো জাপানী সাপার। চপষ্টিক দিয়ে খাওয়া। পাশে বসে খেলা করছিল আইডম্যানের জাপানী পোষ্যপুত্র। ছেলেটির বাপ মা হিরোশিমায় পরমাণুবোমার মার খেয়ে মারা যান। আইডম্যান তাকে মানুষ করেছেন জাপানী প্রথায়। তার জন্যে নিজে জাপানী বনেছেন কিন্তু তাকে মার্কিন বানাননি। বছর দশেক বয়স।

আলাপ আলোচনা যখন আর একটু অন্তরঙ্গ স্তরে পৌঁছল তখন আইডম্যান বললেন তাঁকে তাঁর ছেলের খাতিরেই জাপান ছাড়তে হবে। তাকে তিনি যেভাবে মানুষ করতে চান সেভাবে আর সম্ভব নয় এ রাজ্যে। অথচ তাকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে মার্কিন সভ্যতার ছাঁচে ঢালাই করতেও তাঁর অনিচ্ছা। তাই তিনি ভাবছেন তাকে নিয়ে ভারতে আসার কথা। হিন্দী ও বাংলা দুই ভাষার খবর তিনি রাখেন। পরে তাঁর বাড়ীতে একখানা বৌদ্ধ গ্রন্থ দেখেছিলুম। বাংলা ভাষায় লেখা, বাংলা হরফে ছাপা। ছেলেটির শিক্ষাদীক্ষা ভারতীয় ভাষায় হবে।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম তাঁকে, "আচ্ছা, গত মহাযুদ্ধের সময় জাপানীদের মধ্যে এমন কোনো বৌদ্ধ কি ছিলেন যিনি যুদ্ধবিরোধী, যিনি যুদ্ধপ্রতিরোধী ?"

এর উত্তরে তিনি যা বললেন তা আমার কানে সুধা বর্ষণ করল। সারা জাপানের মধ্যে একমাত্র তাঁরই সম্প্রদায়ের গ্রামবাসী চাষীরা মিলিটারিস্টদের হুকুমের অবাধ্য হয়। তাদের বলা হয় বাদশাহী ফার্মান বাড়ী নিয়ে গিয়ে রাখতে ও মানতে। রাজার জন্যে লড়তে হবে, দেশের জন্যে মরতে হবে ইত্যাদি অনুজ্ঞা ও উপদেশ। আর সবাই মাথা পেতে ঘরে নিয়ে গেল। নিল না কেবল জোদো-শিন সম্প্রদায়ের প্রজারা। প্রত্যেকে বলল, "মুই একটা বোকা হাঁদা মুরুক্ষু মনিষ্যি। মোর একটা সামান্যি কুঁড়েঘর। সেখানে থাকবেন বাদশাহী ফার্মান! ওরে বাপ রে বাপরে বাপ! পড়বে কেটা! যদি পুড়ে যান তবে মোর পরাণডা যাবে। ওই যে শিন্তো ভাইদের পীঠস্থান আছে। ওইখানে থাকুন। আমরা পেন্নাম করে আসব। হুজুর মা বাপ।

যুঁই রাখতে নারব।" মিলিটারিস্টরা হদ্দ হলেন তর্ক করে, কিন্তু বেটারা একদম অবুঝ। অথচ অসম্ভব নম্র।

বাইরের লোকের ধারণা জাপানীরা জাতকে জাত মিলিটারিস্ট। সামরিকতার প্রতিবাদ করতে তাদের দেশে একজনও নেই। এ ধারণা সত্য হলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শোচনীয় পরিণামকে তাদের স্বখাতসলিল বলে পরমাণুবোমার ব্যবহারকেও অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। আইডম্যানের কাছে যা শোনা গেল তা একটিমাত্র সম্প্রদায়ের নিচের তলার মনোভাব। এ মনোভাব কি সেই একখানেই নিবদ্ধ ? না। পরে আমার জ্ঞান আরো বাড়ল। দেখলুম জাপানে সামরিকতা যেমন ছিল তেমনি তার প্রতিবাদও যে না ছিল তা নয়। জাপানের বিবেক রণতন্ত্রের দ্বারা অভিভূত হয়নি। তবে এ কথাও ঠিক যে সত্তর বছরব্যাপী অপ্রতিহত সামরিক সাফল্য তার অবিবেকীদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

পরের দিন প্রাতরাশ খেতে গিয়ে দেখি হোটেল প্রায় ফাঁকা। কুরাতুলাইন হায়দর তখনো ছিলেন। আমাদের টেবিলেই বসলেন। তিনি ও কমলাবোন দু'জনেই সুন্দর ছবি আঁকেন। তাঁরা তাঁদের ছবি আঁকা প্লেট পেয়ে খুশি। আর আমি আমার মেয়ের নাম লেখা প্লেট না পেয়ে নিরাশ। তার পর আমরা যে যার ঘরে গিয়ে তৈরি হতে লাগলুম। অনেকেই যাচ্ছেন ওসাকা। সেখান থেকে কেউ কেউ যাবেন হিরোশিমা। আমিও যেতে পারতুম। গেলুম না। ওসাকা অন্য একদিন যাব। হিরোশিমা কেন যাব তার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। পরমাণুবোমা যখন পড়েছিল তখন হয়তো যাওয়া উচিত ছিল মানুষের প্রতি মানুষের আশু কর্তব্য করতে। এক যুগ কেটে গেছে। তেমন কোনো কর্তব্য নেই। অপর পক্ষে আরো তো কত দ্রষ্টব্য আছে। আর্টিস্টের দ্রষ্টব্য।

দেখতে দেখতে বিব্‌লি এসে পড়ল। আমার জিনিসপত্র গোছানোর দায় নিল। কেউ একজন সে দায় না নিলে আমি একেবারে অসহায়। কোট কী করে ভাঁজ করতে হয়, শার্ট কী করে পাট করতে হয়, সুটকেসে কী করে আঁটাতে হয়, এসব বিদ্যা তো আমি কবে ভুলে গেছি। খাটপালং আলমারি সব আমার কাছে সমান। আমি সমদর্শী। টাই কলার গেঞ্জি মোজা সর্বত্র ছড়ানো। আর জাপানীরা তো আমাকে উপহার দিতে মুক্তহস্ত।

সেসব না হয় টেবিলে স্তূপাকার করে রাখলুম, কিন্তু বয়ে নিয়ে যাব কী করে? ওদিকে অধ্যাপক কিয়োশুন তোদো মহাশয় এসে বসে আছেন। তাঁকে তো অন্তহীন কাল অপেক্ষা করতে বলা যায় না। তাই মালপত্তর অগোছালো বা আধগোছালোভাবে কতক স্যুটকেসে কতক ব্যাগে কতক ঝোলায় কতক পোঁটলায় কতক বগলে ও হাতে করে নিয়ে গিয়ে চাপিয়ে দেওয়া গেল ট্যাক্সিতে।

ট্যাক্সি গিয়ে দাঁড়াল তোদো মহাশয়ের বাড়ী। এ বাড়ীটিও একটি বৌদ্ধমন্দিরের শামিল। বিব্লি এখানে থেকে লেখাপড়া করে। তোদো-গৃহিণী আমাকে স্বাগত জানাতে না জানাতেই লটবহর তাঁর হেফাজতে দিয়ে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে উধাও। স্টেশনে গিয়ে কোনো মতে টিকিট কেটে দৌড়তে দৌড়তে লাফ দিয়ে উঠলুম ছাড়ন্ত ট্রেনে।

সাইতামা শিশিমাই

নারা। নারা। গুনগুনিয়ে উঠল রেলের লোকটি আমাদের কামরার মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে। কামরাটা লম্বা। মাঝখানে করিডোর। এসব লোকাল ট্রেনে আরাম করে বসার আয়োজন নেই। দূরের পাল্লা তো নয়।

নেমে আমরা ট্যাক্সি করলুম। তোদো বললেন, তোদাইজি। আগের দিন যেখানে মহাবুদ্ধ দেখে এসেছি। নারার প্রধানতম আকর্ষণ। এবার আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা গেল। ইনি গৌতমবুদ্ধ নন, বৈরোচনবুদ্ধ। যিনি সূর্যের মতো সর্বত্র জ্যোতি বিকীরণ করছেন। বৈরোচন অর্থ সাবিত্র, সৌর। পৌরাণিক বিরোচনপুত্র নয়। কেগন সম্প্রদায় বৈরোচনবুদ্ধের উপাসক। শিন্‌গন সম্প্রদায় মহাবৈরোচনবুদ্ধের উপাসক। মহাবৈরোচনের মূর্তি বৈরোচনের মতোই মোটামুটি, কিন্তু কেশবিন্যাস চিনিয়ে দেয় কে বৈরোচন, কে মহাবৈরোচন। মহাবৈরোচনের মাথায় বোধিসত্ত্বদের মতো মুকুট থাকে, কেশও গৃহস্থসুলভ। আর বৈরোচনের চুল জটা-জটা। তিনি সন্ন্যাসী।

কেগন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম। বয়স বেশী। প্রভাব আরো বেশী। বিশেষ করে যে তত্ত্বের উপর এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা তার সার নিহিত রয়েছে অবতংসক সূত্রে। কারো কারো মতে এটি একটি প্রেমের কবিতা। নিখিল বিশ্বের প্রতি বুদ্ধের প্রেম। অবতংসক সূত্রের জাপানী নাম কেগনকিয়ো। তার থেকে কেগন সম্প্রদায়। অর্থাৎ অবতংসক সম্প্রদায়। এঁদের বিশ্বাস বুদ্ধের চিন্তা আপনাকে প্রতিফলিত করছে পুনরাবৃত্ত করছে সীমাহীনভাবে নিরবধিকাল সর্বজগতে ও সর্বজীবে। এমন কি ধূলিকণার মধ্যেও। সমগ্রের প্রতিফলন প্রত্যেকটি পরমাণুতে আর প্রত্যেকটি পরমাণুর প্রতিফলন সমগ্রে। এক একটি ধূলিকণাও এক একটি জগৎ। এক একটি জগতে এক একটি বুদ্ধ। সে বুদ্ধ অতীতে ও বর্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রজ্ঞা বিকীরণ করেছেন, করছেন ও করতে থাকবেন। সে বুদ্ধের প্রত্যেকটি চিন্তাই সমগ্র সত্য। একই চিন্তাই একই কালে চিন্তা করছেন সব ক'জন বুদ্ধ। সে চিন্তা যে বস্তুর উপরেই পড়ে বুদ্ধ সেই

বস্তুতেই প্রতিবিম্বিত হন। বিশ্বময় বুদ্ধের আলোকবিম্ব। কোনোখানে এমন একটিও বস্তুকণা নেই যাতে বুদ্ধের কল্যাণকর্মের প্রকাশ নেই। বলা বাহুল্য এ বুদ্ধ ইতিহাসের পুরুষ নন, শাক্যমুনি বুদ্ধ নন, ইনি বৈরোচন, ইনি কেবলমাত্র জ্যোতি, ইনি শুদ্ধসত্ত্ব।

ধারণাটি এত বিশাল যে একে ব্যক্ত করতে হলে এমনি বিশাল বিগ্রহের পরিকল্পনা করতে হয়। কে জানে হয়তো ভারতেও একদা এর অনুরূপ মহাবুদ্ধ বিগ্রহ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে বা পুঁথি ঘেঁটে তার প্রমাণ মেলেনি। অথচ বহু সহস্র ক্রোশ দূরে জাপানে রয়েছে ভারতীয় ধারণার পরিপূর্ণ রূপায়ণ। অষ্টম শতাব্দীর কীর্তি। জাপানীরা তখনো কত দূর সভ্য ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য।

সহস্রদল পদ্মের চার দিক পরিক্রমা করলুম। এক একটি দল দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় বিপুল। কে একজন নাকি অঙ্ক কষে হিসাব করে বলেছেন যে এই বুদ্ধবিগ্রহ যদি জীবন্ত হয়ে নারা থেকে তোকিয়ো পদযাত্রা করতেন তা হলে সেখানে পৌছতে তাঁর সময় লাগত সাত ঘণ্টা। অর্থাৎ তিনি এক্সপ্রেস ট্রেনকেও হার মানাতেন।

এই মূর্তি ঐতিহাসিক বুদ্ধের না হলেও ঐতিহাসিক বুদ্ধই এর মডেল। এ যেন বলতে চায় মানুষ সাধনা করলে কত বড় হতে পারে। আকারে আয়তনে নয়। সেটা প্রতীক। আত্মায়। অন্তঃকরণে। বৌদ্ধদের বুদ্ধ ভগবান নন, বিষ্ণু নন, বিষ্ণুর অবতার নন। হিন্দুরাই তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে আপনার করে নিতে গেছেন। উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু তাতে করে বুদ্ধকে বড় করা হয়নি, মানুষকে বড় করা হয়নি। বড় করা হয়েছে দেবতাকে। বৌদ্ধরা কিন্তু কোনো দেবতাকেই বুদ্ধের চেয়ে বড় বলে স্বীকার করবে না। আর বুদ্ধ যেহেতু তুমি আমি হতে পারি সেহেতু ব্রহ্মাবিষ্ণুকেও তোমার আমার চেয়ে—তোমার আমার বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে—বড় বলে স্বীকার করবে না। বিষ্ণুর অবতার বললে বোঝায় বিষ্ণুই আগে, তাঁর পরে তাঁর অবতার, বিষ্ণুই বড়, তাঁর চেয়ে ছোট তাঁর অবতার। বৌদ্ধরা বলবে বুদ্ধই আগে, বুদ্ধই বড়। সুতরাং ওই যে অবতারের তালিকায় বুদ্ধকে স্থান দিয়ে সমন্বয় ঘটানোর সাধু অভিপ্রায় ওটা ব্যর্থ হয়েছে ও হবে। অতিবড় নির্বোধ না হলে কেউ বলতে পারে না যে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অঙ্গ।

সহ-অবস্থান আর শামিল হওয়া কি এক? হিন্দু বৌদ্ধের বিভেদ আজো অমীমাংসিত। ঝগড়া নেই, কিন্তু বোঝাপড়াও নেই।

বেলা হয়ে গেছল। তোদাইজির সংলগ্ন শোসোইন ভবনে যেতেই মধ্যাহ্নভোজন জুটে গেল। অধ্যক্ষ আমাদের আপ্যায়িত করে ভিতরে নিয়ে দেখালেন পুঁথিপত্র প্রাচীন সম্পদ। সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত হয়ে থাকার এহেন নিদর্শন জাপানে দূরের কথা এশিয়াতে নেই। এমন সব পুঁথি আছে এখানে যার মূল হারিয়ে গেছে চীন থেকে, ভারত থেকে। অধ্যক্ষ আমাকে দেখালেন গন্ধবিহ্বল সূত্র। নাম শুনিনি কখনো। চীনা ভাবচিত্রে লেখা। কতক অংশ পড়ে শোনালেন। হাজার বছরের পুরোনো। আর একখানা পুঁথি দেখালেন, সেটাও হাতে লেখা। কিন্তু কোন ভাষায় জানিনে। তিনিও ঠিক বলতে পারলেন না। মনে হলো মঙ্গোলিয়া কি খাসগড় কি সেইরকম কোনো জায়গার হবে। রঙিন ছবি ছিল তাতে। ভারতীয় বর্ণমালার অপভ্রংশ বলে অনুমান হলো। ভারত এককালে সারা এশিয়ায় ব্যাপ্ত হয়েছিল। একটি মধুর সৌরভের মতো। কেমন করে হারালো সে তার সুগন্ধ। তার মৈত্রীসাধনা। তার অহিংসা। তার প্রেম। রইল যা তা বাইরের লোক সাদরে বরণ করে নিল না। নেবার মতো হলে তো নেবে। ভারত হলো বৃহত্তর ভারত থেকেও বিচ্ছিন্ন। ভরা নদী হলো মরা গাঙ। কিন্তু তার দু'কূল ছাপানো জল তখন থেকে রক্ষিত হয়ে এসেছে শোসোইন ভবনে।

অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি এই বাড়ীটি নিজেই একটি দেখবার জিনিস। জানালা নেই, খুঁটি নেই, মাটির দেয়াল নেই। তিনকোণা কাঠের তক্তা একটার উপর একটা চাপিয়ে সমস্তটা গড়ে তোলা হয়েছে। একটিও পেরেক লাগেনি। মেজে মাটি থেকে ন' ফুট উঁচুতে। আশ্চর্য এই যে আগুন কী জানি কেন আজ পর্যন্ত এর গায়ে জিভ বুলিয়ে দেয়নি। ভারতের বিদ্বজ্জনের কাছে আমার নিবেদন, কোনদিন কী ঘটে বলা যায় না, কাঠ যখন কাঠ আর আগুন যখন আগুন তখন বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে সময় থাকতে ভারতীয় পুঁথিপত্রের মাইক্রোফিল্ম আনিয়ে রাখা। আর ওই যে হোরিয়ুজি মন্দিরের অজন্তাসদৃশ চিত্রাবলী তারও প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়ে ভারতবর্ষে রক্ষা করা উচিত। এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি, নয়তো পরে বলতে ভুলে

যাব, রবীন্দ্রনাথের চিরভক্ত মাদাম তোমি কোরা জাপান থেকে ফোটোগ্রাফার পাঠিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর চিত্রাবলীর ও আচার্য নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা প্রাচীরচিত্রের রঙিন ফোটো তোলাতে উদ্‌গ্রীব। তাঁর ধারণা এখন না তোলালে পরে হারিয়ে যেতে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যতদূর জানি জাপানীরা নিজেদের খরচে এসব করবেন। কেন? সৌন্দর্য যে দেশেই সৃষ্ট হোক না কেন সারা বিশ্বের সম্পদ।

এর পর তোদো মহাশয় আমাদের নিয়ে গেলেন ঘণ্টাঘরে। ঘণ্টা তো নয়, মহাঘণ্টা। মহারাজাধিরাজের মতো মহাঘণ্টাধিঘণ্টা। অষ্টম শতাব্দীর কীর্তি। ব্রঞ্জনির্মিত। এত পুরাতন ঘণ্টা তামাম জাপানে নেই। বারো শ' বছর ধরে এ ঘণ্টা সমানে বেজে এসেছে প্রার্থনার সময় জানাতে। অবিকল একই ধ্বনিতে। উচ্চতা সাড়ে তেরো ফুট। ব্যাস ন' ফুট এক ইঞ্চি। ওজন আটচল্লিশ টন। এ হেন ঘণ্টা বাজাবে কে? আমি একবার ঘণ্টাপেটা ঝুলন্ত কড়িকাঠটাকে জোরসে টেনে ছেড়ে দিলুম। ঘণ্টার গায়ে হাতুড়ির মতো ঠক করে লাগল। কিন্তু আনাড়ির চাঁটি খেয়ে খোলের বোল খুলল না। আরেক জন মারলেন। আর অমনি আওয়াজ হলো গুম্‌ম্‌ম্‌···ম্‌···ম্‌···ম্‌। অনেকক্ষণ চলল তার অনুরণন। ঘণ্টা নড়ল না, চড়ল না, স্থির থাকল। আর তার বোল চলল কে জানে কত দূর অবধি। তখন আমি প্রাণপণে কড়িটাকে টেনে য্যায়সা পিটুনি দিলুম যে ঘণ্টা এবার স্বর ছাড়ল ওঁ ··ম্‌·· ম্‌···ম্‌।

দু'দু'বার মেরেছি। এক একবারের জন্যে মাশুল লাগবে দশ ইয়েন করে। বিশ ইয়েন বের করে ধরে দিতেই ঘণ্টাবতী বললেন, আপনার কাছ থেকে কিছু নেব না। এই বলে কী হাসি! কিনতে হলো একটা খেলনা ঘণ্টা। সেই ঘণ্টারই বামন অবতার। লাটিমের মতো সেটাকে ঘোরাতে হয়। তা হলেই সে ঘুর ঘুর করে আর ভোমরার মতো ভোঁওওওও করে। ঘোরাতে কি আমি জানি! আমাকে শেখাতে হলো হাতেখড়ির মতো। ফী বার আমি হারি আর হাসি জোগাই। হাসি জোগানোর দরুন আমার পাওনা বিশ ইয়েন। দেনাপাওনা শোধবোধ হয়ে গেল।

অদূরে পাইন বন। তার কোলে কাইদানইন দেউল। নিভৃত নির্জন স্থান। কী আছে এখানে দেখবার? বুদ্ধমূর্তির চেয়ে দর্শনযোগ্য চার দেবরাজ মূর্তি।

সেই যাঁদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বিরূপাক্ষ, বৈশ্রবণ। এঁদের কাজ হলো চার দিকে দাঁড়িয়ে চার দিক পাহারা দেওয়া। এঁরা বুদ্ধের দেহরক্ষী। দেহরক্ষীরা দুর্ধর্ষ ও করাল হয়েই থাকে। যে মন্দিরেই যাই সে মন্দিরেই এঁদের দেখি। কী ভয়াবহ মুখচোখ! দেখলেই আশঙ্কা হয় মারবে নাকি! তা বলে এঁরা লোক মন্দ নন। পরম ধার্মিক এবং বিজ্ঞ। অষ্টম শতাব্দীর কীর্তি।

আরো কিছু দূর হাঁটতে হলো। এর নাম সংগৎস্থ-দো। তৃতীয় চাঁদের মন্দির। চাঁদের মানে কি চান্দ্রমাসের? জাপানে আগে চান্দ্রগণনা ছিল। নারা নগরীর প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অন্যতম এটি। আগুন এর গায়ে আঁচড়টি দেয়নি। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী ফুকু কেন্‌জাকু কান্নন। সংস্কৃত নাম অমোঘপাশ অবলোকিতেশ্বর। বোধিপয়োধি তীরে নিশ্চিতির ছিপ দিয়ে ধরেন মানুষদের ও দেবতাদের। এই বিগ্রহের পদতলে পদ্ম। ইনি তার উপর দণ্ডায়মান। পশ্চাতে ডিম্বাকার আভামণ্ডল। দুটি হাত জোড় করেছেন। আরো চারটি হাতে কী সব ধারণ করেছেন। অষ্টম শতাব্দীর কীর্তি। শুষ্ক ল্যাকারের কাজ।

কান্ননের দুই পাশে নিক্কো আর গাক্কো। চন্দ্রকিরণ আর সূর্যকিরণ। জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দুই সুন্দর পুরুষ। চন্দ্রকিরণই সুন্দরতর। আশেপাশে আরো কয়েকটি মূর্তি।

চন্দ্রকিরণ ও সূর্যকিরণ মৃন্ময়। অন্যগুলি শুষ্ক ল্যাকারের। সমস্ত অষ্টম শতাব্দীর। জাতীয় সম্পদ বলে চিহ্নিত হয়ে জাপান সরকারের দ্বারা সুরক্ষিত। নারা যুগের সভ্যতা কত ঊর্ধ্বে উঠেছিল তার সাক্ষী। চীন ও ভারতের সংস্পর্শে এসে সহসা পুষ্পিত হয়েছিল জাপানের দেহলতা। নারা-যুগ অষ্টম শতাব্দীতে আরম্ভ হয়ে অষ্টম শতাব্দীতেই শেষ হয়। কিছু কম এক শ' বছর তার আয়ুকাল। তার পরে বৌদ্ধ যুগ থাকে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে। ভারতের বাইরে এই যে ছোট এক টুকরো ভারত জাপান একে আজো ভুলতে পারেনি।

নারা! নারা! সায়োনারা! আবার উঠে বসলুম ট্যাক্সিতে।

আর কত দূরে নিয়ে যাবেন মোরে, হে তোদো-সান! তোদো বললেন, তেনরি। সে কোন ঠাঁই? নারা থেকে বেশ কিছু দূরে নতুন এক ধর্ম

প্রবর্তিত হয়েছে। বৌদ্ধ নয়, শিন্তো নয়, খ্রীস্টান নয়, অথচ তিন ধর্মেরই 'অবদান' নিয়ে চতুর্থ এক ধর্ম। তার নাম তেনরি-কিয়ো। পণ্ডিতদের মতে এটা শিন্তো ধর্মেরই অন্যতম সম্প্রদায়, যেমন হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু তেনরিতে পৌঁছে প্রশ্ন করে উত্তর পেলুম, "না, সম্প্রদায় নয়, স্বতন্ত্র একটা ধর্ম।" এক কালে শোনা যেত কেশবচন্দ্রের নববিধানও তাই। তেনরিকিয়োর ইংরেজী হচ্ছে "Heavenly vision."

ভগবানকে কেউ পিতারূপে কল্পনা করে, কেউ মাতারূপে। কিন্তু তেনরির এঁরা বলেন ভগবান মা-বাপ। ইংরেজীতে "God the Parent." জাপানের এক সৎকৃষককন্যা মিকি নাকায়ামা যখন একচল্লিশ বছর বয়সের মাঝামাঝি পৌঁছন তখন ১৮৩৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর "God the Parent took Her as His living Temple." তাঁর পরমায়ু নির্দিষ্ট হয়েছিল এক শ' পনেরো বছর। কিন্তু সেটাকে তিনি স্বেচ্ছায় পঁচিশ বছর কমিয়ে এনে নব্বই বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর আত্মা জীবিত রয়েছে তাঁর আদিনিবাসে। এই তেনরিতেই। ঘরটি আমাদের দেখানো হলো, বাইরে থেকে। লোকে সেখানে তাঁকে ভোগ দিয়ে যায়। এই স্থানটিতে একদা মানবজাতির উদ্ভব হয়েছিল। সুতরাং এটি মানবজাতিরও আদিনিবাস। এই পবিত্র স্থানটিকে জাপানী ভাষায় বলা হয় তেনরি-ও-নো-মিকোতো। ভগবান-মা-বাপকে প্রার্থনা করার সময় ডাকতে হয় তেনরি-ও-নো-মিকোতো।

তেনরিকিয়োর কেন্দ্রীয় উপাসনালয় একটি প্রাসাদ বললেও চলে। এর মহলের পর মহল। একটি বৃহৎ হলঘরে সকলে জমায়েৎ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসেন ও বুকের উপর হাত রেখে কী সব গুনগুনিয়ে বলেন। তার পর হাত চিৎ করে কী যেন ছড়িয়ে ফেলে দেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, "ভক্তরা বলছেন, মিকি নাকায়ামা, তুমি আমাদের পাপতাপের ময়লা ধুলো ঝাঁট দিয়ে সাফ কর। আমাদের পবিত্র কর।" এঁদের মতে পাপতাপ হচ্ছে ময়লা ধুলো। কুভাবনাও তাই। প্রতিদিন ঝাঁট দিয়ে সাফ না করলে জমতে জমতে আস্তাকুঁড় হবে। তাতে শরীরমন উভয়ের অসুখ। মলিন ধুলো সাফ করলে মানুষ সুখী হয়। ভগবানের বাৎসল্য স্নেহ তাকে সর্বদা ঘিরে রয়েছে। তিনি তো তাকে সুখী দেখতেই চান। প্রতিদিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে, তাঁর জন্যে করতে হবে ভক্তিমূলক কাজ।

পরোপকার। পরদুঃখ মোচন। সেবাকর্ম। কায়িক শ্রম। আমরা স্বচক্ষে দেখলুম ভক্তরা সত্যি সত্যি ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, ময়লা সাফ করছেন। ঝি-চাকরের কাজ, মেথরের কাজ। বিনোবাজী যাকে বলছেন শ্রমদান তাই দিয়ে তৈরি হয়েছে এত বড় কাঠের দালান। সমস্তটা চকচক করছে।

শ্রমদানটা জেন বৌদ্ধদেরও আইডিয়া। তেমনি নৃত্যগীত হচ্ছে শিন্তো ধর্মের অঙ্গ। দেখলুম নাচের জন্যে চমৎকার মেজে। তেনরির এঁরাও মাঝে মাঝে নৃত্যোৎসব করেন। ওটা এঁদের ধর্মেরও শামিল। এই ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য নরনারীর সাম্য। তা তো ভগবানকে মা-বাপ বলার মধ্যেই উহ্য রয়েছে। মেয়েদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা এঁরা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। গাইড মেয়েটি বলল, "আমিও একদিন আচার্য হতে পারি।" দেশে বিদেশে তেনরিকিয়োর প্রায় বারো হাজার উপাসনাগার। তার মধ্যে সাড়ে পাঁচ শ' বিদেশে। আমেরিকায় এঁদের এক মস্ত আড্ডা। মেয়েটি আমেরিকায় জন্মেছে, মানুষ হয়েছে। ইংরেজী বলে, পোশাক পরে মার্কিন মেয়েদের মতো।

বলতে ভুলে গেছি, যাঁরা প্রার্থনা করছিলেন তাঁরা থেকে থেকে আচমকা একবার কি দু'বার করতালি দিচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, করতালি কেন? উত্তর পেলুম, যাঁকে তাঁরা ডাকছেন তিনি শুনছেন কি না কে জানে! তাই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। তখন আমার মনে পড়ে গেল কাবুকি রঙ্গমঞ্চে দর্শকের বা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে কাঠের করতাল। আর এ হলো হাতের করতাল। তেনরিকিয়োর উপাসনালয় সারাদিন সারা রাত খোলা থাকে। যার যখন প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হয় সে গিয়ে মনের মলিনতা ঝাঁট দিয়ে সাফ হয়ে আসতে পারে।

বেড়াতে বেড়াতে আমরা গেলুম তেনরিকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার দেখতে। চমৎকার ব্যবস্থা। পুস্তক সংগ্রহও কয়েক লাখ। তার মধ্যে ভারতীয় বিষয়েও বই আছে। কিন্তু যার জন্যে আমাদের সব চেয়ে আগ্রহ তা হচ্ছে নেপোলিয়নের আমলের মিশরের বিবরণ। চিত্রবিচিত্র। বহুখণ্ড। বৃহৎ। ফরাসী পণ্ডিতদের জ্ঞানপিপাসা প্রাচীন ও আধুনিক মিশরের সর্বপ্রকার তথ্য আহরণ করে লিপিবদ্ধ করেছে। কেন? কোনো প্রাকটিকাল উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে? না। তেমন কোনো কাজ হাসিল করার জন্যে নয়।

মানুষকে জানবার জন্যে। জগৎসংসারকে জানবার জন্যে। নইলে আপনাকেও জানা যায় না। বিশুদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানে তেনরিকিয়োরও উৎসাহ আছে।

দুষ্প্রাপ্য ভৌগোলিক মানচিত্র দেখতে দেখতে দর্শন লাভ ঘটল তেনরিকিয়োর ধর্মগুরু তথা সর্বাধ্যক্ষের। তাঁকে ইংরেজীতে বলা হয় প্যাট্রিয়ার্ক। মিকি নাকায়ামার সাক্ষাৎ বংশধর শোজেন নাকায়ামা। সুশিক্ষিত সুমার্জিত পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে সজ্জিত আধুনিক রুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক। গোঁফদাড়ি কামানো। আমাদেরি মতো ছাঁটা চুল। প্যাট্রিয়ার্ক বললে যে চেহারা মনে জাগে সে চেহারা নয়। এঁর তুলনা খুঁজতে হলে বাহাইদের কাছে যেতে হয়। তেনরিকিয়োর উচ্চাভিলাষ বাহাই ধর্মের মতো দিগ্‌বিজয়ের। পশ্চিমকে ও আধুনিককে স্বীকার করে জয় করার। দীক্ষিত করার। নানান পাশ্চাত্য ভাষা শেখানো হয় এঁদের মিশনারীদের। এঁরা বিশ্বাস করেন যে ইহকালেই ও ইহলোকেই মানুষ দেহমনের অসুখ কাটিয়ে উঠে সর্বতোভাবে সুখী হতে পারে। কিন্তু স্বার্থত্যাগ না করে পরকে সুখী না করে নিজে সুখী হওয়া যায় না। তাই ঝোঁকটা সর্বসেবার উপরে। এঁরা হাসপাতাল, যক্ষ্মানিবাস ইত্যাদিও চালান। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়।

এমন হালফিল নতুন ধর্ম জাপানে এই একটি নয়। শুনলুম হাজার কি বারো শ' নতুন ধর্ম উদয় হয়েছে। যুদ্ধে বিগ্রহে আঘাতে অভাবে রোগে শোকে মানুষ আকুল হয়ে সান্ত্বনা খুঁজছে। তাই তাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছে এই সব ধর্ম। বেশীর ভাগই শিন্তোভিত্তিক, বৌদ্ধপ্রভাবিত, খ্রীস্টানুসারী। আগেকার দিনের জাপান সরকার বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান ব্যতীত আর সব ধর্মকেই শিন্তো ধর্মের সম্প্রদায় বলে রেজিস্ট্রি করতেন, নয়তো প্রচার বন্ধ করে দিতেন। তাই শিন্তো ধর্মের এক-একটি সম্প্রদায় বলে পরিচয় দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল তেনরিকিয়ো প্রভৃতি অভিনব ধর্ম। এখনকার জাপান সেক্যুলার স্টেট। হাজারটা নয়া ধর্ম প্রবর্তন করলেও রাষ্ট্রের আপত্তি নেই।

"হিন্দু" এই নামটি যেমন মুসলমানদের দেওয়া "শিন্তো" এই নামটিও তেমনি বৌদ্ধদের দেওয়া। অন্যের দেওয়া নামকে আপন করে নিয়ে গর্ব বোধ করা দেখছি আমাদের একচেটে নয়। শিন্তো কথাটার অর্থ দেবতাদের ধারা। দেবযান। দেবমার্গ। দেবতারা না থাকলেও বৌদ্ধধর্ম থাকে।

কিন্তু দেবতারা না থাকলে শিন্তো ধর্ম থাকে না। শিন্তোদের দেবতারা খাঁটি স্বদেশী দেবদেবী। ভিন দেশের সঙ্গে তাঁদের ঠিক মেলে না। তাঁদের দেবতা বলাটাও ঠিক নয়। তাঁরা হলেন "কামি" অর্থাৎ "উপরওয়ালা"। অতি প্রাচীনকালে প্রাণী-অপ্রাণী-নির্বিশেষে যে-কোনো পদার্থকে "কামি" বলা হতো, সে যদি হতো উপরিতন, রহস্যময়, ভয়ঙ্কর, প্রবল বা অবোধগম্য। কামিরাই পূর্বপুরুষ। অথবা পূর্বপুরুষরাই কামি। তাঁরা মৃত হলেও জীবিত। এই যেমন মিকি নাকায়ামা।

"কোজিকি" নামে একটি পুরাণ ও "নিহোঙ্গি" নামে একটি মহাভারত-জাতীয় মহাজাপান এই দুটি আদি গ্রন্থে শিন্তো ধর্মের তত্ত্ব নিহিত। প্রলয় থেকে সৃষ্টি যখন হয় তখন ছিলেন তিন দেবদেবী। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁর নাম ছিল আমে-নো-মিনাকামুশী। আর দু'জনের মধ্যে যিনি পুংশক্তি তাঁর নাম তাকামি মুসুবি। আর যিনি স্ত্রীশক্তি তাঁর নাম কামি মুসুবি। এঁরা চীনদেশী বলে ক্রমেই শিন্তো পার্বিণ থেকে অপসৃত হন। তাঁদের পরে যাঁরা তাঁদের স্থান নেন তাঁদেরও অপসরণ ঘটে। অবশেষে দেখা দেন ইজানাগি ও ইজানামি। নিমন্ত্রক ও নিমন্ত্রিকা। মর্ত্যলোক এঁদেরই প্রজনন। এঁরাই জন্ম দেন বাতাসকে, জলকে, কুয়াশাকে, খাদ্যকে, পর্বতকে, আর সব প্রপঞ্চকে। জনকজননীর মতো ওরাও দেবতা হয়ে গেল। সকলের পরে জন্মালেন সূর্যদেবী আমাতেরাসু ওমিকামি, চন্দ্রদেব৺সুকি-য়োমি এবং সাহসী দ্রুতগামী ঝড়ের মতো বীর তাকেহায়া-সুসানোবো। সূর্যদেবীর রাজ্য হলো স্বর্গ আর মর্ত্য। চন্দ্রদেবের রাজ্য হলো রাত্রি। আর বলীর রাজ্য হলো পাতাল। এই তিনজন প্রধান। এ ছাড়া অসংখ্য দেবদেবী।

ধীরে ধীরে সূর্যদেবীই হন একচ্ছত্র দেবতা। তাঁরই বংশধর জাপানের সম্রাট। জাপানীরা সবাই তাঁরই বংশ। শিন্তোদের চোখে সূর্যদেবীর চেয়ে বড় দেবতা নেই। সম্রাটের চেয়ে বড় মানব নেই। মানব হলেও তিনি দেবতাবিশেষ। আর কোনো মানুষ তেমন নয়। তারপর জাপানীরা জাতকে-জাত দেব অংশে জন্মেছে। আর কোনো জাত তেমন নয়। এই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি সূর্যদেবীর একচ্ছত্র রাজত্ব। স্বর্গে তথা মর্ত্যে। সূর্যদেবী যদি কোনো দিন নিতান্তই একটি জড়পদার্থে পর্যবসিত হন তা হলে শিন্তো ধর্মের মূল স্তম্ভ ভেঙে পড়বে। অথবা যদি বিজ্ঞানের বিচারে হেরিডিটি তার

মহিমা হারায় তা হলেও শিন্তো ধর্মের তাসের কেল্লা ধ্বসে পড়বে। যেমন পড়েছে বর্ণাশ্রমীদের তাসের দেশ। তার পরেও শিন্তো ধর্ম থাকবে, কারণ তার চিরন্তন মূল্য যাবার নয়। তার জন্যে আরো গভীরে যেতে হয়।

জাপানে এসে আমি প্রথমে পড়েছিলুম পেন কংগ্রেসের লেখকদের হাতে। তার পরে পড়ি বৌদ্ধদের হাতে। শিন্তোদের হাতে পড়তে পাইনি। পড়লে হয়তো বলতে পারতুম শিন্তো ধর্মের চিরন্তন মর্মবাণী কী। তেনরিকিয়ো যদি শিন্তো ধর্মের সংস্কৃত রূপ হয়ে থাকে তবে এক কথায় বলতে পারি, আনন্দময় জীবন। নাচ গান পালপার্বণ শিন্তোদের মতো বৌদ্ধদের নেই, খ্রীস্টানদের নেই, আছে বোধ হয় শুধু হিন্দুদের। শুনেছি জাপানীরা মৃত্যুর সময় বৌদ্ধদের ডাকে। আর জন্মের সময় বিবাহের সময় অন্যান্য সংস্কারের সময় ডাকে শিন্তোদের। শিন্তো আর বৌদ্ধ মিলে জীবনমরণ ভাগ করে নিয়েছে। হাজার বছর ধরে সমন্বয়ের চেষ্টাও চলেছে। শিন্তো দেবদেবীরা নাকি বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব। সূর্যদেবী আর বুদ্ধ নাকি এক ও অভিন্ন।

তেনরিকিয়োর অতিথিশালায় রাজার হালে রাত কাটিয়ে রাত থাকতে উপাসনায় যোগ দিয়ে পরের দিন কিয়োতো ফিরতে বলা হয়েছিল আমাকে। রাজী হয়ে গেলে পারতুম। কিন্তু আমার প্রাণে ভয় জাপানী স্নানাগারকে। ওই যে ওরা একসঙ্গে একই চৌবাচ্চায় দিগম্বর হয়ে নামে। আছে হয়তো এর মধ্যে একটা কমিউনিয়নের বা সাযুজ্যের ভাব, কিন্তু আমার যে গা ঘিন ঘিন করে। বলি, লণ্ডনে কি সাত দিন অন্তর এই কর্মটি তুমি করনি? তফাতের মধ্যে ওটা ছিল বড় আকারের সুইমিং বাথ। আর এটা হলো ছোট মাপের বাথ। গায়ে গা ঠেকে যায় না ওতে। ঠেকে যাবেই এতে। তবে আগে থেকে বলে রাখলে ওরা আলাদা স্নানের ব্যবস্থা করে দেয়। জাপানীরা গরম জলে স্নান করতে অভ্যস্ত। জল গরম করতে বেশ খরচ পড়ে। প্রত্যেকে যদি জেদ ধরে যে আলাদা গরম জলে স্নান করবে তা হলে গৃহস্থ ফতুর হবে। আমরা বিদেশী বলেই আমাদের আবদার সহ্য করতে হয়। গরম জলের কুণ্ডে দেহনিমজ্জনের পূর্বেই ওরা বাইরে বসে ঠাণ্ডা জলে সাবান দিয়ে গাত্রমার্জনা করে নেয়। তার মানে স্নানের পর অবগাহনের জন্যেই জাপানী বাথ। আমি ভুল বুঝেছিলুম। ঠিক বুঝলুম অধ্যাপক তোদোর অতিথি হয়ে।

সন্ধ্যার ট্রেনে আমরা কিয়োতো ফিরি ও সটান তোদো মহাশয়ের বাড়ী

যাই। তাঁর গৃহিণী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বারান্দায় পা দেবার আগে উঠোনে জুতো খুলে রাখলুম। পায়ে দিলুম কাপড়ের চটি। এ চটিও বদলাতে হয়, যখন শৌচাগারে যেতে হয়। তখন খড়ের চটি। মাদুর দিয়ে মেজে মোড়া প্রত্যেকটি ঘরের। কাগজের দেয়াল। সরস্ত দরজা। সামান্য আসবাব। খাট নেই, মেজের উপর পুরু বিছানা পেতে শুতে হয়। সে বিছানা আসে দেয়ালের পিছনের ফাঁক থেকে। ফাঁপা দেয়াল। একখানি বড় ঘর বা হল-ঘর দেখলুম। বদ্ধ ঘর। বেদীতে বুদ্ধ অমিতাভ। সামনে সকলের জমায়েৎ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসবার জায়গা। তোদো-সান প্রণাম করলেন। তিনি শুধু অধ্যাপক নন, তিনি পুরোহিত। পাশ্চাত্য পোশাক ছেড়ে কিমোনো পরে এসে উপাসনায় বসলেন। ভারতের বুদ্ধ। জাপানের বৌদ্ধ।

হোক্কাইদো কিবোরিগুমা

॥ চোদ্দ ॥

পরের দিন বেলা করে ঘুম ভাঙল। ঘুমের ঘোরে কানে বাজছিল ঠক ঠক ঠক ঠক আওয়াজ। তার সঙ্গে মন্ত্রের মতো ধ্বনি। ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ।

আমি কোথায়? হোটেলে? ও কি টেলিফোন বাজছে? আমার ঘুমভাঙানী দিদি আমাকে জাগাচ্ছেন? না। তা তো নয়। আমি শুয়ে আছি ঢালা বিছানায়। জাপানী ধরনের কক্ষে। তোদো মহাশয়ের গৃহে। এখানে টেলিফোন নেই। তা হলে কী আছে?

একটু একটু করে ঠাহর হলো বুদ্ধঘরে প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়ে গেছে। যন্ত্রের ঝঙ্কার নয়। ছন্দোবদ্ধ ওঙ্কার। শয্যা ছেড়ে উঠলুম। য়ুকাতা আর ওবি খুলে রেখেছিলুম। আবার জড়ালুম ও বাঁধলুম। পুরুষদের ওবি বন্ধন নীবিবন্ধন নয়। ভুঁড়ি বন্ধন। বোধ হয় ভুঁড়ির বহর বাড়তে না দিতে। মেয়েদের ওবি বন্ধনও নীবিবন্ধন নয়। ওঁরা বাঁধেন বুকের নিচে। বোধ হয় সুমধ্যমা হতে। উদ্বৃত্ত অংশ পিঠে পাট করে পোঁটলার মতো বয়ে বেড়ান।

সরস্ত কপাট ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখি তোদো মহাশয় অগ্রণী হয়ে বুদ্ধবেদীর সম্মুখে বসেছেন। দূরত্ব রক্ষা করে তাঁর পশ্চাতে এসে বসলেন একে একে তাঁর গৃহিণী, তাঁর পুত্রকন্যা, তাঁর অসুস্থা বৃদ্ধা জননী। সকলেরই বজ্রাসন। সকলেই যুক্তকর। তোদো মহাশয় গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন, "নমু অমিদা বুৎসু। নমু অমিদা বুৎসু। নমু। নমু। নমু। নমু।" নমো অমিতাভ বুদ্ধ। নমো অমিতাভ বুদ্ধ। নমো। নমো। নমো। নমো।

ওই যে তিনটি শব্দ "নমু অমিদা বুৎসু" ওকে বলা হয় নেমবুৎসু। আমাদের যেমন হরিনাম। যেমন "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" হরিনাম করলে যেমন নারায়ণের অধিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠধামে গতি তেমনি নেমবুৎসু উচ্চারণ করলে অমিতাভ বুদ্ধের অধিষ্ঠিত পশ্চিমস্বর্গে গতি।

সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা চাই। শিন্তোদের মতো হাতে হাত চাপড়িয়ে দু'বার কি তিন বার করতালি বাজালে চলবে না। একটি ছোট দণ্ড হাতে নিয়ে ঠক ঠক ঠক ঠক করে সমস্তক্ষণ তালে তালে আঘাত করতে হবে যার উপর সেটা কাঠের তৈরি একটা নাকড়া-জাতীয় বাদ্য। তার

নাম মোকুগিয়ো। গাছ মাছ। গাছের সঙ্গে মাছের কী সম্পর্ক? বোধ হয় কুণ্ডলী-পাকানো মাছের সঙ্গে গাছের অর্থাৎ কাঠের গঠনসাদৃশ্য।

আর সেই দণ্ডটিকে বলে বাই। তোদো মহাশয় বাই দিয়ে মোকুগিয়োকে তালে তালে আঘাত করছিলেন এক হাতে। আর মুখে উচ্চারণ করছিলেন নেমবুৎসু। আগে মনোযোগ আকর্ষণ। পরে মন্ত্রোচ্চারণ বা নামকীর্তন। আমরা যেমন খোল বাজাতে বাজাতে হরিনাম করি। আর যাঁরা সে ঘরে ছিলেন তাঁরা নির্বাক নিষ্ক্রিয়। বোধ হয় মনে মনে জপ করছিলেন আমার মতো। আমারও ইচ্ছা করছিল তাঁদের পিছনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে। বুদ্ধের দেশের ছেলে আমি। আমারি তো সকলের চেয়ে বেশী কর্তব্য। কিন্তু সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। চোখে মুখে জল দিইনি। শুচি হইনি। গেলুম শুচি হতে। ফিরে এসে দেখি উপাসনা সাঙ্গ। উপাসকরা অদৃশ্য। মনে একটা খেদ রয়ে গেল।

তোদোসানের ওকুসান (গৃহিণী) এসে বিছানা তুলে লুকিয়ে রাখলেন ডবল দেয়ালের মাঝখানকার ফোকরে। মেজের উপর আর কোনো আসবাব থাকবে না, থাকবে শুধু একটি নিচু টেবিল। আমাদের জলচৌকির মতো নিচু, কিন্তু আকারে আরো বড়। তারই উপর বই রেখে পড়াশোনা, কাগজ রেখে লেখাপড়া, ছবি আঁকা। খাবার রেখে খাওয়া। শোবার ঘরই হয়ে যায় কাজ করবার ঘর। খাবার ঘর। প্রাতরাশ বয়ে নিয়ে এলেন তোদোজায়া ও তাঁর বোন। রাখলেন সেই নিচু টেবিলের উপর। কুশন পেতে দু'ধারে বসলুম বিব্‌লি আর আমি। একটু দূরে বসে আমাদের যত্ন করে খাওয়ালেন তোদোজায়া। ইলেকট্রিক টোস্টার দিয়ে রুটি টোস্ট করে দিলেন। এটা জাপানী রীতি নয়। আমাদের খাতিরেই অত কষ্ট করা।

দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত ঘুরে আমি যেন অবশেষে একটি নীড় পেয়েছি। বাইরে যেতে ইচ্ছা করে না। বৃষ্টি। হাতে কিছু কাজও ছিল। পরের দিনের বক্তৃতার জন্যে প্রস্তুতি। য়ুকাতা না ছেড়ে জাপানীর গৃহে জাপানী সেজে গল্প করি। তার পর যে যার কাজে চলে গেলে লিখতে বসি। শেষ-পর্যন্ত দেখি সদরের ঘরগুলিতে দুই মূর্তি একা। বুদ্ধঘরে অমিতাভ বুদ্ধ। বৈঠকখানা ঘরে আমি। একই ঘরের দুই অংশ। আমার শোবার ঘরের সংলগ্ন।

দশ রাত দশ দিন জাপানে থেকে জাপানে থাকিনি। থেকেছি একটা আন্তর্জাতিক লেখকমণ্ডলীতে। ফরাসী, মার্কিন, ইংরেজ, ভারতীয়দের সঙ্গে। জাপানীদের সঙ্গেও, কিন্তু বিশেষ করে তাঁদের সঙ্গে নয়। জাপানকে দেখেছি সদলবলে, সাড়ে তিন শ' থেকে কমতে কমতে দেড় শ' জনের দলবল নিয়ে। চোখ জোড়া অবশ্য আমার নিজের। কিন্তু দ্রষ্টব্যের উপর আমার কোনো হাত নেই। যেখানে নিয়ে গেছে সেখানে গেছি, ইচ্ছামতো যাবার অবসর পাইনি। এইবার আমি স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র বলেই শঙ্কিত। কেই বা আমাকে চেনে! কাকেই বা আমি চিনি! ভাষাও বুঝিনে। বোঝাতে পারিনে। কিন্তু এক রাত্রি এক দিন জাপানী গৃহস্থের অতিথি হয়ে জাপানী গৃহে কাটিয়ে আমার শঙ্কা দূর হলো।

না। ভাষা একটা বাধা নয়। দেশ একটা বাধা নয়। জাতি একটা বাধা নয়। ধর্ম একটা বাধা নয়। বর্ণ একটা বাধা নয়। হৃদয় যখন হৃদয়কে টানে তখন মুহূর্তে সব বাধা সরে যায়। জাপানকে আমি ভালোবেসেছি, জাপান আমাকে ভালোবেসেছে। ভোজবাজির মতো সব কেমন করে ঘটে গেছে। যেন আগে থেকে সব সাজানো ছিল।

যে পাড়ায় তোদো মহাশয়ের বাড়ী কাম্বগাই মহাশয়ের বাড়ীও সেই পাড়ায়। পাড়াটি পাড়াগাঁয়ের মতো। কাছেই পাহাড়। অদূরে বাজছিল মন্দিরের ঘণ্টা। মন্দিরের নাম চিওঁইন। এই মন্দিরের ঘণ্টা কিয়োতোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর ধ্বনি সব চেয়ে শুনতে ভালো চেরিফুলের মরশুমে ভোরের কুয়াশা যখন এলিয়ে থাকে কামো নদীর বুকের উপর সাম্বোজি নামক স্থানে। তখন তো চেরিফুলের মরশুম নয়, চন্দ্রমল্লিকার মরশুমও শুরু হয়নি। তবে দুটি-একটি দেখতে পেয়েছি মরশুমের অগ্রদূতী চন্দ্রমল্লিকা। আর যেখানে বসে ঘণ্টাধ্বনি শুনছি সেখানটা কামো নদীর ধারে নয়, খাস চিওঁইন মন্দিরের পাশে।

নারা থেকে কিয়োতোয় রাজধানী সরে আসে অষ্টম শতাব্দীর শেষে। শোনা যায় সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল নারার বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির রাজনৈতিক প্রভাব এড়ানো। কিন্তু কিয়োতো রাজধানী হবার পরে পুরোনো সম্প্রদায়গুলির প্রভাব খর্ব হলেও বৌদ্ধধর্মের গৌরব ক্ষীণ হয় না। নতুন নতুন সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়। নবম শতাব্দীর আদ্যে সাইচো আর কুকাই

নামে দুই সাধু ফিরলেন চীন থেকে। সাইচো নিয়ে এলেন তেন্দাই পন্থ। আর কুকাই নিয়ে এলেন শিন্‌গন পন্থ। যদিও চীন থেকে আমদানি, চীনে আবার ভারত থেকে আমদানি, তবু এই দুই সাধুর নীতির গুণে অপেক্ষাকৃত জাপানী। এঁদের নীতি হলো যুগধর্মের সঙ্গে দেশসত্তার যোগাযোগ সাধন। দেশকে, তার মাটিকে উপেক্ষা করে যুগকে ও তার হাওয়াকে একান্ত করলে যা হয় নারার সম্প্রদায়গুলি তার দৃষ্টান্ত। তেন্দাই আর শিন্‌গন তার থেকে শিক্ষা পায় যে দেশের মন পেতে হবে।

শিন্‌গন তো সোজাসুজি শিন্তোর সঙ্গে সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে বার করল। যিনিই বুদ্ধ তিনিই সূর্যদেবী। তেন্দাইও সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিল। আগেও যে সে রকম চেষ্টা একেবারে হয়নি তা নয়। তবে তেন্দাই ও শিন্‌গন—বিশেষ করে শিন্‌গন—শিন্তোর সঙ্গে একদিল হয়ে যায়। এর ফলে তেন্দাই ও শিন্‌গনের দেশীয়তা, দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা। সেই অনুপাতে চীনের সঙ্গে, ভারতের সঙ্গে ব্যবধান।

এর পরে চীন থেকে এলো জেন পন্থ। এরও আদিপর্ব ভারতে। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদে বোধিধর্ম নামে এক সাধু ভারত থেকে চীনে গিয়ে ধ্যান মার্গ প্রদর্শন করেন। ধ্যান হলো চীনাদের মুখে চান ও জাপানীদের মুখে জেন (Zen)। চীন থেকে জাপানে এলো একটির পর একটি ঢেউয়ের মতো। প্রথম ঢেউ দ্বাদশ শতাব্দীতে। রিন্‌জাই সম্প্রদায়। দ্বিতীয় ঢেউ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। সোতো সম্প্রদায়। তৃতীয় ঢেউ সপ্তদশ শতাব্দীতে। ওবাকু সম্প্রদায়। তেন্দাই ও শিন্‌গনের মতো এঁরা শিন্তোর সঙ্গে সমন্বয় খুঁজলেন না, কিন্তু জাপানের আত্মার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক পাতালেন। সৌন্দর্যবোধ, বীরত্ব, কর্মপ্রতিভার সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করলেন। জেনও হলো জাপানী। জাপানের আত্মা। চীনের সঙ্গে, ভারতের সঙ্গে ব্যবধান বাড়ল। জাপানের যোদ্ধারা ও শিল্পীরা ধ্যানমার্গী বৌদ্ধ। জেন ডিসিপ্লিন মানুষকে যোদ্ধাও করতে পারে, শিল্পীও করতে পারে।

জেন যেমন ধ্যান মার্গ তেমনি শিন্‌গন হচ্ছে তন্ত্রমন্ত্র বা শক্তি মার্গ। আর তেন্দাই হচ্ছে ভক্তি মার্গ। আমাদের দেশে ভক্তি মার্গ সাধারণত বিষ্ণুকে ও আর তাঁর অবতার রামকে বা কৃষ্ণকে অবলম্বন করে। জাপানে অমিতাভ বুদ্ধকে। ইনি শাক্যমুনি বুদ্ধ বা শাক্য বুদ্ধ নন। অথবা নন

বৈরোচন বুদ্ধ। বৈরোচন সম্বন্ধে যত দূর জানি তিনি ব্যক্তিবিশেষ নন। তিনি জন্মগ্রহণ করেননি, নির্বাণলাভ করেননি। তিনি তত্ত্ববিশেষ। আর অমিতাভ বুদ্ধ যদিও এখন তত্ত্ববিশেষ তবু আদিতে ছিলেন লোকেশ্বররাজ বা ধর্মাকর নামক ব্যক্তিবিশেষ। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নির্বাণের ফল ইচ্ছা করলে একাই ভোগ করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর শরণাগতদের নির্বাণ লাভ না হলে নিজের করতলগত নির্বাণ গ্রহণ করবেন না বলে তাঁর দুর্জয় সংকল্প বা হোঙ্গান।

ভারতবর্ষের মহাযান বৌদ্ধরা অমিতাভ বুদ্ধের উপাসক ছিলেন বলে শুনিনি। একজন পণ্ডিতের মুখে শুনেছি যে অমিতাভ বুদ্ধ ভারতের নন, মধ্য এশিয়ার কল্পনা। অপর একজন পণ্ডিত কিন্তু বলেন যে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মথুরায় তাঁর উপাসনা প্রচলিত ছিল। তৃতীয় একজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "সংস্কৃত সূত্রে অমিতাভ বুদ্ধের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত সূত্র গেছে ভারত থেকে। অতএব অমিতাভ বুদ্ধ গেছেন ভারত থেকে।" ভারত বলতে সেকালে আফগানিস্থানও বোঝাত। এখনো সেখানে বহু বৌদ্ধ কীর্তি অবিকৃত রয়েছে। যদি সংস্কৃত সূত্রগুলি সেই অঞ্চল থেকে গিয়ে থাকে তা হলে অমিতাভ বুদ্ধ সেই অঞ্চলের উপাস্য ছিলেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলের লোক আমরা অত দূরের খবর রাখতুম না। মহাযান বলতে আমরা জানতুম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। তন্ত্রমন্ত্র বা শক্তি মার্গ। এ মার্গ পূর্বভারত থেকে তিব্বত হয়ে চীন হয়ে জাপানে প্রসারিত। জাপানের ভাষায় শিন্‌গন। আর ভক্তি মার্গ উত্তর-পশ্চিম ভারত বা বৃহত্তর ভারত থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে চীন হয়ে জাপানে প্রলম্বিত। জাপানের ভাষায় তেন্দাই। ধ্যান ম্যার্গ যে ভারতের কোন প্রান্ত থেকে কেমন করে চীনে যায় তার সন্ধান মেলেনি। কোনো কোনো পণ্ডিতের অনুমান দক্ষিণ ভারত থেকে সমুদ্রপথে।

তেন্দাই যদিও ভক্তিমার্গ তবু তা নিম্ন অধিকারীর পক্ষে দুরূহ। তাকে স্ত্রী শূদ্র পাপীতাপী খেটে-খাওয়া অবসর না-পাওয়া আপামর সাধারণের কাছে সহজ করে আনলেন সন্ত হোনেন। জোদো সম্প্রদায়। আরো সহজ করলেন তাঁর শিষ্য শিন্‌রান। ইনি সাধু হয়েও বিবাহ করে আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখালেন। জোদো-শিন সম্প্রদায়। পরে জোদো-শিনেরও

শাখাপ্রশাখা গজায়। হোঙ্গানজি। তার থেকে নিশি হোঙ্গানজি ও হিগাশি হোঙ্গানজি। এমনি সব শাখাপ্রশাখা সমেত জোদো-শিনই জাপানের বৌদ্ধদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তেন্দাই এখন সংখ্যালঘু। শিন্‌গন ও জেন জোদো-শিনের ঠিক পরে তার স্থান সংখ্যাগুরুত্বের দিক থেকে। এ ছাড়া নিচিরেন বলে একটি বৌদ্ধ পন্থ আছে। জাপানের দেশজ। নিচিরেন ছিলেন সংস্কারক। ইনি শাক্য বুদ্ধকেই মানতেন। আর কোনো বুদ্ধকে নয়।

গত শতাব্দীর শেষভাগে যখন হিগাশি হোঙ্গানজির পুড়ে-যাওয়া বাড়ী নতুন করে তৈরি হয় তখন পাহাড় থেকে গাছ কাটিয়ে টেনে আনার জন্যে শক্ত মোটা দড়ির দরকার হয়। তখন হাজার হাজার ভক্তিমতী আপন আপন কেশ দেন, আর সেই কেশ দিয়ে দড়ি পাকানো হয়, আর সেই দড়ি দিয়ে গাছ টেনে আনা হয়, আর সেই গাছের কাঠ দিয়ে মন্দির গড়া হয়। কিয়োতোর হিগাশি হোঙ্গানজি আমি দেখিনি, কিন্তু তোকিয়োতেও এঁদের একটি মন্দির আছে, সেখানে দেখেছি অজন্তার মতো প্রবেশদ্বার। কিন্তু প্রাচীন নয়, আধুনিক।

নিশি হোঙ্গানজির বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রিয়ুকোকু। সেইখানেই আমার বক্তৃতা। তারই জন্যে প্রস্তুতি আমাকে দুপুরবেলা ব্যাপৃত রাখল। বিকেলের দিকে তোদো অধ্যাপনা সেরে ফিরতেই বেরিয়ে পড়া গেল একসঙ্গে। কিয়োতো শহরে বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়। বিবিধ শিক্ষাসত্র। সব চেয়ে বড় যেটি সেটির নাম কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়। এটি জাপানের দ্বিতীয় পুরাতনতম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এরই বিজ্ঞান ফ্যাকালটির অধ্যাপক হিদেকী য়ুকাওয়া জাপানের অদ্বিতীয় নোবেল প্রাইজ বিজেতা। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সাহিত্য ফ্যাকালটিতে। অধ্যাপকরা একটি ঘরে মিলিত হয়ে আমার সঙ্গে বসে ভারতপ্রসঙ্গ আলোচনা করলেন। জাপানীরা সাধারণত সন্ধ্যার পূর্বেই আহারের পাট চুকিয়ে দেয়। সেদিন আমাকে যা খেতে দেওয়া হলো তাকে চা না বলে হাই টী বলাই সঙ্গত।

তার পর তোদো-সান আমাকে পৌছে দিলেন জেন বৌদ্ধদের রিন্‌জাই সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্দির মিয়োশিন্‌জিতে। পৌছে দিয়ে বিদায় নিলেন। এক-রাত্রের জন্যে অতিথি আমি প্রধান পুরোহিত য়ামাদা মহাশয়ের। তিনি আবার হানোজোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন

রীতি। ভাইসচ্যান্সেলার নয়, প্রেসিডেন্ট। দুর্ভাগ্য আমার, যাঁর অতিথি আমি তিনি সেদিন ছিলেন না। হঠাৎ বার্তা পেয়ে চীনদেশে চলে গেছলেন। গৃহকর্তা যেখানে অনুপস্থিত সেখানে অতিথি হওয়া বিড়ম্বনা। তার থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন প্রতিবেশী সুগিও তোরিগোএ। আসাহি পত্রিকার সাংবাদিক বলেই তাঁকে আমি জানতুম। দেখা গেল তিনি কিমোনো পরে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। তিনিও একজন জেন সাধক।

ঘরের দেয়ালে লম্বমান একটি পট। তাতে চীনা ভাবচিত্র আঁকা। জিজ্ঞাসা করলুম, কী লেখা আছে চীনা লিপিতে? উত্তর পেলুম, "সান জেন সেকাইনো হারু।" তার অর্থ? "তিন সহস্র জগৎ বসন্তময়।" তোরিগোএ-সান ব্যাখ্যা করলেন, "আমার মনে যখন বসন্ত আসবে তখন সারা বিশ্বে বসন্ত আসবে। আমার মন যখন পুষ্পিত হবে সারা বিশ্ব পুষ্পিত হবে।"

এই বলে তিনি একটি নক্শা এঁকে দেখালেন। উপরের স্তরে সহজ প্রবৃত্তি। মাঝখানকার স্তরে বুদ্ধি। তলার স্তরে গভীরতম মন। যার নাম গভীরতম মন তারই নাম জগৎ নিজে। তাকেই বলে ধর্মধাতু। সেই হচ্ছে বসন্তকাল। বুদ্ধির স্তর ভেদ করে, সহজ প্রবৃত্তির স্তর ভেদ করে সেইখান থেকে উঠে আসবে পূর্ণ বিকশিত জীবন। চিরন্তন। শান্তিতে ভরপূর। প্রেমে পরিপূর্ণ। তারই ইশারা করছে ওই পট। "সান জেন সেকাইনো হারু।"

চতুর্দশ শতাব্দীর কীর্তি এই মিয়োশিন্‌জি মন্দির ও মঠ। এর অধীনে সাড়ে তিন হাজার মঠমন্দির, সাত হাজার কর্মী, তেরো লাখ শিষ্য। রিন্‌জাই জেনদের এ রকম পনেরোটি ঘাঁটি। তার একটি তেনরিয়ুজি। কোনোটি মিয়োশিন্‌জির মতো গরিষ্ঠ নয়। এখানে একরাত্রি কাটানো কি কম ভাগ্যের কথা! তাও প্রধান পুরোহিতের ঘরে। কিন্তু শুতে যাবার আগে মনে পড়ে গেল যে স্নান করা হয়নি আজ। তা শুনে তোরিগোএ-সান বললেন তাঁর ওখানে চলতে। চললুম তাঁর সঙ্গে য়ুকাতা গায়ে, খড়ম পায়ে, ভিজতে ভিজতে। স্নান তো পথে যেতে যেতেই হয়ে গেল বৃষ্টির জলে। মন্দিরের এলাকা পার হতে বড় কম সময় লাগে না।

ছোট কাঠের বাড়ী। আধুনিক ধরনে তৈরি। সাজসজ্জা নিপুণ হস্তের। তোরিগোএ-সান তাঁর নিপুণিকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর

কিশোরী ও বালিকা দুটি কন্যার সঙ্গেও। তপ্ত জলের কুণ্ডে নিভৃতে অবগাহন করে জাপানী বাথের ভয় ভেঙে গেল আমার। আবার য়ুকাতা পরে ওবি বেঁধে বসবার ঘরে এসে নিচু একটি চৌকো টেবিলের এক ধারে বসলুম মেজের উপর কুশন পেতে। টেবিলের দু'ধারে তোরিগোএ আর তাঁর গৃহিণী। আমার ডান দিকে আর বাঁ দিকে। সামনে কী একটা খাবার।

ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে গিয়ে হাতে করে নিয়ে এলেন ছোট একটি বোতল, তিনটি পানপাত্র। আমাকে অভয় দিলেন যে ওতে অ্যালকোহল নেই। পোর্ট ওয়াইনে অ্যালকোহল নেই কে এ কথা বিশ্বাস করবে! হুঁ, আছে, কিন্তু অতি সামান্য। পড়েছি মোগলের হাতে। পিনা পি'তে হবে সাথে। একবার ঠোঁটে ছুঁইয়ে রাখলুম।

মোগলের কাছে জানতে চাইলুম, জেন সাধনা সম্বন্ধে কী কী বই পড়ব? উত্তর পেলুম, বইটই পড়ে হবে কী! পড়তে চাই তো একঘর বই আছে। কিন্তু পণ্ডশ্রম। চাই অভ্যাস। অভ্যাসে মিলয়ে জেন, পাঠে বহুদূর। ধ্যানে বসতে হয়। ধ্যান করতে হয়। এর পরের প্রশ্ন, তিনি নিজে কতদূর এগিয়েছেন? তাঁর উত্তর, তিনি গত বছর গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের ধারে একদিন আশ্চর্য এক সুগন্ধ পান। জানেন না কোথাকার সুগন্ধ। কিসের সুগন্ধ। সে সুগন্ধ মিলিয়ে যাবার নাম করে না। দিনের পর দিন নাসায় লেগে থাকে। মাসখানেক চলল তার জের। জগৎ সুগন্ধময়।

একটু অন্তরঙ্গ স্বরে সুধালুম, "আপনার ইনিও কি ধ্যান অভ্যাস করেন?"

"আরে না, না। উনি যে খ্রীস্টান।" তোরিগোএ আমাকে চমকে দিলেন। তার পর আমার কবিতার জাপানী অনুবাদ যে কাগজে ছাপা হয়েছিল সে কাগজ আমাকে দিলেন। "পূব আকাশের তারা।" কিয়োতোয় এসে লেখা। হাইকুর মতো সতেরো সিলেবলের কবিতা নয়, তান্‌কার মতো একত্রিশ সিলেবলের কবিতা নয়, জাপানী পদ্ধতিরই নয়, শুধু ছোট।

ওটি একটি মনে রাখবার মতো রাত। প্রাকৃচৈতন্য যুগের ধ্যানীবৌদ্ধ মন্দির। প্রধান পুরোহিতের শয়নকক্ষ। মাদুরে মোড়া মেজের উপর পরিচ্ছন্ন পুরু বিছানা। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় দেয়ালে লম্বমান ভাবচিত্রের পট। "সান জেন সেকাইনো হারু।" তিন সহস্র জগৎ বসন্তবিহ্বল। চোখ মেলে দেখি আর চোখ বুজে ধ্যান করি। আমারও তো জীবনের ধ্রুবপদ ওই।

সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্য সত্ত্বেও নিখিল বিশ্বে চিরবসন্ত। প্রতিকূল সাক্ষ্যই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তাই দিনের বেলা নজরে পড়ে না। রাত্রে যখন শুতে যাই, মাঝরাত্রে যখন ঘুম ভেঙে যায়, আবার যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন চিরন্তনকে আমি যে ভাবে ও যে ভাষায় স্মরণ করি তাকে রসে গলিয়ে নিলে যা হয় তা ওই "সান জেন সেকাইনো হারু।" ফাগুন লেগেছে ভুবনে ভুবনে।

সকালবেলা উঠে দেখি দেরি হয়ে গেছে। আমার শয্যার পাশে আর একটি শয্যা ছিল। সেটি নেই। আমার ছাত্র-প্রদর্শক কাওয়ানামি আমাকে জাগিয়ে দেয়নি, তার সঙ্কোচে বেধেছে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে প্রাতঃকালীন উপাসনা। যেখানে সকলে সমবেত হন। ছেলেটি কখন থেকে তৈরি হয়ে যাই যাই করছিল। আমি তাকে ধরে রাখলুম না। নিজে তৈরি হবার জন্যে সময় নিলুম। ততক্ষণে উপাসনা শেষ।

হায়! হায়! কী হারালুম! যার জন্যে জেন মন্দিরে রাত কাটানো সেই জিনিসটি হলো না। আমাকে পই-পই করে বলে রাখা হয়েছিল যে ভোরবেলা উপাসনা। তবু আমার হোঁশ হয়নি। না। বড়াই করবার মতো মুখ নেই। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মিয়োশিন্‌জিতে একরাত্রি যাপন করেছি, সে আমার ভাগ্য। কিন্তু আমি আমার ভাগ্যের যোগ্য নই।

ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পায়চারি করতে লাগলুম। এক মহল থেকে আরেক মহলে যাবার করিডোর। মাঝখানে উঠোন। বাগান। পাথরের কুণ্ড থেকে হাতা দিয়ে জল তুলে নিয়ে মুখ হাত ধোয়া গেল। একটু পরে তোরিগোএর প্রবেশ। তিনি আমাকে মন্দিরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখালেন। একবার প্রাতরাশের পূর্বে। একবার প্রাতরাশের পরে। প্রাতরাশ দিয়ে গেলেন সাধুরা। তাঁদেরি শ্রীহস্তের রান্না। বিশুদ্ধ স্বদেশী ও নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন। ভাত। সোয়াবীন। সবজি। সবুজ চা। মন্দিরেই উৎপন্ন। সাধুদের শ্রমজাত। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন কিয়োদো। তাঁর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে তিনি বড় বড় ভারী ভারী পাথর ভেঙে নিজের হাতে মন্দিরের ভিতরের রাস্তা বানিয়েছিলেন। বোধ হয় তাঁরই শান্‌বাঁধানো সরণি দিয়ে আমি খটখট করে খড়ম চালিয়েছি। সাধুর পুণ্য না আমার পুণ্য কার পুণ্য হলো কে জানে! গান্ধীজীর মতো জেন গুরুদেরও শিক্ষা ব্রেড লেবার বা অন্ন-শ্রম। অন্য এক মন্দিরের জেন

গুরু হিয়াকুজো বৃদ্ধ হয়েছেন বলে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বাগানে কাজ করার হাতিয়ার লুকিয়ে রাখে। তখন হিয়াকুজো আহার ত্যাগ করে বলেন, "নেই শ্রম তো নেই আহার।"

জেনদের সকালবেলার ধ্যানটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী। আসল ধ্যান সন্ধ্যায়। তিনঘণ্টার মতো। এ ছাড়া মাসে এক সপ্তাহ দিবারাত্র ধ্যান হয়। ধ্যান ছাড়া আর কিছু হয় না সে সময়। আসল ধ্যানের জন্যে আলাদা একটি ঘর আছে। তার নাম জেন্‌দো। সেখানে কিন্তু সকলের প্রবেশ নেই। শুধু প্রথম শ্রেণীর সাধুদের। অন্যেরা মন্দিরে বসে ধ্যান করেন। জেন্‌দোতে যাঁরা প্রবেশ পান তাঁরা ধ্যানাসনে বসেন। আমাদের যেমন যোগাসন। আসনশুদ্ধির উপর ধ্যান নির্ভর করে। কেন্দ্রস্থলে আসন নেন গুরু বা প্রধান। ধ্যানকে তিনি একটা নির্দিষ্ট অবলম্বন দেন। গোটাকতক প্রশ্ন করেন। এই যেমন, "আত্মন্ কী?" "ব্যক্তিগত ধর্ম কী?" "বুদ্ধের বিশুদ্ধ তত্ত্ব কী?" "মানুষের মূলপ্রকৃতি কী?"

এসব প্রশ্নের উত্তর সাধুরা একে একে দেন যে যার অন্তর অন্বেষণ করে। অপরকে স্বমতে আনার জন্যে নয়। কাউকে হার মানাবার জন্যে নয়। সত্যকে আবিষ্কার করার জন্যে। প্রত্যেকের আপনার ভিতরেই আলো জ্বলছে। চেতনা সেই আলোর সন্ধান করছে। সাধুদের উত্তর শুনে গুরু কয়েকটি কথা বলেন। সেসব কথা যুক্তিতর্কের ভাষায় নয়। গুছিয়ে বুঝিয়ে বলা নয়। সাধনায় যাঁরা অনুমগ্ন তাঁরাই অনুধাবন করতে পারেন তার মর্ম। একটা হদিস পাওয়া গেল ভেবে থেমে যান না তাঁরা। বরং আরো উদ্দীপনা পান ব্যক্তিগত প্রয়াসের জন্যে। সে প্রয়াস ইনটুইশন মার্গী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে ইনটুইশন দিয়ে অন্তরে জ্বলতে থাকা আলোর সন্ধান। ধ্যান অন্তর্মুখী। পদ্ধতিটা দ্বান্দ্বিক নয়। নেতি নেতি করে নয়। গুরুবাক্য মেনে নিয়ে নয়। "বিশ্বাসে মিলয়ে সত্য" নয়। চেতনার সঙ্গে আলোকের সংযোগ।

এক-একটি বিষয়ে ধ্যান যে কতকাল ধরে চলে তার ঠিকঠিকানা নেই। সেকালে নান্গাকু বলে একজন সাধক ছিলেন তাঁর নাকি আট বছর লেগেছিল এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করতে: "ও কে আমার দিকে হেঁটে আসছে?" যে সমাধানটা তিনি বহু কষ্টে আয়ত্ত করলেন সেটা এই: "এমন কি যখন

কেউ বলে যে এখানে কিছু আছে তখন সে সমগ্রকে বাদ দেয়।" কোহো বলে আর একজন সাধক ছিলেন। একদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল এই প্রশ্নটির উপরে : "সব জিনিসই ফিরে যায় একের মধ্যে, কিন্তু এই শেষ জিনিসটি ফিরে যায় কোনখানে?" তিনি আহারনিদ্রা ভুলে গেলেন, পূর্ব-পশ্চিম চিনতে পারলেন না, সকালসন্ধ্যার তফাৎ বুঝলেন না। অন্তের অস্তিত্ব পর্যন্ত তাঁর কাছে বিলুপ্ত। শেষে তাঁর মধ্যে এক আকস্মিক জাগরণ ঘটল। তাঁর পূর্ব-গুরুর প্রশ্ন "কে তোমার প্রাণহীন দেহ বহন করছে" তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ঝলসে উঠল। অসীম শূন্য খুলে গেল। আয়নার মতো আর এক জগৎকে তিনি প্রতিফলিত করলেন।

জেনরা যাকে সাতোরি বলেন সে একপ্রকার বিশ্বরূপদর্শন। সহসা দৃষ্টি উন্মীলিত হয়, বিশ্বের অভ্যন্তর পর্যন্ত দেখা যায়। সেইভাবে আত্মদর্শন ঘটে।

নারা ইত্তোবোরি

॥ পনেরো ॥

ভক্তিমার্গী আর ধ্যানমার্গীদের সঙ্গে অল্পস্বল্প পরিচয় হলো। হলো না শক্তিমার্গী বা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সঙ্গে। আমিও চেষ্টা করিনি। তাঁরাও আমার খবর পাননি। তাঁদের বিশ্বাস নিখিল বিশ্ব হলো মহাবৈরোচনের কায়া। প্রত্যেকটি ধূলিকণাও তাঁর কায়ার অঙ্গ, সুতরাং তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের শরিক। মানুষ মাত্রের যেমন কায়া আছে, মন আছে, বাক্য আছে তেমনি প্রাণীমাত্রের অপ্রাণীমাত্রের অণুপরমাণুমাত্রের আছে কায়া, আছে মন, আছে বাক্য। এই তিনটি গুহ্য রহস্য যদি কেউ ভেদ করতে পারে তবে এই জন্মেই বুদ্ধের সঙ্গে এক হবে। এর জন্যে চাই আঙুল দিয়ে তান্ত্রিক মুদ্রাবিন্যাস, মুখ দিয়ে জাদুমন্ত্র উচ্চারণ, চিত্ত দিয়ে ধ্যান। গুহ্যতত্ত্বে দক্ষতা জন্মালে সেই শক্তির অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে দেবদেবীদের আবাহন করে আদায় করতে পারা যায় ধনসম্পদ আরোগ্য প্রচুরবর্ষণ প্রভূতশস্য ও অন্যবিধ পার্থিব কল্যাণ। শিন্‌গন বা তান্ত্রিক বৌদ্ধরা মণ্ডল ব্যবহার করেন। মণ্ডল মানে এক জোড়া বিশ্বচিত্র। বিশ্ব যা হওয়া উচিত। বিশ্ব যা হয়ে উঠছে। আদর্শ বনাম বাস্তব।

সেদিন মিয়োশিন্‌জি থেকে তোরিগোএ-সান আমাকে নিয়ে গেলেন রিয়োআনজি। সেখানে একটি উদ্যান আছে, তাতে গাছপালা নেই, ঘাস আগাছা নেই, উদ্ভিদ্ মাত্রেই নেই। তা হলে আছে কী? আছে বালুকাময় সমতলভূমির পাঁচ জায়গায় পাঁচ পুঞ্জ পাষাণ। পাথরের সংখ্যা পাঁচ, দুই, তিন, দুই, তিন। এর ইংরেজী নাম রক গার্ডন নয়। স্টোন গার্ডন নামটা জাপানী ইংরেজী। আমরা হলে একে উদ্যানই বলতুম না। এ হচ্ছে মানুষের হাতে গড়া সংক্ষিপ্ত সাগরতীর। সাধুদের হাতে গড়া। এখানে বসে তাঁরা অনুভব করেন, সম্মুখে শান্তিপারাবার। আর ওই যে পাথরগুলি ওগুলির আকৃতি নাকি আপনা থেকে বদলায়। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে রূপেরও নাকি বদল হয়। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলে বিভ্রমও লাগে যে ওরা সচল। ওই যে বাঘ তার বাচ্চাকে নিয়ে পার হচ্ছে। মিয়োশিনজির প্রখ্যাত উদ্যানের মতো এটিও ধ্যানী বৌদ্ধদের ধ্যানের আনুষঙ্গিক। তাঁদের ধ্যান কেবল আসন করে নয়, ঘোড়ার পিঠে বা তুলি হাতে বা খুরপি কোদাল কাঁচি নিয়ে।

এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এক সন্ন্যাসিনীর দেওয়া চা সেবা ও পিষ্টক আস্বাদন করা গেল। জাপানে একবার সন্ন্যাসিনী হলে আর বিবাহ করতে পারা যায় না। অথচ সন্ন্যাসী হয়েও বিবাহ করা যায়, সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দেওয়া যায়। এটা মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের না হোক জাপানী বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব।

তোরিগোএ-সান আমাকে রিয়ুকোকু বিশ্ববিত্তালয়ে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন। ভারত প্রসঙ্গে আমার বক্তৃতা। তার পর প্রেসিডেণ্ট মোরিকাওয়া ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়া। ল্যাকারের পাত্রে পরিবেশিত অন্নব্যঞ্জনে চপস্টিক লাগিয়ে মুখের গ্রাস মুখে তুলব এমন সময় কানে এলো, "কাঁচা মাছ।"

কাঁচা মাছ খেয়েছেন? খাননি। আমিও খাব না বলে পণ করেছিলুম। কাঁচা মাছ? কক্ষনো না। কাঁচা মাছ? কভি নেহি। কাঁচা মাছ? নেভার। এগারো দিন পণরক্ষার পর বারো দিনের দিন আমি পড়ে গেলুম সঙ্কটে। জাপানীরা সত্ত-ধরা তাজা মাছ স্যালাডের মতো কাঁচা খায় সোয়া সস্ সহযোগে। একে বলে সাশিমি। ভাতের সঙ্গে ডেলা পাকিয়ে খেলে তাকে বলে সুশি। আঁশটে গন্ধ থাকে না। আপনি কী করে টের পাবেন যে ওটা মাছ? দেখতে স্যালাডের মতো। ধরে নিন একরকম স্যালাড। মনে করুন সেলেরি। মাছ বলে নাই বা জানলেন। বলে না দিলে আমিও কি জানতুম!

একটুখানি মুখে দিয়ে আস্বাদন করলুম। আঁশটে বা পচা গন্ধ নেই। নাক বিমুখ নয়। জিবকে সোয়া সস্ ঘুষ দিলে সেও তোলে। যেখানে নীতির প্রশ্ন নয়, রুচির প্রশ্ন, সেখানে বিবেকেও বাধে না। মাছ খাব অথচ কাঁচা মাছ খাব না, এর মধ্যে বিবেককে টেনে আনা কেন? জার্মানরা তো শুনেছি কাঁচা মাংসও খায়। আধসিদ্ধ আধকাঁচা মাংস খেতে ইংরেজরাও পারে। তার পর কাঁচা হলেও জীবন্ত তো নয়। পশ্চিমের শৌখীনরা যে জ্যান্ত অয়স্টারকে আস্ত গিলে খায় তার বেলা? কাঁচা "তাই" মাছ কিন্তু সে পর্যায়ে পড়ে না।

যাক। আমার সংস্কার সায় দেয়নি। একটুখানি মুখে দিয়েই আমি সহভোজীদের মুখ রক্ষা করেছি। দ্বিতীয়বার ও রকম সঙ্কটে পড়তে হয়নি। তবে জোর করে বলতে পারব না যে সুশিয়াতে পরে একদিন যা দিয়েছিল

তাতে কাঁচা মাছ মেশানো ছিল না। পদে পদে জাত বাঁচাতে গেলে দেশ দেখা হতে পারে, কিন্তু জাতির জীবন দেখা হয় না। আর জাপানের জাতীয় জীবনে হুশিয়ার মাছভাত আমাদের ডালভাতের মতো।

রিয়ুকোকু বিশ্ববিদ্যালয় হলো নিশি হোঙ্গানজি মন্দিরের বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন ওতানী বিশ্ববিদ্যালয় হলো হিগাশি হোঙ্গানজি মন্দিরের। এক কালে একটাই হোঙ্গানজি ছিল। মোহন্ত মহারাজ তাঁর ছোট ছেলেকে গদি দিয়ে যাওয়ায় বড় ছেলের দলবল আলাদা হয়ে যায়। আলাদা গদির নাম হয় হিগাশি। যেহেতু সেটা পূব দিকে। তখন পুরোনো গদির নাম হয় নিশি। যেহেতু সেটা পশ্চিম দিকে। জাপানে মন্দির পুড়ে যাওয়া, সরে যাওয়া লেগেই থাকে। নিশি হোঙ্গানজির বর্তমান মন্দিরের স্থাপনা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। যে জমিখানার উপর অবস্থান সেখানা ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান পুরুষ হিদেয়োশির দান। চাষীর ছেলে থেকে সামুরাই আরো কেউ কেউ হয়েছিলেন, কিন্তু হিদেয়োশির মতো সর্বেসর্বা আর একজনও না। এই মহাসেনাপতি তথা মহামন্ত্রীর অনুগ্রহে ভূমিলাভ, তাই এঁকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে মন্দিরের বড় একটি হল ঘরে ও মন্দিরসংলগ্ন চা অনুষ্ঠান গৃহে।

"এইখানে বসে হিদেয়োশি মন্ত্রণা করতেন।" "এইখানে বসে তিনি চা পান করতেন।" পুনঃপুনঃ এরূপ উক্তি শুনে আমার ধারণা জন্মেছিল যে মহাপুরুষ তা হলে মন্দিরের জন্যে জমি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, নির্মাণের পর এই স্থলে এসে মন্ত্রণা করতেন, এই স্থানে বসে চা সেবা করতেন। তা নয়। স্বকীয় প্রাসাদে বসে তিনি মন্ত্রণা করতেন, সপার্ষদে চা অনুষ্ঠান করতেন। সে প্রাসাদের নাম ফুশিমি প্রাসাদ বা দুর্গ। কিয়োতোর দক্ষিণে মোমোয়ামা অঞ্চলে ছিল এর স্থিতি। সেইখান থেকে শহরের মধ্যভাগে শিমোগিয়ো অঞ্চলে উঠিয়ে আনা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাগার আর চা অনুষ্ঠান গৃহ। গন্ধমাদন উত্তোলনের মতো।

চা-গৃহটি শাদাসিধে। পাঁচজনের বসবার মতো। সুতরাং ছোট। কিন্তু মন্ত্রণাকক্ষটি যেমন বিশাল তেমনি জমকালো। জাপানে তো আয়তন পরিমাপ করা হয় মাদুরের সংখ্যা দিয়ে। এটি হলো আড়াই শ' মাদুরি ঘর। মাদুরের আকার ছ' ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া। তা হলে অঙ্ক কষে বুঝুন কত বড়। এত বড় একটি ঘরের সমতল ছাদকে মাথায় করে রাখার জন্যে অনেকগুলো

থাম। তাতে ল্যাকারের কাজ। একরাশ সরস্ত কপাট বা ফুসুমা। তাতে সেই মোমোয়ামা যুগের কানো কলমের চিত্রকরদের আঁকা ফুল, পাখী, মেঘ, ঢেউ প্রভৃতি। রঙের বাহার আর জোরালো তুলির টান হলো কানো কলমের চিত্রকরদের বৈশিষ্ট্য। কানো নামের চিত্রকর ছিলেন দু'জন। কানো এইতোকু। কানো সানরাকু। তাঁদের নামে নামকরণ হলেও অপর কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিত্রীকেও এই কলমের চিত্রী বলা হয়।

এসব ছবিকে বলে ফুসুমা ছবি। এমনি সব ছবি শুধু একখানি কক্ষে নয়। মন্দিরের অন্যান্য কক্ষেও। এক-একটি কক্ষের এক-একটি নাম। একটির নাম চন্দ্রমল্লিকা কক্ষ। তা বলে সে ঘরে কেবল যে চন্দ্রমল্লিকারই ছবি আছে তা নয়। আছে রকমারি ছবি, কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে চন্দ্রমল্লিকা। তেমনি আর একটি কক্ষের নাম অরণ্যমরাল কক্ষ। ঘরের পর ঘর দেখতে হলে দিনের পর দিন দিতে হয়। আমার কি অত সময় আছে? এক জায়গায় মেরামতের কাজ চলেছে দেখে জানতে চাইলুম, খরচ জোগাচ্ছে কে? জবাব পেলুম, গৌরীসেন দিচ্ছেন শতকরা পঁচানব্বই ভাগ। কেন? কারণ এ যে "জাতীয় সম্পদ"!

আমাদের যেমন প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণ আইন জাপানেরও তেমনি একটি আইন আছে। সেই অনুসারে প্রাচীন কীর্তিকে "জাতীয় সম্পদ" বলে গণ্য করা হয় ও তার মালিকদের অর্থসাহায্য করা হয়, যাতে "জাতীয় সম্পদ" সুরক্ষিত হয়। কয়েক বছর আগে আইনের সংশোধন হয়েছে, তার ফলে "জাতীয় সম্পদে"র সংজ্ঞা আরো ব্যাপক হয়েছে। ধরুন, নো নাটক যখন জাপানের সাংস্কৃতিক সম্পদ তখন তার ধারক ও বাহক যেসব অভিনেতা ও বাদক তাঁরাও কেন সাংস্কৃতিক সম্পদ হবেন না? যাকে রাখ সে-ই রাখে। তাঁরা না বাঁচলে কি নো নাটক বাঁচবে? নো নাটকের মতো রক্ষণযোগ্য জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ নাকি আছে এক শ' বারো প্রকার। যাঁরা আছেন বলে এইসব লোক-কলা আছে তাঁদের একটা আজব কোঠায় ফেলা হয়েছে। তাঁরা হলেন **"Intangible Cultural Properties"**এর শামিল **"Human National Treasures."** এইসব রত্নের রক্ষণের জন্যে গৌরীসেনের তহবিল থেকে টাকা আসে।

সব সময়ই চায়ের সময় জাপানে। ভাত খেতে বসেও লোকে চা

খায়। জাপানী সবুজ চা। নিশি হোঙ্গানজিতে চা সেবা করা গেল সপার্ষদে। হিদেয়োশির মতো সপার্ষদে বলব না। সারি বেঁধে মেজেতে বসে। দেখলুম পুকুরপাড়ে চা গাছ গজিয়েছে। মন্দিরের লোককে চায়ের জন্যে চা-বাগানে বা চা-দোকানে যেতে হয় না। শুনেছি বসন্তকালের সাতাত্তর দিনের চা পাতা তত কড়া নয় বলে অতিথির জন্যে তুলে শুকিয়ে টিনবন্দী করা হয়। পরবর্তী ঋতুর চা-পাতা নিজেদের ভোগে লাগে।

এর পর মেয়েদের কলেজে গিয়ে দেখি কলেজ, স্কুল আর শিশুবিভাগ তিন মিলে প্রতিষ্ঠান। একটি ঘরে পিআনো বাজিয়ে গান শেখানো হচ্ছে স্কুলের মেয়েদের। গানটা জাপানী, সুরটা পশ্চিমী। শেখাচ্ছেন জাপানী মহিলা। পাশ্চাত্য পোশাক। আর এক জায়গায় আরো গোটা কয়েক পিআনো পিটিয়ে চলেছে আরো বড় বড় মেয়েরা। পশ্চিমী সুর। পশ্চিমী গান। এসব পিআনোর দাম বেশী নয়। ওসাকায় তৈরী কটেজ পিআনো।

তার পর ছেলেদের হাই স্কুল। আগের দুটি প্রতিষ্ঠানের মতো এটিও সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধ। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এর অঙ্গে লেখা নেই, আধুনিকতাই সর্বাঙ্গে। কুস্তির আখড়ায় গিয়ে জুদো দেখলুম। বাহুবলের জিৎ হবে বলে ধরে নিলে ভুল করবেন। জিৎ হবে আকস্মিক কৌশলের। যে লোকটা আক্রমণ করে সেই লোকটাই ভূমিসাৎ হয়। মেজেটা এমন করে বানিয়েছে যে আছাড় খেলেও গায়ে লাগে না। ওরকম একটা মেজে না হলে ও-রকম একটি বিদ্যা শেখানো যায় না। নইলে আছাড়ের ভয়ে ছেলেরা ভাগবে।

সন্ধ্যায় প্রিন্সিপাল ফুজিওয়ারার আমন্ত্রণে রেস্টোরাণ্টে গিয়ে জাপানী ধরনের ভোজনকক্ষ অধিকার করে সবান্ধবে চার দিক ঘিরে মাদুরের উপর বসা। পাশ্চাত্য পোশাকের ক্রীজ মাটি। হলো না কেবল একজনের। তিনি বিশিষ্ট আর্ট ক্রিটিক রিয়ুগেন ওগাওয়া। ইনি কিমোনো পরে এসেছিলেন আমারি খাতিরে। তাই পরের দিন আমিও শেরোয়ানি পরি এঁরই খাতিরে। তখন এঁর কী আনন্দ! কিন্তু পরের দিনের কথা পরে।

রেস্টোরাণ্ট থেকে বেরিয়ে শুনি তোদো মহাশয়ের বাড়ী অদূরে। পায়ে হেঁটে যেতে যেতে একসময় লক্ষ করি তোদো হাঁটছেন জোর কদমে। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বিব্‌লি। হঠাৎ এই ম্যারাথন হণ্টনের তাৎপর্য? এর

জবাব একটি কথায়। "গিওন"। তখন আমারও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হলো। বড় রাস্তা থেকে ছোট ছোট গলি বেরিয়ে সোজা চলে গেছে পরীর রাজ্যে। এ জগৎ থেকে রূপকথার জগতে। পথিককে পরীতে ধরে নিয়ে যায়।

তোদো মহাশয়ের বাড়ী পা দিতেই আইডম্যানের গাড়ী এসে তুলে নিয়ে গেল তাঁর বাড়ী। সেখানে রাত্রিবাস। তার আগে জাপানী বাথ। কেমন করে তার আয়োজন হয় সেটা এত দিনে জানলুম। নিচে আগুন জ্বলে। জ্বাল দিয়ে তপ্ত করা হয় স্নানের জল। যাতে তপ্ত করা হয় সেটা গোলাকার একটা কুণ্ড। নিচের আগুন উপর থেকে দেখা যায় না। যথাকালে নিবিয়ে দেয়। সেই তপ্ত জলের কুণ্ডে প্রবেশ করার আগে শীতল জলে সাবান মেখে গা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে সাফ-সুতরো হতে হয়। তেল মাখা বারণ। কাপড় পরা বারণ। আমি বসে থাকতে আর কেউ ঢুকতে পারেন। সুতরাং তাঁর খাতিরে জলটাকে নির্মল রাখতে হবে। এ বাড়ীতে সে ভয় ছিল না বলে আমি স্থির হয়ে জলে পড়ে থাকতে পারতুম, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তখনো আগুন জ্বলছে আর আমি ডাইনীবুড়ির তপ্তকটাহে সিদ্ধ হচ্ছি। তাই অস্থির হয়ে একবার নামি, আবার ঢুকি, ঠাণ্ডা জল মেশানোর উপায় খুঁজি, ব্যর্থ হই, পালাই।

কাগজে পড়েছিলুম আটাশ হাজার জাপানী মেয়ে মার্কিন বিয়ে করেছে। সেদিন আইডম্যানের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হলো। ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো। পরে আরো অনুসন্ধান করেছি। বিয়ের আইনে বাধা নেই, কিন্তু ন্যাশনালিটির আইনে বাধা। মার্কিন বিয়ে করলেই সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন প্রজা হওয়া যায় না। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যেতে হলে জাপানী প্রজারূপেই যেতে হয়। তার মানে জাপানী পাশপোর্ট নিয়ে। জাপানী কর্তারা কিন্তু পাশপোর্টে লিখবেন না যে মেয়েটি বিবাহিতা। তাঁদেরি দেশে তাঁদেরি আইন বলছে বিবাহিতা, তবু পাশপোর্টের বেলা কুমারী। কেন এই অসঙ্গতি বা অন্ধতা ?

ব্যাপারটার নিদান মধ্যযুগের নিয়ম। ছেলেমেয়ে জন্মালেই পুলিশ নবজাতকের নামে একটি নথি খোলে। সে যদি আশি বছর বাঁচে তবে আশি বছর ধরে তার পাপপুণ্যের খবর টোকা হয়। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তার নথি বাপের বাড়ীর থানা থেকে শ্বশুরবাড়ীর থানায় বদলি হয়।

তখন থেকে নথি রাখে শ্বশুরবাড়ীর থানাদার। মেয়ে যদি মার্কিন বিয়ে করে সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন প্রজা বনে যেত তা হলে তার নথি সেইখানেই শেষ হতো, কিন্তু সে যখন জাপানী প্রজাই রয়ে যাচ্ছে তখন তার বাপের বাড়ীর থানাদার কার কাছে পাঠাবে তার নথি? শ্বশুরবাড়ী তো জাপানের অধীন নয়। তবে কি নথি সেইখানেই শেষ হয়ে যাবে? তা তো নিয়ম নয়। তাদের দেশের পদে পদে নিয়ম। বিদেশীর সঙ্গে তাসবংশের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বলে চিত্রগুপ্তের দপ্তর থেকে নাম কেটে দিতে হবে? উঁহু! চিত্রগুপ্তের চোখে ও মেয়ে কুমারী।

পরের দিন আইডম্যানের বাড়ী থেকে বিদায় নিচ্ছি এমন সময় তিনি বললেন, "যাবার আগে কুকুরটিকে দেখে যান।" হঠাৎ কেন ইচ্ছা হেন? "কাম্বগাইর মেয়ে আসাকাকে বলবেন তার ছেড়ে-যাওয়া কুকুরছানাটি এখন কত বড় হয়েছে, কেমন আছে।" সানন্দে। কুকুর কিন্তু আমাকে দর্শন দিতে চায় না। ঘেউ ঘেউ করে। তাড়া করে আসে।

এলুম ফিরে তোদো মহাশয়ের বাড়ী। মনে পড়ছিল আইডম্যানের একটি উক্তি। জাপানীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের কোনো য়্যাফিনিটি নেই। অপর পক্ষে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রচুর য়্যাফিনিটি আছে। কথাটা কি সত্যি? কথাটা কি সত্যি নয়? বিপরীতের প্রতি বিপরীতের যে আকর্ষণ তাকে য়্যাফিনিটি বলা চলে না। জাপানীদের প্রতি পাশ্চাত্যদের ও পাশ্চাত্যদের প্রতি জাপানীদের আকর্ষণ বিপরীতের প্রতি বিপরীতের। ইংরেজেরা ও আমরা বিভিন্ন, কিন্তু বিপরীত নই। বিভিন্নতা সত্ত্বেও বহু বিষয়ে অন্তঃসাদৃশ্য আছে।

তোদো আমাকে নিয়ে গেলেন পার্শ্ববর্তী চিওঁইন মন্দিরে। কিয়োতোর বৃহত্তম, জাপানের অন্যতম বৃহত্তম মন্দির ও মঠ। ছত্রিশ একর জমি জুড়ে। পাহাড়ের ঢালু দিকে। আস্তে আস্তে উঠতে হয়। ধাপে ধাপে। জোদো সম্প্রদায়ের যখন এত রকম ভাগ-বিভাগ ছিল না তখন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অধিকাংশ বাড়ী উঠেছে সপ্তদশ শতাব্দীতে। জোদোর বিশেষত্ব সন্ত হোনেনের শিক্ষা। অমিতাভ বুদ্ধের উপাসনা তাঁর পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল, সুতরাং যাত্রীরা মন্দিরে আসে বুদ্ধবিগ্রহের টানে ততটা নয়, যতটা সন্তমূর্তির টানে। বুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে হোনেন-মূর্তির কাছেই জনসমাগম বেশী।

সন্ত হোনেনকে ভক্তি না করে পারা যায় না। এমন অপূর্ব মুখশ্রী, এমন অকপট সাধুতা ও করুণা! একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, "জাপানীর হিয়া অমিয়া মথিয়া হোনেন ধরেছে কায়া।" জাপানের সামরিক দিকটাই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু চাঁদের উলটো পিঠের মতো তার জীবে দয়া, নামে রুচি, পাপীতাপী ও দীনহীনের জন্যে দরদ। গেইশাদের অনেকেই বিপন্ন পিতামাতা ও ভ্রাতাভগিনীর দুঃখমোচনের জন্যে দেহবিক্রয় করে। এ যেন পরহিতে প্রাণদান। নীতিবোধ সায় দেয় না, তাই পাপকে ঘৃণা করতে হয়, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করতে মন ওঠে না। তাকে তার উদ্ধারের উপায় বলতে হয়। জোদো হলো সর্বশ্রেণীর সব অবস্থার লোকের ত্রাণমার্গ।

হোনেন তাঁর দেহত্যাগের কিছু আগে এক তা কাগজে তাঁর অন্তিম বাণী লিপিবদ্ধ রেখে যান। তাতে তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে ধ্যানমার্গ বা জ্ঞানমার্গ তাঁর বা তাঁর শিষ্যদের মার্গ নয়। অমিতাভ বুদ্ধ তাঁর পশ্চিম স্বর্গের নির্মল ভূমিতে তাঁদের ঠাঁই দেবেন এই যে বিশ্বাস এই তাঁদের ত্রাণের নিশ্চিতি। অভ্যাস বলতে একটিই যথেষ্ট। ভক্তিভরে নামজপ। যাঁরা বিস্তর পড়াশুনা করে শাস্ত্রী হয়েছেন তাঁরা যেন নিজেদের অজ্ঞ বলেই বিবেচনা করেন। অশিক্ষিতরা যেমন তাঁরাও তেমনি। একই বিশ্বাস সবাইকে সমান করেছে। সে বিশ্বাস অমিতাভ বুদ্ধের কারুণিকতায় বিশ্বাস। যাদের তত্ত্বজ্ঞান নেই তাদের সঙ্গে এক হয়ে বিজ্ঞজনের মতো ধ্যানধারণার পরোয়া না রেখে হৃদয় ঢেলে দিতে হবে অমিতাভ-নামকীর্তনে।

অধ্যাপক কাসুগাই এই সন্তবাণীকে সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর রোমক লিপিতে লেখা সংস্কৃত আমাকে পড়তে দিয়েছেন। আমি বাংলা লিপিতে অন্তরিত করে কতক অংশ নিচে তুলে দিচ্ছি। ভুল থাকলে আমারি ভুল।

"ত্রীণি চিত্তানি চতস্রো ভাবনা ইতি মতে সতি অপি নিয়তং নমো অমিতবুদ্ধায়েতি অনেন উপপংস্য ইতি মননে সর্বং পরিগৃহীতম্ অস্তি এব। ইতোঽপি যদি গম্ভীরতরং মতম্ অবগচ্ছামি, (তদা) দ্বয়োর্ ভগবতোঃ করুণায়া পতিতঃ পূর্বপ্রণিধানাৎ পরিভ্রষ্টঃ চ ভবিষ্যামি, বুদ্ধানুস্মৃতিং শ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ভগবতো ধর্মং সুনিপুণং শিক্ষয়ন্তোঽপি অক্ষরানভিজ্ঞামুধায়মনঃ সন্তাঃ,

অজ্ঞানবহুলভিঃ ভিক্ষুণীভিঃ ভিক্ষুভির্ বা সমানাঃ জ্ঞানী বাচরণমনাচরন্তো ভবেয়ুঃ ইতীয়ম্ এবাকান্ততো বুদ্ধানুস্মৃতিঃ।"

ওদিকে কিন্তু ধ্যানী বৌদ্ধ বা জেনপন্থীদের পরকালে বিশ্বাস নেই। স্বর্গ আবার কী! স্বর্গ হচ্ছে এই জগৎটাই। স্বর্গেই আমরা রয়েছি। যেহেতু এইখানেই পাওয়া যায় বুদ্ধের অন্তঃসার। আর কোনো পরলোক নেই। এর পরে বা এর বাইরে কিছু থাকতে পারে সে ভরসা নেই। বুদ্ধের জীবনটাই সর্ব জীবের জীবন। মৃত্যু হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বুদ্ধশরীরে প্রত্যাবর্তন। বুদ্ধ যেমন স্থিতিশীল তেমনি গতিশীল। সর্বক্ষণ তাঁর সৃষ্টি-ক্রিয়া চলেছে, কল্যাণকর্ম চলেছে। জীবন বিচিত্ররূপে বিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন তো তাঁরই জীবনের রূপরূপান্তর, তাঁরই ক্রিয়াতৎপর জীবন। নিজেদের স্বতন্ত্র ভেবে স্বর্গের কল্পনায় অমিতাভ বুদ্ধের নামকীর্তন করতে জেনদের বাধে। একই বৌদ্ধধর্ম। অথচ উত্তরমেরুর সঙ্গে দক্ষিণমেরুর মতো বৈপরীত্য। দ্বৈতবাদ বনাম অদ্বৈতবাদ। ইহলোক-পরলোক বনাম একই লোক।

বৌদ্ধমন্দিরে প্রার্থনা সব সময় করা যায়, রাত্রে যতক্ষণ না মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হয়। উপদেশ দিনের মধ্যে কয়েকবার দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সূত্র পাঠ করা হয়। বাতি জ্বলতে থাকে অষ্টপ্রহর। ধূপ জ্বলতে থাকে অনবরত। ফুল দিয়ে যায় লোকে। দক্ষিণা রেখে যায় পাত্রে। ঘুরে দেখতে দেখতে সাধ গেল মোকুগিয়ো বাজাতে। ঠক ঠক ঠক ঠক। কিন্তু উচ্চারণ করতে সাহস হলো না, নমু অমিদা বুৎসু, নমু অমিদা বুৎসু।

প্রধান পুরোহিত শিন্‌কো কিশি মহাশয়ের দর্শন লাভ হলো। ভারত সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হলো। কেমন করে তাঁর ধারণা জন্মেছে বর্তমান ভারতেও বৌদ্ধরা নিপীড়িত। তাঁকে ভেবে দেখতে বললুম, সারনাথের ধর্মচক্র যাদের জাতীয় পতাকায় প্রবর্তিত হয়েছে, অশোকের সিংহচতুষ্টয় যাদের রাষ্ট্রীয় লাঞ্ছন হয়েছে, তারা কি বৌদ্ধদের কম ভালোবাসে না বেশী ভালোবাসে? যারা স্বেচ্ছায় আড়াই হাজার বছর পরে বুদ্ধজয়ন্তীর অনুষ্ঠান করেছে তারা কি বুদ্ধকে কম ভালোবাসে না বেশী ভালোবাসে? এই যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু একদিনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিল, অন্যান্য হিন্দুরা বাধা

দিল না, এ কি বিদ্বেষের পরিচয় বহন করে? না ঔদার্যের? প্রধান পুরোহিত আশ্বস্ত হলেন।

তবে দেশে ফিরে যা শুনেছি তাতে আমি নিজে আশ্বস্ত হইনি। যারা বৌদ্ধ হয়েছে তারা গ্রামের লোকের চোখে সেই হরিজনই রয়ে গেছে, বৌদ্ধ বলে নতুন কোনো মর্যাদা পায়নি। তাদের কাছে মর্যাদার প্রশ্নটাই বড়। যার জন্যে তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। সে প্রশ্নের উত্তর রাষ্ট্র দিতে পারে না। দিতে পারে গ্রাম। গ্রামবাসী সাধারণ। তার দেরি আছে। অথচ আর দেরি তাদের সইবে না। তারা যে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে এসেছে। জাতের নিপীড়নকে তারা ধর্মের নিপীড়ন বলে আর্তনাদ করবেই, সে নাদ বৌদ্ধ দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনি তুলবেই। ভারতের নাম খারাপ হবেই। "আপার্টহাইড্" কি শুধু দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে?

মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে করিডোর দিয়ে যাচ্ছি। অকস্মাৎ গান গেয়ে উঠল জাপানী বুলবুল উগিউস্থ। কোথায় পাখী? কোথাও নেই। মেজে এমন কৌশলে তৈরি করা হয়েছে যে তার উপর দিয়ে হেঁটে গেলেই বুলবুল গেয়ে চলে সঙ্গে সঙ্গে। এটা চিওঁইন মন্দিরের বিশেষত্ব। সেই সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। আর চিওঁইন মন্দিরের ঘণ্টা হলো অপর বিশেষত্ব। তার কথা আগে বলেছি। ঘণ্টা প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, ঘণ্টা কেবল সময় জানাবার জন্যে নয়। ঘণ্টা বলে, "মন্দ থেকে ভালোয় ফিরে চল। দুঃখকে সুখে পরিণত কর। অজ্ঞতার সুপ্তি থেকে প্রজ্ঞার আলোকে জাগরিত হও।" বলে যায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কিবা রাত্রি কিবা দিন।

মধ্যাহ্নভোজনের পর যাই বুক্কো সেণ্টার বলে বৌদ্ধ ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানে। সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলি। সেখানে আমার সঙ্গে মিলিত হলেন আর্ট ক্রিটিক রিয়ুগেন ওগাওয়া মহাশয়। আমাকে নিয়ে গেলেন যাঁর সকাশে তিনি কিয়োতোর তথা জাপানের প্রসিদ্ধ শিল্পী। চীনামাটির কারিগর বা জাদুকর। কানজিরো কাওয়াই।

এই একজন মনের মানুষ। কী সেন্সিটিভ চেহারা ও হাত! ইনি যে আর্টিস্ট তা কি কেবল চেহারায় ও হাতে! তা এঁর চেতনায় ও ধ্যানে। কিমোনো-পরা সহজ মানুষটি। বাড়ীতে বসেই কাজ করেন। ইংরেজী বলতে পারেন না, জাপানী বলেন মিষ্টি করে। চা

খাওয়ালেন, কাজ দেখালেন, উপহার দিলেন একটি অপরূপ ছাইদানী। অতি মূল্যবান।

কাছেই এক রাকুয়াকির দোকান। চীনামাটির পিরিচ চিত্রিত করা হয়। কাঁচা থাকতে এক পিঠে বা দু'পিঠে ছবি আঁকতে বা নাম লিখতে পারা যায়। তুলি আর রং ওরাই যোগায়। যার যে রং খুশি। পরে পুড়িয়ে গ্লেজ করে আধ ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারি দেয়। অবিকল সেই নক্‌শা, সেই রং। আমি কয়েকটিতে আমার হাতের কাজ দেখে চমৎকৃত হলুম।

তার পর তোদো মহাশয়ের বাড়ীতে নিশিযাপন। জাপানী বাথ। নিদ্রা। নিদ্রাভঙ্গ। চোদ্দই সেপ্টেম্বর সকালে ওসাকা যাত্রা।

আওমোরি হাচিমান-গোমা

॥ ষোলো ॥

কিয়োতো থেকে ওসাকা যেতে রেলপথে লাগে এক ঘণ্টারও কম। আর মানসপথে? হয়তো এক শতাব্দীরও বেশী। ওসাকা হচ্ছে তোকিয়োর চেয়েও আধুনিক। কিয়োতোর তুলনায় অত্যাধুনিক। কিয়োতো থেকে ওসাকা যেন প্যারিস থেকে নিউইয়র্ক।

বৃহৎ রেলস্টেশন। একান্ত মডার্ন। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন বুন্কো য়োকোয়ামা, বৌদ্ধ সাধু। আর হ্যারি শেপ্‌হার্ড, মার্কিন অধ্যাপক। আমার ছাত্র-প্রদর্শক হোজুন কিকুচি বা আমি তাঁদের চিনতুম না। তাঁরাও চিনতেন না আমাদের। কিন্তু বর্ণনা তো জানা ছিল। চিনতে দেরি হলো না। তখন আমরা সবাই মিলে চললুম সোজেন্‌জি মন্দিরে। ভূমিকম্পকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আকাশের দিকে তর্জনী বাড়িয়েছে কত যে মার্কিনতর ইমারত। ছোটখাটো স্কাইস্ক্রেপার। ওদিকে রাজপথ বলছে, আমায় ছাখ। আমার নাম বুলভার। ফরাসী আখ্যা। তার পর ক্যানাল বলছে, আমায় ছাখ, আমি ভেনিস না হই আমস্টারডাম তো হতে পারি।

বিশ বার বোমাবর্ষণে নাকি শহরের শরীরে আর পদার্থ ছিল না। এখন এমন চেকনাই হয়েছে যে বোমাবর্ষণের কোনো চিহ্নই নেই। আধুনিকতার এইটেই আসল কারণ। পুরাতন ধ্বংস হয়েছে বলেই তার জায়গায় নতুনকে আনতে হয়েছে। আনকোরা নতুন। আমেরিকার পক্ষেও নতুন। ওসাকা শহর জাপানের প্রাচীনতম শহরগুলোর তালিকায় পড়ে। আবার আধুনিকতমদের পর্যায়েও পড়ে। কী করে এটা সম্ভব হলো? তার উত্তর ওসাকার শিল্পবাণিজ্য ও সমুদ্রবন্দর। একইকালে দু'লাখ টন মালবাহী জাহাজ এই বন্দরে মাল খালাস ও মাল বোঝাই করে। এই শহরে পঁচাশি হাজার স্টোর আছে। বড় বড় ডিপার্টমেণ্ট স্টোরগুলো তোকিয়োকেও হার মানায়। তাদের ছাদগুলো এত বড় যে সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের প্লেগ্রাউণ্ড। শহরে ও তার আশেপাশে ত্রিশ হাজার ছোট বড় কারখানা। বেশীর ভাগই কাপড়ের।

ওসাকায় কি আমি এইসব দেখতে এসেছি নাকি? না। এসেছি আমি বুনরাকু বা পুতুলের থিয়েটার দেখতে। ওসাকা ভিন্ন আর কোথাও নিয়মিত

অভিনয় হয় না, যখন ইচ্ছা দেখা যায় না। কিন্তু আমার বন্ধুরা আমাকে সোজা সেখানে নিয়ে গেলেন না। প্রথমে নিমন্ত্রণ ছিল সোজেন্‌জি নামক ধ্যানীবৌদ্ধ মন্দিরে। সেখানে চা অনুষ্ঠান। তার পর নিপ্পন জীবনবীমা কোম্পানীর আফিসে। সেখানে বক্তৃতা।

ওসাকার আধুনিক অঞ্চল দিয়ে যেতে হলো পুরাতন অঞ্চলে। যেখানে সোজেন্‌জি মন্দির। অপেক্ষা করছিলেন, অভ্যর্থনা করলেন প্রধান পুরোহিত সোগাকু নিশিওকা মহাশয়। তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গেও পরিচয় হলো। পুত্রের সঙ্গেও। মন্দিরটি বড় ছিল। বোমার মারে বেশীর ভাগ নেই। অনেক দিনের পুরোনো মন্দির। জাপানের আদি খ্রীস্টানদের একজনের—এক গভর্নরের—কবর আছে এর বাগানে।

জেন পন্থের তিন শাখা। রিন্‌জাই, সোতো, ওবাকু। এদের মধ্যে রিন্‌জাই সব চেয়ে পুরোনো, আর সোতো সব চেয়ে জনপ্রিয়। ওসাকার সোজেন্‌জি সোতো সম্প্রদায়ের মন্দির। রিন্‌জাই জেনরা পুঁথিগত জ্ঞানকে গুরুত্ব দেন না। সোতো জেনরা মনে করেন তারও মূল্য আছে, তাতে ধ্যানের সহায়তা। রিন্‌জাইদের বোধিলাভ হঠাৎ একদিন ঘটে। মন এক নিমেষে আলো হয়ে যায়। সোতোদের বোধি ক্রমে ক্রমে মেলে। মন একটু একটু করে আলোকিত হয়। ওবাকুদের খবর আমার জানা নেই।

সেদিন পৌঁছতে না পৌঁছতে অমনি চা অনুষ্ঠান। সত্যিকার চা অনুষ্ঠান প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে। আমার জন্যেও সেই রকম ঠিক ছিল। তাই যদি হলো তবে বুনরাকু দেখব কখন? ওসাকা ঘুরব কখন? সন্ধ্যাবেলা কিয়োতো ফিরে আসব কী করে? তাই অনুষ্ঠানটা সংক্ষেপিত হলো। আমি প্রধান অতিথি। আমাকে বসানো হলো তোকোনামার সব চেয়ে কাছে। তোকোনামা? তোকোনামার মতো আমাদের দেশে কিছু নেই, তুলনা দিয়ে বোঝানো শক্ত। জাপানী গৃহস্থের বাড়ীতে বা সরাইতে প্রধান বৈঠকখানার এক কোণে মেজেটা একটু উঁচু হয় আর দেয়ালটা একটু পেছিয়ে যায়। দেয়ালে একটি পট ঝোলানো থাকে। ছবি বা ভাবচিত্র। উঁচু জায়গায় থাকে ফুলদানী।

এবার দেখি যিনি চা প্রস্তুত করছেন তিনি প্রবীণা মহিলা। আনুষ্ঠানিক কিমোনো পরিহিতা। পরিবেশিকারা আগের বারের মতো অর্থাৎ সেনবাড়ীর
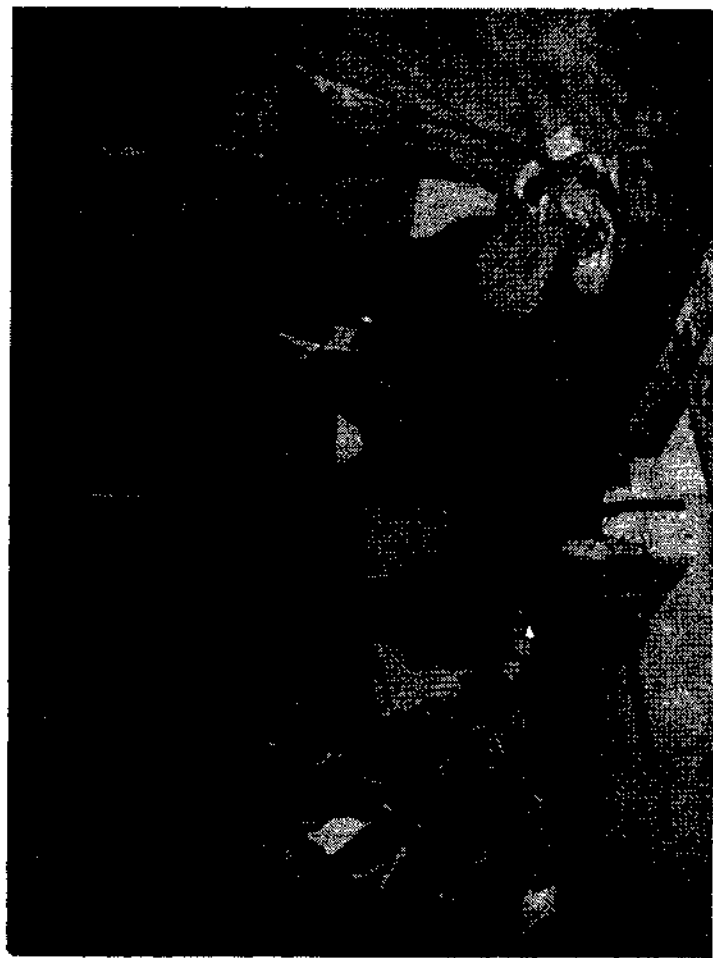
চা পান অনুষ্ঠান
(ওসাকা)

মতো তরুণী। তেমনি রংচঙে কিমোনো পরা। ফুল আঁকা কিমোনো। এবার আমরা জনা পাঁচেক অভ্যাগত। তাই অখণ্ড মনোযোগের অধিকারী। প্রথম ও পঞ্চম বা শেষতম অতিথির মান বেশী। প্রত্যেকেরই আলাদা পেয়ালা। শেপ্‌হার্ড আর আমি যে বর্বর। সকলের সঙ্গে এক পেয়ালার শরিক হতে যে আমাদের শিক্ষার অভাব। তারিফ করতে করতে চা পান করি। সঙ্গে পিষ্টকও ছিল। আনুষ্ঠানিক চা পানের সময় গল্প করা বা আড্ডা দেওয়া অসভ্যতা। আমরা অসভ্য।

অনুষ্ঠান শেষে আমাদের পরখ করতে দেওয়া হলো এক এক করে ল্যাকারের তৈরি চা পাতার আধার, বাঁশের চামচ ইত্যাদি। এগুলি বহুকালের উত্তরাধিকার। পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত ও ব্যবহৃত। দেখতেও সুন্দর। যত্নের সঙ্গে নাড়াচাড়া করে মাথা নেড়ে ও মুখ ফুটে প্রশংসা করলুম। তার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো অন্য একটি কক্ষে। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন। চমৎকার আয়োজন। শেপ্‌হার্ড ছিলেন আমার পাশে। বীয়ার খাচ্ছিনে দেখে তিনি বললেন, "আহা! খেলেনই বা একদিন এক চুমুক! সাধুরা সাধছেন।" অগত্যা আস্বাদন করা গেল। সাকের মতো বীয়ার এখন জাপানীদের নিজস্ব হয়ে গেছে। তেমনি নির্দোষ। লোকচক্ষে সুরার পর্যায়ে পড়ে না।

সহভোজীদের মধ্যে ছিলেন নিপ্পন জীবনবীমা কোম্পানীর দুই বন্ধু। তাঁরা আমাকে সদলবলে নিয়ে গেলেন তাঁদের আফিসে। সেখানে আমার বক্তৃতা। দিনটা শনিবার। ওদেশেও আধা ছুটি। যে যার ঘরমুখো। আমার বক্তৃতা শুনছে কে? তবু দেখলুম হলঘর একটু একটু করে আধাআধি ভরে উঠল। বেশীর ভাগই আফিসের মেয়ে। ভীষণ সীরিয়াস। আর সামনের সারিতে বৌদ্ধ সাধু ও সুধীবৃন্দ। আমার অগ্নিপরীক্ষক। বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে, "ধর্ম, সৌন্দর্য ও প্রেম।" বললুম, "ধর্মের আমি কী জানি! প্রেম সম্বন্ধেই দু'চার কথা বলি। বলতে বলতে সৌন্দর্য সম্বন্ধেও বলা হয়ে যাবে।" ধার্মিকদের এড়িয়ে গেলুম।

কিয়োতোর প্রথম সন্ধ্যার প্রতিবেশিনী আমাকে যা বলেছিলেন তা মনে ছিল। তা ভেবে ওসাকার মেয়েদের কানে দিয়ে গেলুম আমার বাণী। যাতে ওরা জীবনে সুখী হতে পারে। আর নয়তো মর্যাদার সঙ্গে দুঃখী হতে পারে।

একস্থলে উল্লেখ করলুম গান্ধীর নাম। বিশেষণ বিরহিত। আমার দোভাষী যখন ইংরেজী থেকে জাপানীতে ভাষান্তরিত করলেন তখন বললেন "মহাত্মা গান্ধী।" কী যে ভালো লাগল শুনতে! মহাত্মা গান্ধীকে ওরা চেনে! ওরা তাঁকে মনে রেখেছে! যদিও তিনি বহু দূর। যেমন দেশের দিক থেকে তেমনি কালের দিক থেকে।

বক্তৃতার শেষে যখন প্রশ্নোত্তরের পালা তখন একজন উঠে বললেন, "আচ্ছা, যুদ্ধ অপরাধী বলে জাপানী সেনাপতিদের যে বিচার ও দণ্ডদান হলো সে বিষয়ে আপনার কী মত?" সর্বনাশ! আমার বক্তৃতার বিষয়ের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক! লক্ষ করলুম যে সভাসুদ্ধ সকলের কান খাড়া রয়েছে এই প্রশ্নটির উত্তর শুনতে। বুঝতে পারলুম কোনখানে তাদের জ্বালা। বললুম, "এক নেশন আরেক নেশনের বিচারক হতে পারে না, দণ্ডদাতা হতে পারে না।"

স্থানে অস্থানে সময়ে অসময়ে জাপানীরা আমাকে এমনি সব বেখাপ্পা প্রশ্ন করেছে। তার থেকে আঁচতে পেরেছি কোনখানে-কোনখানে তাদের জ্বালা। পরমাণু বোমার মার তারা ভুললেও ভুলতে পারে, কিন্তু বিনা শর্তে আত্ম-সমর্পণের গ্লানি তারা ভুলবে না। যুদ্ধ অপরাধী বলে তাদের সেনাপতিদের বিচার ও দণ্ড যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। সে কি ভোলা যায়! না ক্ষমা করা যায়! তার পর মার্কিন সৈন্য মোতায়েন। তার অনিবার্য পরিণতি "মিশ্র সন্তান।" এদের সংখ্যা হাজার দশেকের বেশী নয়। মার্কিনরাই অনেকের ভার নিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তবু জাতীয় আত্মসম্মানে বাধছে। এমন কি বিবাহেও সম্মানহানি। বিজেতাকে মেয়ে দেওয়া যেমন রাজপুতের পক্ষে তেমনি জাপানীর পক্ষেও হীনতাসূচক।

তা বলে যদি কেউ অনুমান করেন যে জাপানীরা মার্কিনদের উপর প্রথম সুযোগেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তা হলে ভুল করবেন। জাপানীদের মস্ত বড় গুণ তারা শিখতে চায়। শিখতে হলে কার কাছে শেখবার আছে সব চেয়ে বেশী? আমেরিকাকেই তারা মনে মনে গুরু বলে বরণ করেছে। গুরুমশায় মেরেছেন বলে তাঁর কাছে শিখবে না তো কার কাছে শিখবে? গুরুও শেখাতে রাজী। আগে তো সবকিছু শিখে আত্মসাৎ করুক। শিক্ষা সাঙ্গ হলে তখন না হয় গুরুমারা চেলা হবে। কিন্তু যার ঘাড়ের উপর লাল চীন ও

মাথার উপর সোভিয়েট রাশিয়া সে কি তাদের সঙ্গে হাতাহাতি না করে আমেরিকার দিকে পা বাড়াতে সাহস পাবে? আর তাদের সঙ্গে হাতাহাতিও কি কম সাহসের কাজ! জাপান পড়ে গেছে তিন মহাশক্তির তেমোহানায়। তাদের কেউ তার চেয়ে দুর্বল নয়। ভবিষ্যতে জাপান যদি মহাশক্তি হয় তারা হবে মহত্তর শক্তি। আবার যদি চালে ভুল হয় তবে জাপান হবে তেভাগা। ধীরমতি জাপানীরা এই ভেবে কৃতজ্ঞ যে আমেরিকা রাশিয়ার প্রস্তাবে রাজী হয়ে জাপানকে দোভাগা হতে দেয়নি। নয়তো হোক্কাইদো চলে যেত রুশ এলাকায়। জাপানের সরকারী নীতি মার্কিনের সঙ্গে মিতালী। বেসরকারী নীতি তিন মহাশক্তির সঙ্গে সমঝোতা। জাপানের সাধারণ লোক আর যুদ্ধ চায় না। একটার পর একটা যুদ্ধে জয়ী হয়ে তারা যা কিছু লাভ করেছিল শেষ বার হেরে তার সমস্ত হারিয়েছে, শুধু মূল জাপানটুকু রাখতে পেরেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর মতো। জার্মানদের তাতেও শিক্ষা হয়নি, তাই দোভাগা। জাপানীদের চোখ ফুটেছে। আমি তাদের বার বার বাজিয়ে দেখেছি। তারা ভুলে যেতে চায় কবে কোথায় কোন লড়াই জিতেছিল।

এর পর চললুম আমরা য়ামানাকা দাইবুৎসুদো কোম্পানীর আফিসে। এঁরা প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে বৌদ্ধ গৃহস্থদের ছোট মাপের ঠাকুরঘর সরবরাহ করে আসছেন। কাঠের তৈরি। বড় বড় মন্দিরে গেলে আপনি যে রকম ঠাকুরঘর দেখতে পাবেন অবিকল সেই রকমটি দেখবেন এঁদের আড়তে। শুধু আকারে ছোট। এক এক সম্প্রদায়ের এক এক ছাঁদের ঠাকুরঘর। তা দেখে চেনা যায় কোনটা জোদো, কোনটা জোদো-শিন, কোনটা জেন, কোনটা শিন্‌গন, কোনটা নিচিরেন। কত নাম করব? আরো যে অনেক সম্প্রদায়। একই আড়তে পাশাপাশি সবাইকে দেখে আমি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে প্রত্যক্ষ করলুম। এসব ঠাকুরঘর জাপানের সর্বত্র চালান যায়। তা ছাড়া যায় হাওয়াই দ্বীপে, কালিফর্নিয়ায়, ব্রেজিলে।

চা পানের পর ফুমিকাজু য়ামানাকা হলেন আমাদের দলপতি। সঙ্গে চললেন বুকো য়োকোয়ামা, হ্যারি শেপ্‌হার্ড, হোজুন কিকুচি। আর কী জানি কেন এক ফোটোগ্রাফার। এবার আমাদের লক্ষ্য হলো বুনরাকু-জা। বুনরাকু থিয়েটার। পুতুল নাচের স্থায়ী মঞ্চ। রোজ বেলা এগারোটা থেকে

রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকে। চারটের পর আধঘণ্টা বিরতি। একাধিক পালা দেখানো হয়। যার যেটা খুশি তিনি কেবল সেইটে দেখে উঠে আসতে পারেন। টিকিটের দাম সময় অনুসারে। আমরা ছিলুম তিনটের থেকে চারটে। প্রেক্ষাগৃহে। তার পরে আরো কিছুক্ষণ সাজঘরে। যে পালাটি দেখলুম তার নাম "সানবাসো।" সংস্কৃত নাটকের ভরতবাক্য বা শান্তিপাঠ বা স্বস্তিবাচন বা দীর্ঘজীবনকামনা। চিনামাকাই আর মিৎসুওয়াকাই নামে দু'দল খেলোয়াড় দশ বছর পরে সম্মিলিত হয়ে খেলা দেখাচ্ছেন। এটা তাঁদের বিজয়ার শুভসম্ভাষণ।

পাঁচ পুতুল নিয়ে "সানবাসো" দশ বছর পরে এই প্রথম। সাধারণত তিন পুতুল নিয়ে "সানবাসো" হয়। আমি ভাগ্যবান যে আমি সাতান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানে উপস্থিত ছিলুম। যে দুটি দলের নাম করলুম তারা মাসের পর মাস খেলা দেখিয়েছে, কিন্তু এ মাসটা এদের তো ও মাসটা ওদের। দশ বছর পরে তাদের সুবুদ্ধি হলো, তারা শুধু সেপ্টেম্বর মাসটাই একসঙ্গে মঞ্চে নামল। তাই পাঁচ পুতুল নিয়ে "সানবাসো"। খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন মান্‌জুরো কিরিতাকে। পরে তিনি সরকার থেকে নীল রিবন পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন। পুতুলের বাঁ হাত কেমন করে নাড়তে হয় তাই শিখতেই এঁর লেগেছিল পনেরোটি বছর। আর পা দুটি কেমন করে নাড়তে হয় তা শিখতে লেগেছিল দশটি বছর। আগে পা নাড়া দিয়ে শিক্ষানবীশী শুরু করতে হয়। তার পর বাঁ হাত। তার পর ডান হাত ও মাথা। এখন এঁর বয়স সাতান্ন। "সানবাসো" পালার পাঁচটি পুতুলের জন্যে এঁর মতো পাঁচটি প্রধান খেলোয়াড় লাগে। প্রত্যেকের আবার দুটি করে সহকারী। সহকারীদের মুখ আর শরীর আগাগোড়া কালো ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা। যেমন বোরকা পরা বেগম। এরা ছায়ামূর্তি। এদের পায়ে খড়ের চটি। আর প্রধানদের পায়ে বড় বড় থান ইটের মতো কাঠের পায়া, মাঝখানটা ফাঁপা। তাই পরে নাচেন যখন তখন আকাশ ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে নাচটা শেষে।

পাঁচটি পুতুলের মধ্যে একটিকে বলে চিতোসে। তার মানে তরুণী। আর একটিকে বলে ওউনা। বৃদ্ধা। আর একটিকে বলে ওকিনা। বৃদ্ধ। বাকী দুটি পুরুষ। এই পাঁচ জনের মুখ হাত পা ঠিক মানুষের মতো। মূল্যবান সাজপোশাক। এঁদের আকার ঠিক মানুষের মতো না হলেও মানুষের দুই-

তৃতীয়াংশ। মাটিতে পা পড়ে না। শূন্যে তুলে ধরতে হয় সমস্তক্ষণ। এত বড় একটি পুতুলকে একা একজন কী করে এক ঘণ্টাকাল শূন্যে তুলে ধরবেন ও সেই অবস্থায় নাচাবেন খেলাবেন অভিনয় করাবেন ? অগত্যা আরো দু'জনের সাহায্য নিতে হয়। দুই ছায়ামূর্তির একজন ভার নেন পায়ের। একজন বাঁ হাতের। আর প্রধান নিজে ভার নেন মাথার ও ডান হাতের। মাথার সঙ্গে ডান হাতের প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ। ডান হাতের এক জায়গায় চাপ দিলে মাথাটা এক দিকে ঘোরে। অন্য জায়গায় চাপ দিলে মাথাটা অন্য দিকে ঘোরে। এক জায়গা টানলে চোখের তারা নড়ে। আরেক জায়গা টানলে ভুরু নড়ে। পুতুলের আঙুলও নড়ানো যায়। এসব কিন্তু দীর্ঘকাল শিক্ষাসাপেক্ষ। শিখতে শিখতে নখ ক্ষয়ে যায়। নিজেরি আঙুলের ডগা বিকল হয়ে যায়। তা ছাড়া ওস্তাদের কাছে কিল চড় খেতে হয়।

কাবুকি থিয়েটারের মতো বিস্তীর্ণ মঞ্চ ও প্রলম্বিত মঞ্চবাহু। তেমনি পাইনতরু আঁকা পশ্চাৎপট। পশ্চাৎপট থেকে মঞ্চের দিকে নেমে এসেছে গ্যালারির মতো তিন সার আসন। পিছনেরটা সব চেয়ে উঁচু। মাঝখানেরটা তার চেয়ে কম উঁচু। সামনেরটা আরো কম উঁচু। পিছনের ও মাঝখানের সারি দুটি জোরুরি গায়কদের। সামনেরটি সামিসেন বাদকদের। গায়ক ও বাদকদের সংখ্যা সাতচল্লিশ জন। আর খেলোয়াড়দের সংখ্যা পনেরো জন। মোট বাষট্টি জন মানুষ। আর পাঁচটি পুতুল। সকলেরই পরনে ক্লাসিকাল জাপানী পোশাক। কেবল ওই ছায়ামূর্তিগুলির দিকে তাকালে মায়া হয়। কমসে কম পনেরো বছর পদসেবা ও বাম হস্তের ব্যাপার চালিয়ে না গেলে প্রমোশন নেই। ততদিন মুখ দেখাতে পারবে না। কিন্তু দুঃখ কী ! একদা মানজুরোকেও তাই করতে হয়েছে। করতে হয়েছে য়োশিদাকেও।

কেউ যদি মনে করে থাকেন যে সাড়ে আট শ' জনের প্রেক্ষাগৃহ রোজ দশ ঘণ্টাকাল ভরে যায় শুধু পুতুলের নাচ দেখতে তা হলে তিনি ভুল করেছেন। আকর্ষণটা ত্রিবিধ। প্রথমত জোরুরি গীতিকথার। একাধারে গান আর গল্প। জোরুরি নামে এক কালে এক নায়িকা ছিলেন, তাঁর কাহিনী নিয়ে জনপ্রিয় গান থেকে জোরুরি গীতিকথার উৎপত্তি। দ্বিতীয়ত সামিসেন বাজনার। তিন তারের যন্ত্র সামিসেন জাপানীরা পায় লুচু দ্বীপ থেকে। লুচু পায় চীন থেকে। তখন থেকেই জনপ্রিয়। ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন

একদিকে জোরুরির আবির্ভাব তেমনি একদিকে সামিসেনের প্রাদুর্ভাব। লোকে জোরুরি শুনতে পাগল, সামিসেন শুনতে পাগল। তখন এক জোরুরি প্রবর্তকের খেয়াল হলো, আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? পুতুল নাচের সঙ্গে যদি জোরুরি গীতিকথা জুড়ে দিই? যদি সামিসেন বাজনা জুড়ে দিই? তা হলে নাচ গান বাজনার তিনরকম আকর্ষণ কি তিনগুণ হবে না?

হলোও তাই। কিন্তু তার জন্যে দরকার হলো নির্দিষ্ট একটা স্থান। একটা মঞ্চ। ঘুরে ঘুরে গ্রামে শহরে পুতুল নাচ দেখানো এক কথা। একঠাঁই নাচ গান বাজনার আয়োজন করা আরেক। সপ্তদশ শতাব্দীর এদোতে গিয়ে জোউন খুলে বসলেন এক নাটশালা। মাটির পুতুল ছেড়ে তিনি কাঠের পুতুল প্রবর্তন করলেন। ছোট ছোট গীতিকা ছেড়ে তিনি ছয় সর্গের গীতিকথা রচনা করলেন। শোগুনের রাজধানী এদো। "ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" প্রথমে চাঁদ হাতে পেয়ে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তার পর হাতে দড়ি। তাঁর শিষ্যরা ফিরে যান কিয়োতো। সেখানে নাটশালা খোলা হলো। পরের পদক্ষেপ ওসাকা। সেইখানে পায়ের তলায় মাটি পাওয়া গেল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই যে ষাট সত্তর বছর এই সময় ওসাকায় কাবুকিকে নিষ্প্রভ করে পুতুল নাটশালা চলে, জোরুরির আকর্ষণটাই মুখ্য আকর্ষণ হয়, জাপানের শেক্স্পীয়ার বলে কথিত চিকামাৎসু গীতিনাট্য লিখে দেন, গিদায়ু করেন পরিচালনা। আর পুতুল গড়ে দেন বড় বড় কারিগর, সাসায়া হাচিবেই ও সাসায়া য়োচিবেই। ধীরে ধীরে কানের চেয়ে চোখের আকর্ষণ বেড়ে যায়। জোরুরির চেয়ে অভিনয়ের আকর্ষণ। রূপের আকর্ষণ। সাজের আকর্ষণ। ক্রমে ক্রমে কাবুকির দিকেই লোকের মন যায়। পুতুল থিয়েটারের কলাকৌশল আত্মসাৎ করে মানুষ থিয়েটার জমে ওঠে। কাবুকির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুতুল নাচ পেছিয়ে পড়ে। এর নাটশালা ওর নাটশালায় পরিণত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ওসাকায় বুনরাকু-কেন নামে এক ব্যক্তি এসে একটি পুতুল নাটশালা খোলেন। এঁর যাঁরা উত্তরাধিকারী হন তাঁরাও একে একে বুনরাকু নাম গ্রহণ করেন। সত্তর আশি বছরের সংগ্রামের পরেও এঁদের নাটশালাটি বেঁচে বর্তে থাকে। তখন তার নাম দেওয়া হয় বুনরাকু-জা। আরো পঞ্চাশ বছর পরে এর প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে

একে পর্যাপ্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বুনরাকু-জা হয়ে দাঁড়ায় জাপানের অদ্বিতীয় পুতুল নাটশালা। অগ্নিদেব সে কথা শুনবেন কেন? ১৯২৬ সালে পুড়ে ছাই হলো পুরাতন গৃহ। সেইসঙ্গে শতাধিক পুত্তলিকার অধিকাংশ। নতুন বাড়ী বানাতে হয়। পুতুল বানাতে হয়। অলক্ষিতে পুতুল নাট্যের ক্লাসিকাল পদ্ধতির নাম রটে যায় বুনরাকু। একদা এটি ছিল একটি ব্যক্তির নাম। পরে একাধিক ব্যক্তির মঞ্চ নাম। শেষে দাঁড়ায় একটা আর্টের নাম।

সেদিন "সানবাসো" দেখতে দেখতে আমরা তন্ময় হয়ে গেলুম। মনে রইল না যে পুতুল নাট্য দেখছি। কাবুকি যেমন এক কালে পুতুল নাট্যের কলাকৌশল আত্মসাৎ করে ঐশ্বর্যবান হয়েছিল বুনরাকু তেমনি কাবুকির কলাকৌশল আয়ত্ত করে নাটকীয় ও মানবিক হয়ে উঠেছে। পুতুলের সঙ্গে মানুষ থাকলেও তাদের দিকে নজর পড়ে না। পুতুলকেই মনে হয় সজীব ও সচেতন। তারা কখনো পরস্পরের দিকে ছুটছে, কখনো এক অপরের কাছ থেকে পালাচ্ছে। কখনো আসল মঞ্চ থেকে বেরিয়ে হানামিচি বেয়ে আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। আবার উত্তেজিতভাবে ফিরে যাচ্ছে। গতি আর ভঙ্গী এই নিয়ে অভিনয়। পুতুল বা তার বাহকরা কথা বলে না। যা বলবার তা বলে জোরুরি গায়করা। আর তাদের বলা তো সুর করে গেয়ে চলা। নো নাটকের মতো, কাবুকি নাটকের মতো, বুনরাকুতেও লক্ষ করলুম টেনসন ধাপে ধাপে চড়ছে। এ কি জাপানী নাট্যের দস্তুর? শেষে আকাশ ভেঙে পড়ল পঞ্চ পুত্তলিকার পরস্পরমুখী পরস্পরবিমুখ দুরন্ত ঘুরন্ত তাণ্ডবে। কাঠের পায়া বাঁধা পায়ে বাহকদের ধাঁই ধাঁই ধপ ধপ দুম দাম আওয়াজে। এমন চমৎকার ছন্দে ছন্দে নাচন ও মাতন আর কোথাও দেখিনি। জাপানীরাও দেখল দশ বছর পরে পুনর্বার।

প্রেক্ষাগৃহ থেকে নীত হলুম সাজঘরে। রাশি রাশি পুতুল। সাজ খুলে নেওয়া আটপৌরে আচ্ছাদনে মোড়া। এক কোণে বসেছিলেন তামাগোরো য়োশিদা। এটা মঞ্চ নাম। জাপানে মঞ্চ নাম এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে বর্তায়। তামাগোরো য়োশিদার ইনি দ্বিতীয় পুরুষ। সেকেণ্ড জেনারেশন। আপন নাম মাসাইচি য়ামাশিতা। ছোটখাটো মানুষটি পঁয়ত্রিশ বছর পুতুল নাট্যে হাত পাকিয়েছেন। পায়ের কাজ শিখতে পাঁচ

বছর। বাঁ হাতের কাজ দশ বছর। ডান হাতের কাজ দশ বছর। এ গেল সাগরেদী। তার পর থেকে ওস্তাদী। অতি বাল্যকাল থেকে শিক্ষানবীশী। দলের লোকদের সম্বন্ধে মজার মজার গল্প বললেন। একজনের সঙ্গে একজনের যখন দেখা হয় তখন রাত দশটাই হোক আর বেলা বারোটাই হোক ইনি বলবেন, "সুপ্রভাত।" আর উনি বললেন, "সুপ্রভাত।" তেমনি বিদায় নেবার সময় বেলা আটটা না সন্ধ্যা সাতটা সে খেয়াল থাকে না। ইনি বলবেন, "সুনিদ্রা হোক।" উনি বলবেন, "সুনিদ্রা হোক।"

তামাগোয়ো একটি সুন্দরী পুত্তলিকা আনিয়ে আমার সামনে রাখলেন। দেখালেন যতরকম প্রচ্ছন্ন কলকব্জা। কোনখানে হাত দিলে কোনখানটা নড়ে চড়ে ঘোরে। "সুন্দরী আপনাকে দেখে খুশি হয়েছে। হাতে হাত রাখুন। হাত নাড়ানাড়ি করুন। সুন্দরী আপনাকে ছাড়তে চায় না। কাঁদছে। ওই দেখুন চোখে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। সুন্দরী আপনার প্রেমে পড়ে গেছে। ওকে কাছে টেনে নিন।" সুন্দরীকে কাছে টেনে নিয়ে একটু শান্ত করছি। ওমা, তক্ষুনি ফোটো তোলা হয়ে গেল। বিশ্বাসঘাতক ফোটোগ্রাফার! এইজন্যেই কি তোমাকে সঙ্গে করে এনেছি!

আপনারা শুনলে শক্ পাবেন, তবু সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে, সুন্দরীর দেহ বলতে কিছু নেই। ওই মুখখানি আর গলাটি আর হাত দুটি আর পা দু'খানি। আহা, বেচারি! কিন্তু ওদিকে বাহক বেচারাদের দশাটাও ভেবে দেখতে হয়। এঁর যদি দেহ থাকত তা হলে সে দেহের ভার কত হতো আন্দাজ করুন। সে দেহটিকে শূন্যে তুলে ধরতে তিন তিনটি পুরুষেরও সাধ্যে কুলোত না পাকা এক ঘণ্টা। আর আমিও কি কাছে টেনে নিয়ে পুতুলচাপা পড়তুম না? সত্যি, সুন্দরীর কাছ থেকে বিদায় নিতে দুঃখ হচ্ছিল। তামাগোয়োর কাছ থেকেও।

য়ামানাকা-সান কাজের লোক। তিনি আমাকে খুব কম সময়ের মধ্যে খুব বেশী দেখাবেনই। এর পর নিয়ে চললেন নতুন টাওয়ারে। ছোটখাটো কুতুব মিনার। উপরে ওঠার জন্যে লিফ্‌ট্‌ আছে। প্রথম লিফ্‌ট্‌টা গোলাকার। তার পরেরটা চতুষ্কোণ। চূড়ায় উঠে শহর দেখা গেল দাঁড় করানো বড় বড় বাইনোকুলার দিয়ে। দূরে ইতিহাসবিখ্যাত ওসাকা দুর্গ। এক নজরে যা দেখলুম তাতে মনে হলো চার দিকে আধুনিক ইমারত গড়ে উঠছে। ম্যানসন। ফ্ল্যাট।

বুনরাকু রঙ্গমঞ্চের পুত্তলিকা
(ওসাকা)

এর পর য়ামানাকা-সান নিয়ে গেলেন গরিবদের বস্তি দেখাতে। দারুণ ভিড়। চাঁদনির মতো সস্তা দোকান। কম দামে সব চীজ পাওয়া যায়। জুয়োখেলার মেশিন। অসংখ্য লোক একা একা খেলছে। আমিও খেললুম। হেরে গেলুম। তার পর স্বলভ রেস্টোরান্টে আহার। প্রত্যেকটি ডিশ দশ ইয়েন বা তেরো নয়া পয়সা। টুলের উপর বসে কাঁকড়া খেলুম। বুক্কো য়োকোয়ামা বৌদ্ধ সাধু। তিনি সেখানে ঢুকবেন না। বাইরে অভুক্ত থাকবেন।

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। য়ামানাকা-সান এক চক্কর ঘুরিয়ে আনলেন যেখানটার চার দিকে সেটা ওসাকার "walled city"। হতভাগিনীদের আগে সেখান থেকে বেরোতে দেওয়া হতো না। এখন প্রাচীরে ফাঁক হয়েছে। তারা নামে স্বাধীন। জীবনে যা কখনো দেখিনি তাই দেখা হয়ে গেল। বিলাসগৃহ। বিলাসিনী। মোটর একমুহূর্ত থামেনি। থামলে ওরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ত। শেপহার্ড বললেন, "ভাগ্যিস্ সন্ধ্যা হয়নি। নইলে টেনে নিয়ে যেত।"

ফুকুশিমা ওকিআগারি

॥ সতেরো ॥

ট্যাক্সি ডান্সার কাকে বলে জানেন? আমি জানতুম না। তবে নাম শুনেছিলুম। কিন্তু কোনোদিন কল্পনা করিনি যে স্বচক্ষে দেখব। স্বপ্নেও ভাবিনি যে—থাক। যথাকালে।

আমার ধারণা ছিল যামানাকার মোটর ওসাকা স্টেশনের অভিমুখে ছুটেছে। আমি কিয়োতো ফিরে যাচ্ছি। তা নয়। শেপহার্ড বললেন, "এখানে একটা কাবারে আছে। তাতে আট শ' জন ট্যাক্সি ডান্সার। আপনার দেখা উচিত।" তার পর তিনি কথায় কথায় বললেন, "ওদের মধ্যে শুনেছি এমন মেয়েও আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। পড়ার খরচ জোটানোর জন্যে পার্ট টাইম নাচে।" আমার ঔৎসুক্য জাগল। দেখা যাক কী রকম **cabaret**!

বেচারা বুক্কো য়োকোয়ামা! আমার অভিভাবকরূপে কাসুগাই কর্তৃক নির্বাচিত। বৌদ্ধ সাধুকে তো আট শ' জন ট্যাক্সি ডান্সারের সঙ্গে মিশতে দেওয়া যায় না। তিনিও সঙ্কুচিত। তাই তাঁকে কাবারের সুমুখে নামিয়ে দেওয়া হলো। পথি সাধু বিবর্জিত। আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে নাইটক্লাবের টিকিট কাটলুম। বিবিন্-জা। সুন্দরী তরুণীদের স্থান। আমাদের আতিথ্যের মেয়াদ এক ঘণ্টা। সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা।

ভিতরে যেতেই তরুণীরা আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন সামনের দিকের একটি খোলা বক্সে। সেখানে পাশাপাশি জনা দশেকের বসবার জায়গা। নাচের মেজের দিকে কতক জনের মুখ। কতকের মুখ পরস্পরের দিকে, ঘাড় ঘোরালে নাচের মেজের দিকে। আসনের সম্মুখে টেবিল। টেবিলের উপর পানীয় ও ভোজ্য।

খেলা দেখানো শুরু হয়ে গেছে। মেজের মাঝখানটা গোল মঞ্চের মতো উঁচু হয়ে উঠল। মঞ্চের উপর তরুণবেশী তরুণীদের সঙ্গে তরুণীবেশী তরুণীদের তামাশা। পাশ্চাত্য সঙ্গীত আসছিল উপর তলার বাদকদের বিভিন্ন যন্ত্র থেকে। চার দিক চেয়ে দেখলুম দর্শকরা বসেছেন গোলাকার ব্যূহ রচনা করে। সব দিকই সামনের দিক। সারির পর সারি। পিছনের সারিগুলো ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে।

আমরা ছিলুম পাঁচজন পুরুষ। সঙ্গে নারী নেই। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! চেয়ে দেখি পাঁচটি মেয়ে এসে পাশে পাশে বসেছে। তাদের কেউ কিমোনো-ধারিণী কেউ পাশ্চাত্যবেশিনী। পাশ্চাত্য পোশাক পরলেও পাশ্চাত্য ভাষা জানে না। দুঃখের কথা আর জানাই কাকে! আমার পাশে এসে একটিও মেয়ে বসে না। একাধিক বসে গিয়ে ছাত্রটির পাশে। বোধ হয় সমবয়সী ও স্বভাষী বলে। আমি মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলতে থাকি আর মনকে বলতে থাকি, "আঙুর ফল টক।" অবোধকে বোঝাই যে এই রঙ্গিলা দুনিয়ার রঙ্গভূমিতে সে দর্শকমাত্র। মন, চেয়ে দেখ কেমন তামাশা চলেছে। মঞ্চের উপর দৃষ্টিপাত কর। পাশের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাও। ওই দেখ, উঁচু মঞ্চ নিচু হতে হতে মিলিয়ে গেল। রঙ্গিণীরা অদৃশ্য।

এমন সময় বেজে উঠল নাচের বাজনা। পরিচিত সুর। ওয়াল্ট্‌জ্‌। জোড়ে জোড়ে চলল সবাই মেঝের উপর ঘুরে ঘুরে নাচতে। এবার তরুণীর সঙ্গে তরুণী নয়। দর্শকরাই নর্তক। সঙ্গিনীরাই নর্তকী। য়ামানাকা আর স্থির থাকতে পারলেন না। অনুমতি নিয়ে আসন ত্যাগ করলেন। শেপ্‌হার্ড বার বার "না, না" করলেন। তার পর আমার কাছে মাফ চেয়ে ফেরার হলেন। কিন্তু যাবার আগে আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, "এতক্ষণ পরে একটি ইংরেজী জানা মেয়ে পাওয়া গেছে।" মেয়েটি সত্যি সত্যি আমার পাশে এসে আসন নিল।

আমার খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু তখন মন দিয়ে নৃত্যযজ্ঞ নিরীক্ষণ করছি, সঙ্গীত উপভোগ করছি। কে যে আমার পার্শ্ববর্তিনী হলো ভালো করে চেয়ে দেখলুম না। শুধু লক্ষ করলুম যে আমাদের ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরা সহসা সক্রিয় হলো। তিনি মেয়েটিকে তাক করলেন। কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই ফোটো তুলতে দেবে না। দুই হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকবে। টেবিলের তলায় মুখ লুকোবে। আমি ধরে নিলুম যে আমার সঙ্গে ফোটোগ্রাফিত হতে তার আপত্তি। একটু সরে বসলুম। ফোটোগ্রাফার পরাস্ত হয়ে নিরস্ত হলেন।

মেয়েটির সঙ্গে দুটি একটি কথা হলো। তার পর দেখি সে উঠে গেছে। আপদ গেল। তার পর দেখি তার জায়গায় এসে বসেছে একটি কিমোনো পরা মেয়ে। ইংরেজী জানে না। তবু তাকে বলতে ভালো লাগছিল যে

কিমোনো আমি ভালোবাসি। এখানে উল্লেখ করি যে পূর্ববর্তিনীর পোশাক ছিল পাশ্চাত্য। কালো নাচের গাউন।

এই মৌন মেয়েটিও কখন একসময় উঠে গেল। তখন আবার এলো সেই মুখর মেয়েটি। যেমন সপ্রতিভ তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রাণবান। চুল উঁচু করে বাঁধা। উজ্জ্বল মুখ। পাশে বসে বলল, "তুমি তো পান করবে না, দেখছি। আমাকে ঢেলে দাও।"

কড়া কিছু নয়। বীয়ার। দিলুম ঢেলে। নিজে নিলুম না। নিঃস্পৃহ।

নাচের বাজনা একবার থামে, আবার বাজে আর মেয়েটি চঞ্চল হয়। বীয়ার রেখে বলল, "সিগরেট খাবে না? আমি খাই?" এই বলে সে সিগরেট ধরাল। আমারি উচিত ছিল ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমি তখন অন্যমনস্ক।

তার পর মেয়েটি বলল, "নাচতে যাবে না?"

আমি বললুম, "নাচতে জানলে তো?"

মেয়েটি তা শুনে ফেটে পড়ল। ঝাঁজালো স্বরে বলল, "ইউ ডোণ্ট স্মোক। ইউ ডোণ্ট ডিরিঙ্ক। ইউ ডোণ্ট ডান্‌স। দেন হোয়াট ডু ইউ ডু?"

আমি থতমত খেয়ে বললুম, "আই ডু নাথিং।"

সে বোধ হয় আমার আশা ছেড়ে দিল। তার পর তার নজরে পড়ল আমার নাম লেখা পেন কংগ্রেসের ব্যাজ। একটু ঝুঁকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগল।

বাস্তবিক, পুরুষকেই করতে হয় নাচের প্রস্তাব, নইলে নারী অপমানিতা বোধ করে। তাই আমার একবার মনে হলো, যারা নাচছে তারা এমন কী আহামরি নাচতে জানে! আমি যদি নাচি তো কেই বা আমার খুঁৎ ধরবে! ধরলে ধরবে সঙ্গিনী। কিন্তু তাকে তো বলে রেখেছি যে আমি জানিনে। তার পর সাত পাঁচ ভেবে সে খেয়াল ছাড়লুম।

এর পর নাচের এক অঙ্ক শেষ হলো। যে যাঁর আসনে ফিরলেন। য়ামানাকা-সান বললেন, আমাদের থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আমার পাশে তখনো সেই মেয়েটি। সে যখন শুনল যে আমরা আজকের মতো উঠছি তখন আমাকে বলল, "এত শীগগির কেন?"

বললুম, "আমাকে এখনি কিয়োতোর ট্রেন ধরতে হবে।"

"তা হলে আবার কবে আসবে ?"

"আর আসব না। কিয়োতো থেকে তোকিয়ো যেতে হবে। সেখান থেকে ভারত।"

"ভারত থেকে আবার কবে আসবে ?"

"কে জানে আবার কবে! হয়তো এ জীবনে নয়।"

মেয়েটি আমাকে তার কার্ড বের করে দিল। ছাপা ছিল বিবিন্-জা। নম্বর এত। নাম ? নাম ছাপা নেই। শুনলুম, "এই নম্বর বললেই ওরা আমাকে ডেকে দেবে।"

মেয়েটিকে আমার ভালো লাগতে আরম্ভ করেছিল। আমার কার্ড বের করে দিলুম। তার কার্ডের গায়ে তার নাম লিখে দিতে বললুম। এর জন্যে তাকে সাধতে হলো। বলতে হলো, "তুমি একটি বিবিন্।" সে শরমে নত হলো।

নাম প্রকাশ করা বোধ হয় ওখানকার রীতি নয়। সে কী একটা লিখতে চেষ্টা করল। তার পর ছিঁড়ে ফেলল। অন্য একটা কার্ডে শেপ্‌হার্ডকে বলল লিখে দিতে। তিনি লিখে দিলেন ছোট একটুখানি নাম। পদবী নেই। বাড়ীর ঠিকানাও নেই। আমি পীড়াপীড়ি করলুম না। উঠলুম।

এর পর আমরা পাঁচজনে ডান্স হল থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে বাইরে চললুম। ভেবেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে বিদায় দেওয়ানেওয়া হয়ে গেছে। দেখি সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। আমার হাতে হাত রেখে। আর কোনো মেয়ে আর কারো সঙ্গে আসেনি। সকলের দৃষ্টি আমার উপরে। তার উপরে। সারা পথ লোকে চেয়ে দেখছে।

বাইরের দরজার কাছাকাছি এসেছি এমন সময় সে আমাকে আগলে দাঁড়াল। "যেতে নাহি দিব।" সে কী! তা কি হয়। য়ামানাকারা ইতিমধ্যেই গাড়ীতে গিয়ে উঠেছেন। দারোয়ানরা বিনা পয়সায় তামাশা দেখছে। আমি "সায়োনারা" বলে হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বিদায় নিলুম। গাড়ীতে উঠে পিছন ফিরে লক্ষ করি মেয়েটি একই স্থানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। গাড়ী ছেড়ে দিল। তখনো মেয়েটি সেইখানে দাঁড়িয়ে। তেমনি তাকিয়ে।

এর পরে রেস্টোরান্টে গিয়ে জাপানী ধরনে আহার। বুন্কো য়োকোয়ামা যোগ দিলেন। কথায় কথায় বিবিন্-জা'র প্রসঙ্গ উঠল।

শেপ্‌হার্ড আক্ষেপ করলেন, "আপনি জানেন না আপনি কী হারালেন।

ওখানকার সব চেয়ে যেটি সুন্দরী সেই মেয়ে এলো আপনার কাছে। তার সঙ্গে আপনি নাচলেন না।"

আমি হাসলুম। তার পর জানতে চাইলুম ওদের সিস্টেমটা কী। মেয়েটির সঙ্গে নাচলে কি আলাদা করে কিছু দিতে হতো আমাকে ?

য়ামানাকা-সান এর উত্তর দিলেন। যা দেবার তা আগেই দেওয়া হয়ে গেছে টিকিটের দামের সঙ্গে শতকরা দশ হিসাবে। কর্তৃপক্ষ সারা মাসের শতকরা দশকে আট শ' জনের মধ্যে সমভাগ করে দেন। তা ছাড়া প্রত্যেকে একটা মাসোহারা পায়। এক একটি মেয়ের নীট উপার্জন মাসে পঞ্চাশ হাজার ইয়েন। তার মানে সাড়ে ছ' শ' টাকা।

আমি যে ওই মেয়েটির সঙ্গে নাচলুম না তার দরুন ওর আয় কি একটুও কমবে না ?

য়ামানাকা-সান আমাকে আশ্বাস দিলেন যে কেউ যদি নাচের আহ্বান না পায় তা হলেও তার আয় একটুও কমে না। ওরা বাছা বাছা মেয়ে। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কাজ পেয়েছে। ওটা ওদের ন্যূনতম আয়। তা ছাড়া বোনাস আছে। কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে নাচবার জন্যে যদি কর্তৃপক্ষের কাছে কেউ প্রার্থী হয় আর সেই মেয়েটির জন্যেই আসে তা হলে কর্তারা সেই প্রার্থিতার হিসাবে একটা বোনাস জুড়ে দেন। মাসের শেষে দেখা যায় সে বোনাসরূপে আরো কিছু উপরি পেয়েছে।

"ওই মেয়েটি গত মাসে সব জড়িয়ে কত পেয়েছে, শুনবেন ?"

কত আর হবে! আমার কল্পনার দৌড় পঁচাত্তর হাজার ইয়েন। এক হাজার টাকা।

য়ামানাকা-সান গম্ভীরভাবে বললেন, "থ্রী হাণ্ড্রেড থাউজ্যাণ্ড ইয়েন!" চার হাজার রুপেয়া! গভীর আঘাত পেলুম শুনে। ও মেয়ে তো আমার কাছে রজতপ্রত্যাশী হয়নি। ও তো আমার চেয়ে অনেক বেশী টাকা পায়। নাচঘর থেকে আমার সঙ্গে এসে যে সময়টা নষ্ট করল সে সময় হয়তো আর কারো প্রার্থনাপূরণের সময়।

এতক্ষণে আমার জ্ঞান হলো কী আমি হারিয়েছি। আর কী আমি পেয়েছি।

কিয়োতো পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। তোদো মহাশয় আর তাঁর গৃহিণী

স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন অনেকক্ষণ। সেইখান থেকে সোজা নিয়ে গেলেন জাপানী সরাইতে। আগে থেকে ঠিক করা ছিল যে এক রাত জাপানী সরাইতে কাটাব।

সরাইটি বনেদী। কিন্তু ছোট। এক ভদ্রমহিলা এর মালিক। নিজে থাকেন ও দেখাশোনা করেন। একটি পরিচারিকা রাঁধে, আর দুটি অতিথিদের ঘরে গিয়ে পরিবেশন করে, বিছানা পেতে দেয়, ফাইফরমাস খাটে। অতিথি-সংখ্যা অল্পই। দোতলায় তো আমি দ্বিতীয় অতিথি দেখলুম না। একখানা বড় বসবার ঘর ও একখানা ছোট শোবার ঘর আমার জন্যে বরাদ্দ। তা ছাড়া একটা অপ্রধান শৌচাগারও ছিল। একতলায় আরো কয়েকজন অতিথি। ঘরের সংখ্যা বেশী।

সরাইটির নামটি রোমান্টিক। শোগেৎসু। পাইন গাছে চাঁদ। কাছে কোথাও পাইন বন চোখে পড়ল না, কিন্তু রমণীয় উদ্যান। রক গার্ডেন। রাজপরিবারের এক মহিলা কবে নাকি এর একটি কক্ষে বাস করেছিলেন। পরের দিন সেই কক্ষে ক্ষণকাল উপবেশন করলুম। উদ্যানের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি। শান্ত সুন্দর পরিবেশ।

জাপানী সরাই নিয়ে রোমান্স রচনা করা জাপানীদের ঐতিহ্য। বিদেশীরাও সেখানে রোমান্স অন্বেষণ করেন। আমার সেইজন্যে আশঙ্কা ছিল যে রোমান্স আপনি এসে জুটবে আর কী জানি কী বিপদে পড়ব! জাপানী ভাষা জানলে তবু তার কাটান ছিল। কে বুঝবে আমার ইংরেজী! কাকেই বা বোঝাব যে আমি শুধু একরাত্রির মুসাফির। দেখে যেতে চাই জাপানের অন্যতম দ্রষ্টব্য। জড়িয়ে পড়তে চাইনে।

তোদো মহাশয় আর তাঁর গৃহিণী যখন আমাকে মালিকা ও তাঁর পরিচারিকাদের হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেলেন তাঁদের সাহায্যে তার আগেই আমি জানিয়ে রেখেছিলুম যে আমি স্নানার্থী। ভাষার অভাবে যাতে স্নানের অভাব না হয়। পরিচারিকা একখানি পরিষ্কার য়ুকাতা এনে দিল। চটি তো তার আগেই পায়ে দেওয়া হয়েছিল। আর সব মিলবে যথাস্থানে। অনুসরণ করলুম আমার প্রদর্শিকার। কিমোনো পরিহিতা স্বরূপা সুভদ্রা। পরিচারিকা বলে ব্যক্তিমর্যাদায় খাটো নয়। আমার মনে হয় শ্রেণীমর্যাদাও পরিচারিকার ঊর্ধ্বে।

প্রথমে পড়ে ড্রেসিং রুম। সেখানে স্নানের আগে কাপড় ছাড়তে ও স্নানের পরে কাপড় পরতে হয়। যে যার কাপড়। সারি সারি কাপড়। আমার অতটা খেয়াল ছিল না। ভেবেছিলুম ও ঘরে না ছেড়ে পরের ঘরে ছাড়লেই চলবে। যেটা আসল স্নানাগার। আমার কুণ্ঠার অন্য কারণও ছিল। কপাট বলে একটা উপসর্গ নজরে পড়ছিল না। তার বদলে ছিল পর্দা। অবশ্য কপাট থাকলেও যে খিল থাকত এমন কোনো কথা নেই। যে কোনো লোক যে কোনো সময় ঘরে ঢুকে আমার প্রাইভেসী ভঙ্গ করতে পারত। আর শ্রীকৃষ্ণের মতো কেউ যদি ঘাট থেকে বস্ত্রহরণ করত তা হলে আমি যে গোপীদের মতো স্তব স্তুতি করব তার জন্যে ভাষা নেই।

য়ুকাতার নিচে আমি চুরি করে অন্তর্বাস পরে এসেছিলুম। পরিচারিকা তা ধরে ফেলল। একে একে খুলতে হলো তার সাক্ষাতে। সেও তার ভাষায় বোঝাতে পারে না, আমিও পারিনে আমার জানা ভাষায়। আকারে ইঙ্গিতে যে যতটুকু পারে। তবে শেষ মুহূর্তে সে চোখ বুজে পালিয়ে গিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। তা সত্ত্বেও ভাবনা যায় না। এমন কি হতে পারত না যে আমি স্নানের কুণ্ডে নিমজ্জিত হলুম আর অমনি আরেকজনের আবির্ভাব ঘটল? তিনিও স্নানার্থী বা স্নানার্থিনী। একেই বলে ডেমক্রিসের খাঁড়া। যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ এসে বলতে পারেন, "স্থানং দেহি।" যত বড় কুণ্ড তত বেশী দাবীদার। এই কুণ্ডটি যেমন বৃহৎ তেমনি সুন্দর ও পরিষ্কার। এতে বসে ও শুয়ে অন্তহীন আরাম। কিন্তু আর কেউ এসে চাইলেই অংশ দিতে হবে। রক্ষা এই যে আজকাল পুরুষরা থাকতে মহিলারা আসেন না, মহিলারা থাকতে পুরুষরা আসেন না। কিন্তু ভুল করেও তো উঁকি মারতে পারেন। যদি না আগে থেকে বলা থাকে।

আমার বেলা তোদো কিছু বলে রেখেছিলেন কি না জানিনে, আমি সেদিন নিভৃতে নির্জনে ভাসমান হয়ে ব্যাঘাত পাইনি। তবে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠেছিলুম। স্নানের শেষে গোপীদের মতো অবস্থা হয়নি। দোতলায় গিয়ে নরম বিছানায় ঢালা বিছানায় গা ঢেলে দিলুম। জাপানী প্রথামতো য়ুকাতা সমেত। আঃ! কী আরাম! হঠাৎ খেয়াল হলো যে রাত্রে তেষ্টা পেলে খাবার জল নেই। বেল টিপতেই পরিচারিকা এলো। রাত এগারোটার সময় মেডকে ঘরে ডাকা তো সাধু লোকের কর্ম নয়। বরাত ভালো যে জাপানী ভাষায় জলকে কী

বলে তা আমার জিবের আগায় জুটে গেল। ভিজে বেড়ালের মতো বললুম, "মিজু।"

জল এলো। তার পরে ঘুম এলো। তার পরে ভোর হলো। তার পরে ঘুম ভাঙল। পায়চারি করে দোতলাটা দেখলুম। দোতলা থেকে শহর। বসবার ঘরে মনোহর একটি পট ছিল। তোকোনামায় ঝোলানো। আর ছিল একটি খাড়া পর্দা। তিন ভাঁজ কি চার ভাঁজ। তাতেও ছিল ছবি আঁকা। চমৎকার। পুরাতন। সরন্ত কপাটেও যতদূর মনে পড়ে নক্শা ছিল। আর ওই যে নিচু টেবিলটিতে খাবার দিয়ে যায় সেটিও কাজ করা। তার এক পাশে একটি হাত রাখার আসবাব থাকে। যাতে হাত রেখে চেয়ারের হাতলের সাধ মেটাতে পারেন। সেটিতেও কারুকার্য। মেজে তো আগাগোড়া মাদুরে মোড়া।

এবার এলো প্রাতরাশ। আমি আমার অনভ্যস্ত চপস্টিক দিয়ে যেমন তেমন করে খাচ্ছি দেখে আমার পরিবেশিকার হাসি পেল। এটি আরেকটি মেয়ে। তেমনি কিমোনো পরা। সে আমার কাছে বসে আমাকে খোকাবাবুর মতো খাইয়ে দিল। ভারী ভালো লাগল।

প্রাতরাশের পরে একে একে বন্ধুদের প্রবেশ। কলেজের দুটি মেয়ে এলো আমার কবিতা পড়ে কেমন লেগেছে জানাতে। আমি তাদের লিখে দিলুম অটোগ্রাফের কবিতা আর তারাও লিখে দিল আমাকে উদ্দেশ করে কবিতা। তোদো এলেন। পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে যাবার আগে ঘুরে ফিরে দেখলুম বাগান আর রাজবংশীয়ার কক্ষ। জাপানী সরাই হোটেল নয়। সরাই বলতে আমরা যা বুঝি সে জিনিসও নয়। এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটি সহজ আত্মীয়তা জন্মায়। প্রভুভৃত্য সম্পর্কের বেড়া ভেঙে যায়। মালিক ভাড়াটে সম্পর্কের ব্যবধান কমে আসে। শ্রীহস্তের পরশ থাকে বলে একটি ঘরোয়া ভাবও থাকে।

কিয়োতোয় এই আমার শেষ দিন। দেখতে দেখতে আট রাত কেটে গেল। আরো এক রাত কাটবে। এবার এক বাঙালীর বাড়ীতে, অথচ জাপানীর সংসারে। লেডী মুরাসাকির কিয়োতো! কত কালের নগরী! সেই যে কবে "গেঞ্জি" পড়েছিলুম বিশ বছর কি পঁচিশ বছর আগে সেই থেকে পরিচয়। কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে!

উপহারের উপর উপহার জমেছে। বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যাগ কিনতে চললুম বড় একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে। দাইমারু। সেইখানেই ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙানো যায়, যদিও দিনটা রবিবার। আর তারাই খরিদা মাল বাড়ী পৌঁছে দেয়। সবই মেলে এক জায়গায়, তবু পুতুলের জন্যে গেলুম নামজাদা একটি পুতুল দোকানে। বড় মেয়ের হুকুম ছিল, বড় দেখে একটি জাপানী পুতুল কিনতে হবে। আকাশপথে নিয়ে যাবার ভাবনা না থাকলে আরো বড় কিনতেও রাজী ছিলুম। পুতুলের দেশ জাপান। যত ছোট চান তত ছোটও পাবেন, যত বড় চান তত বড়ও পাবেন। কল্পনা করতে পারবেন না এত ছোটও আছে, এত বড়ও আছে। যেটি কিনলুম সেটি জাপানের পক্ষে মাঝারি, আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বড়। আর মধুর।

তোদো নিয়ে গেলেন রেস্টোরাণ্টে। জাপানী। সেকেলে। উপাদেয়। ভাষা জানা থাকলে বিচিত্র স্থানে আহার করা যায়। তবে একটু ঘুরতে হয় এই যা। পায়ে হাঁটতে হয়। কিয়োতোরও গলিঘুঁজি আছে। পায়ে হেঁটে বেড়াতেও ভালো লাগে। দেশ দেখার সেই হলো সেরা উপায়। এত দিন সময় পাইনি। আজকের দিনটা ফাঁকা।

এর পর তোদো মহাশয়ের বাড়ী গিয়ে দোকানপাট তোলা। ছড়ানো জিনিস গোছানো। বিব্‌লি আমার সহায়। এঁদের সঙ্গে এই ক'দিনে বেশ একটা আত্মীয় সম্পর্ক পাতানো হয়েছিল। বিব্‌লি তো এরই মধ্যে ঘরের ছেলে বনে গেছে। তোদো পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে মন কেমন করছিল। তোদো একরাশ উপহার দিলেন। তার সঙ্গে স্বরচিত কবিতা। কিয়োতোর কাছে পেলুম জাপানের অন্তরের স্পর্শ।

উত্তর প্রান্তের শহরতলীতে বাস করেন অধ্যাপক স্থরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ট্রাম গিয়ে যেখানে দাঁড়ায় সেখান থেকে কয়েক মিনিটের পদযাত্রা। বিব্‌লিতে আমাতে তৃতীয় বাঙালীর সন্ধানে চললুম। চক্রবর্তীজায়াকেও আমরা বাঙালী বলে গণ্য করব। আর তাঁদের তিন মাসের কন্যাকেও। ষষ্ঠ বাঙালী তা হলে ওসাকার অধ্যাপক ধীরেশচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু সেদিনকার চা পার্টিকে বাঙালীদের না বলে ভারতীয়দের বলব। সেখানে ছিলেন ওসাকার ব্যবসায়ী কেরলবাসী এক ভদ্রলোক। আর তাঁর তিন কন্যা। মা জাপানী, তবু ভারতীয়া বলে গণ্যা। ওসাকার ওঁরা একটু পরেই উঠলেন। ট্রেন ধরতে

হবে। তার পর বিব্লিও উঠল। শেষ ট্রাম ছেড়ে দেবে। আমি তখন একমাত্র অতিথি হয়ে জাপানী মতে স্নান করে বাঙালী মতে আহার করে চক্রবর্তীর জীবনকাহিনী শুনলুম।

পরের দিন চক্রবর্তীজায়া আমাকে সকাল সকাল খাইয়ে দাইয়ে রওনা করে দিলেন। ইয়ায়ে তাঁর নাম। অষ্টদল চেরিফুল। আর তাঁর কন্যার নাম বীণা। অধ্যাপক এগিয়ে দিলেন।

ওসাকা থেকে এলো লিমিটেড এক্স্প্রেস। "ৎস্থবামে।" সোয়ালো (Swallow) পাখী। আগাগোড়া করিডোর। জায়গা যথারীতি রিজার্ভ করা ছিল। কোন কামরায় জায়গা তাও জানা ছিল। পরে খুঁজে নিলে চলবে। আপাতত বন্ধুদের সঙ্গে হাত মেলানো চাই। তোদো, তোদোজায়া, তোদোতনয়, কিস্কুচি, বিব্লি, তোরিগোএ। আমার পাঠিকাদের একজন। আবার উপহার।

সায়োনারা! সায়োনারা! কিয়োতো! কিয়োতোর চারুচিত্ত মানুষ!

কিয়োতোয় এসে তোরিগোএর পত্রিকায় একটি কবিতা লিখেছিলুম। "পূব আকাশের তারা"।

অচেনার মতো মনে হলো ক্ষণকাল
তার পরে দেখি তুমি আর আমি চেনা।
হাতে হাত রেখে ছাড়তে ছাড়াতে যাই
হাত দেখি হাত কিছুতেই ছাড়বে না।
সায়োনারা! সায়োনারা!
পূব আকাশের তারা!

সেই কবিতা পড়ে যারা দেখা করতে এসেছিল তাদের একজনের খাতায় তুলি দিয়ে লিখি—

সূর্যোদয়ের দেশে
হঠাৎ আমি এসে
ভালোবাসা পেলেম এবং
গেলেম ভালোবেসে।

অপর জনের খাতায় আমার তুলির লিখন—

আত্মীয়রা আছে আমার দেশে দেশে ছড়ানো
দেখে গেলেম, সুধারসে নয়ন হলো ভরানো।

তার পরে আর একজনের জন্যে লিখি। বোধ হয় তোমো মহাশয়ের জন্যে।

জাপান, তোমার ভালোবাসা দোলায় আমার চিত্ত
ভুলব কি দেশ ভুলব কি ঘর তোমার নিমিত্ত!

তা দেখে কিকুচির হলো শখ। তাকে ধরিয়ে দিলুম মুখে মুখে আর হাতে লিখে—

কিয়োতো।
ভালোবাসা দিয়ো তো, আর
নিয়ো তো।

ইওয়াতে হানামাকি কোকেশি

॥ আঠারো ॥

স্বইনবার্নের সেই বিখ্যাত কবিতা মনে আছে ?

> **"Swallow, my sister, O sister swallow,**
> **How can thy heart be full of the spring ?...**
> **O swallow, sister, O fair swift swallow,**
> **Why wilt thou fly after spring to the south..."**

আমার স্বন্দরী চঞ্চলা সোয়ালো বোন আমাকে তার সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু বসন্তকালে নয়, শরৎকালে। দক্ষিণ দেশে নয়, পূর্বাঞ্চলে। আকাশপথে নয়, রেলপথে। চেনা পথ। তবু নতুন লাগছিল। কিয়োতো থেকে তোকিয়ো। সেকাল থেকে একাল। এইবার আমি চলেছি কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে। উজানে নয়, ভাঁটিতে।

এবার কিন্তু আমার সঙ্গে পেন কংগ্রেসের দলবল নেই। আমি একক। করিডোরের দু'ধারে জোড়া জোড়া গদিমোড়া চেয়ার। সকলের মুখ ইঞ্জিনের দিকে। আমার পাশে বসেছিলেন এক প্রৌঢ় জাপানী ভদ্রলোক। জানালার ধারে। জানালার উর্ধ্বে সরু এক ফালি বাক্স। সেখানে যে যার ব্যাগ ইত্যাদি রেখেছে। ভারী মাল সঙ্গে নিতে দেয় না। পাশের ভ্যানে জমা দিতে হয়।

মধ্যাহ্নভোজনের টিকিট বেচতে এসেছিল। আমি একখানা কিনলুম। যথাকালে খানা কামরায় গিয়ে দেখি আমার স্বমুখে উনি কে ? ফন গ্লাসেনাপ ! এই ভারতবন্ধুকে আমার পর মনে হয়নি। পুত্রের শিক্ষাগুরু। অপরিচিতদের মাঝখানে আমি যেন আপনার লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে বর্তে গেলুম। তিনি সেই দিনই তোকিয়োর হানেদা বিমানঘাঁটি থেকে প্লেন ধরে ব্যাঙ্ককে নামবেন, সেখান থেকে ভারতের উপর দিয়ে উড়ে যাবেন, থামবেন না ভারতে। তিনি বা আমি কেউ তখন জানতুম না যে পরের দিন ঘটবে শ্যামদেশে বিপ্লব। বিপ্লবে তাঁর কোনো অস্বিধা হয়েছিল কি না জানিনে, কিন্তু পরে শুনতে পাই কী একটা কারণে তাঁর বিমান দমদমে নামতে ও থামতে বাধ্য হয়, তাঁকে রাত কাটাতে হয় কলকাতার হোটেলে।

যাক, সেদিন আহার সেরে গল্প করতে করতে বেরিয়ে এলুম আমরা।

গল্প করতে করতে কামরার পর কামরা ছাড়িয়ে গেলুম। তার পর তিনি চললেন তাঁর কামরায়, আমি নিজের সীটে গিয়ে বসলুম। নাম লেখা নয়, নম্বর মারা সীট। কিছুক্ষণ পরে কেমন কেমন ঠেকল। ইনি তো আমার পার্শ্ববর্তী নন, ইনি যে পার্শ্ববর্তিনী। এ মহিলা কখন এলেন? তিনিই বা কখন নেমে গেলেন? সোয়ালো পাখী তো সমানে উড়ছে। তার পর উর্ধ্বে চেয়ে দেখি আমার ব্যাগ ইত্যাদি নেই। গেল কোথায়? নিল কে? এমন সময় নজর পড়ল সামনের দেয়ালের উপর। এটা D কামরা। E কামরা নয়। তখন যঃ পলায়তি!

নাগোয়া স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াতেই আমার পার্শ্ববর্তী গিয়ে লাঞ্চ প্যাকেট কিনে নিয়ে এলেন। খানা কামরায় তিনি যাননি। বড় কেউ যায় না লক্ষ করলুম। খানা কামরাও নেহাৎ ছোট। অধিকাংশের ক্ষুধা মেটায় স্টেশনে কেনা লাঞ্চ প্যাকেট বা সঙ্গে আনা খাবার। পানীয় জল দিয়ে যায় ট্রেনেরই দুটি মেয়ে। করিডোর বেয়ে তাদের যাতায়াত। যে যার স্বস্থানে বসে আহার করেন চপস্টিক দিয়ে। অতি পরিচ্ছন্নভাবে। কিছুই মেজেতে পড়ে যায় না। হাঁ। চা থাকা চাই আহার্যের সঙ্গে। সবুজ চা।

দিনটি পরিষ্কার। দৃশ্য দেখতে দেখতে বই পড়তে পড়তে সাত ঘণ্টা কেটে গেল। এরই মধ্যে একসময় শুচি হতে গিয়ে দেখি তেমন স্থানেও জাপানের প্রখ্যাত পুষ্পবিন্যাস। তিনটি ডালপালা এমন করে সাজানো যে রসিকরাই বোঝে ওর মর্ম। একটি দ্যোতনা করে স্বর্গের, একটি মানুষের, একটি ধরিত্রীর। যেটি উপরের দিকে হাত বাড়িয়েছে সেটি স্বর্গের দ্যোতক। যেটি ডান দিকে যেতে যেতে একটি ইংরেজী V হরফের মতো বেঁকে আবার সোজা হয়ে উঁচু নিচুর মাঝামাঝি রয়েছে সেটি মানুষের দ্যোতক। আর যেটি বাঁ দিকে নেমে গেছে, কিন্তু মাটি ছোঁয়নি, শেষ মুহূর্তে আকাশের দিকে মুখ তুলেছে সেটি ধরণীর দ্যোতক।

পুষ্পবিন্যাস জাপানের ঘরে ঘরে। ঘরে বাইরে। এটিও একটি আয়ত্ত করবার মতো বিদ্যা। চা অনুষ্ঠানের মতো এরও শিক্ষালয় আছে। শোনা যায় এর আদি রাজকুমার শোতোকুর আমলে। তেরো শ' বছর আগে। তাঁর স্বকীয় উপাসনামন্দিরে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে যখন পুষ্প নিবেদন করা হতো তখন স্বর্গ মানব পৃথিবীর ত্রিনীতি অনুসরণ করা হতো। চতুর্দশ শতাব্দীতে

এটা জাতীয় প্রথার পর্যায়ে ওঠে। এর প্রসার হয় সর্ব ক্ষেত্রে। প্রকরণও বিস্তারিত হয়। যেখানে তিনটি ডাল নেই সেখানে একটি ডালকেও ত্রিভঙ্গ করে সাজালে ফুলগুলি স্বর্গ মানব পৃথিবীর ইঙ্গিত দেয়। ফুলের প্রকৃতি, যে স্থানে রাখা হবে সে স্থানের প্রকৃতি, যে ফুলদানীতে ভরা হবে সে ফুলদানীর প্রকৃতি, এ সমস্তও বিবেচনার বিষয়।

তোকিয়ো স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পোর্টারের হাতে জিনিসপত্র সঁপে দিলুম। এই অতিকায় স্টেশনের প্রবেশ ও নির্গম পথ হাওড়া বা ভিক্‌টোরিয়া টার্মিনাসের মতো সহজ নয়। অনেক বার উঠতে নামতে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হয়। এই স্টেশনের নির্মাণ ১৯১৪ সালে আমস্টারডাম স্টেশনের আদলে। এর পনেরোটি প্ল্যাটফর্মে প্রত্যহ সতেরো শ' নব্বইটি ট্রেন পৌছয়। যাত্রীসংখ্যা দৈনিক চার লাখ নব্বই হাজার। বাহান্ন একার জুড়ে এই প্রকাণ্ড স্টেশন। প্রাচ্য ভূখণ্ডে অদ্বিতীয়।

শিন্‌জুকু অঞ্চলে ভারতের রাষ্ট্রদূত ভবন। তাকাতানোবাবা স্টেশনের একটু আগে। তাকাতানোবাবা শুনে ভাবছেন তারকেশ্বর বাবার মতো কোনো এক দেবস্থান। তা নয়। শুনলে বিশ্বাস করবেন না—বাবা মানে ঘোড়া তালিম করার মাঠ। ডাউন টাউন থেকে যেতে হলে প্রথমে যেতে হয় সম্রাটের প্রাসাদভূমির পাড় ধরে পূব থেকে উত্তরপশ্চিমে। তার পর শিন্তোদের য়াসুকুনি পীঠস্থান বাঁ দিকে রেখে আরো উত্তরে মোড় ঘুরে আরো উত্তরপশ্চিমে যেতে হয়। তার পর সোজা রাস্তা। মার্কিন মতে 'এল্‌' আভিনিউ। তারই কতক অংশ জাপানী মতে সুওয়া মাচি। বাঁ দিকে লেখা আছে "এম্‌বাসি অফ ইণ্ডিয়া"।

চন্দ্রশেখর ও তাঁর পত্নী লক্ষ্মী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তোকিয়োতে এবার যে ক'দিন থাকব সে ক'দিন তাঁদের অতিথি। কিন্তু আমার নিজেরই জানা ছিল না ঠিক ক'দিন থাকব। আমার প্লেন অবশ্য আটাশে সেপ্টেম্বর। তখনো বারো দিন বাকী। কিন্তু বাড়ী থেকে আমার কর্ত্রীপক্ষ যদি চিঠি লেখেন, "চলে এস", তা হলে হয়তো চব্বিশের প্লেন ধরতে হবে। আসবার সময় একমাস ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে এসেছি। তবু চিনি তো আমার কর্ত্রীপক্ষকে। শেষের দিকে বিরহ অসহন হবে। সেইজন্যে আমার প্রোগ্রামের শেষ চার দিন আমি ইচ্ছা করেই খালি রেখেছিলুম।

উড়তে হয় ওড়া যাবে চব্বিশে। নয়তো আরো ভালো করে তোকিয়ো দেখা যাবে। অন্যত্র যেতে উৎসাহ আমার ছিল না। যাঁরা একমাসেই তামাম জাপান চষে ফেলতে চান আমি তাঁদের একজন নই।

আটদিনের প্রোগ্রামের খসড়া নিয়ে উপস্থিত হলেন ভারতবন্ধু কাকুজো (তেনশিন) ওকাকুরার পৌত্র কোসিরো ওকাকুরা। আমার অভিপ্রায় অনুসারে তিনি ইতিমধ্যেই জাপানের বিদগ্ধগণের সঙ্গে যোগসাধন করেছিলেন। বাকী ছিলেন তানিজাকি। তিনি তোকিয়োতে নয়, আতামিতে থাকেন। যদিও আমার উৎসাহ নেই তোকিয়োর বাইরে যেতে তবু তানিজাকির খাতিরে আতামি যেতে আমি রাজী। কিন্তু সাহিত্যিকদের সঙ্গলাভের জন্যে সন্ধ্যাগুলো বেহাত করতে আমি নারাজ। ওকাকুরাকে বললুম যাঁদের অতিথি আমি তাঁরা হয়তো সন্ধ্যায় কোনো পার্টিতে যাবেন, আমাকেও নিয়ে যেতে চাইবেন, অথবা আমিই চাইব তাঁদের কোথাও নিয়ে যেতে, থিয়েটারে কি সিনেমায়। সুতরাং-সন্ধ্যাগুলো হাতে থাক।

এটা খুব দূরদর্শিতার কাজ হয়েছিল। কিন্তু এর চেয়েও দূরদর্শিতার পরিচায়ক ওসাকা থেকে ওকায়ামা না গিয়ে কিয়োতো হয়ে তোকিয়ো ফিরে আসা। "দূরদর্শিতা" বললুম, কিন্তু যা ঘটবে তা আমি দেখতেও পাইনি, কল্পনাও করিনি। সুতরাং "দূরদর্শিতা" না বলে বলা উচিত প্রিডেস্টিনেশন। আমার নিয়তি আমাকে একটি নির্দিষ্ট দিনের আগে তোকিয়োতে টেনে নিয়ে এসেছিল একটি অজ্ঞাত প্রয়োজনে। অথচ এর জন্যে আমাকে আমার জাপানী বন্ধুদের প্রতি নির্মম হতে হয়েছিল। যথাকালে বলা হয়নি যে আমাকে নিতে দূত এসেছিলেন ওকায়ামা থেকে কিয়োতোয়। অভ্যর্থনার দিনক্ষণ স্থির হয়ে রয়েছিল, অপেক্ষা করছিলেন গবর্নর, মেয়র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট। ওকায়ামা থেকে কয়েক মাইল দূরে আমি দেখতেম আধুনিক ধরনের একটি কুষ্ঠ আরোগ্যনিকেতন। রোগীদের কেউ কেউ সাহিত্যিক। আমাকে কাছে পেলে তাঁরা হয়তো অনুভব করতেন যে তাঁরা বিশ্বের উপেক্ষিত নন। এ সমস্ত একদিকে। অন্যদিকে আমার অন্ধ নিয়তি। নিয়তি অন্ধ নয়। আমিই অন্ধ। এক দিন দেরি করে এলে আমি এমন কিছু হারাতুম যার ক্ষতিপূরণ নেই।

পরের দিন সতেরোই সেপ্টেম্বর চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তাঁর গাড়ীতে করে

চ্যান্সেলারিতে যাচ্ছি চিঠিপত্র কুড়োতে। এমন সময় তিনি বললেন, "আজ সন্ধ্যাবেলা আপনি কী করবেন? আমরা তো যাচ্ছি নিমন্ত্রণ রাখতে। মস্কো থেকে বোলশয় ব্যালে এসেছে। আজ লেগেশিন্স্কায়ার বিশেষ সন্ধ্যা। আজকের প্রোগ্রামের আর কোনো দিন পুনরাবৃত্তি হবে না। আপনি আসবেনই যদি আগে জানতুম আপনার জন্যে টিকিট সংগ্রহ করে রাখতুম। আপনার জন্যে দুঃখ হয়।"

এ যেন পাগলাকে সাঁকোর কথা মনে করিয়ে দেওয়া। জাপানে রাশিয়ান ব্যালে এসেছে এ সংবাদ আমার অগোচর ছিল না। কিন্তু মূর্খের মতো আমার ধারণা ছিল যে ব্যালের টিকিট চাইলেই কিনতে পাওয়া যাবে। জাপানীরা তার কী বুঝবে যে ভিড় করবে! আমার মতো অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির বন্ধুভাগ্য অধিক না হলে সেদিন আমাকে কিউ দিয়ে শত শত দর্শনার্থীর পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হতো। তখন তো আমার জ্ঞান ছিল না যে টিকিট সব একমাস পূর্বেই বিক্রী হয়ে গেছে। কালো বাজারে তার দাম উঠেছে বিশ হাজার ইয়েন। আড়াই শ' টাকার উপর। অত টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে উড়ে এসেছেন আরো কত টাকা দিয়ে হাওয়াই থেকে ক্যালিফর্নিয়া থেকে রুশের শত্রুপক্ষ। হাঁ, এরই নাম আর্ট। আর এরই নাম আর্টপ্রীতি।

চন্দ্রশেখরকে বললুম, "ব্যালে আজ আমি দেখবই। যেমন করে হোক।" এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে বললুম যে কথাটা তাঁর মনে নাড়া দিল। তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমার সেক্রেটারিকে বলছি প্রথমে কিনতে চেষ্টা করতে। কিনতে না পেলে পরে কম্প্লিমেণ্টারি চাইতে। অন্যান্য দূতাবাস থেকে ওরা অসঙ্কোচে কম্প্লিমেণ্টারি চায় ও পায়। আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। রুশেরা তাই আমাদের বিশেষ খাতির করে।"

টিকিট কিনতে পাওয়া গেল না। বৃথা চেষ্টা। রুশ দূতাবাস আফসোস করলেন যে থিয়েটারে জন ধারণের ঠাঁই নেই, প্রত্যেকটি আসন ভরা, তা হলেও তাঁরা হাল ছাড়েননি, এক ঘণ্টা পরে জানাবেন কী উপায়। সেই এক ঘণ্টা আমি ইম্পিরিয়াল হোটেলে কাটিয়ে এলুম। সেখানে গচ্ছিত ছিল আমার একটি ব্যাগ। সেখানেও নাপিতের ঘরে বৃথা ধরনা।

সেক্রেটারির ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, "এই নিন আপনার টিকিট।

সোভিয়েট দূতাবাস থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়েছে ওদের।" হাতে নিয়ে দেখলুম মূল্যবান উপহার। কৃতজ্ঞ হলুম।

ত্রিশ বছর আগে দেখেছিলুম লণ্ডনে আনা পাভলোভার দলের ব্যালে রুশ। ত্রিশ বছর পরে দেখলুম তোকিয়োতে বোলশয় থিয়েটার দলের ব্যালে রুশ। মস্কোর বোলশয় থিয়েটার বিপ্লবের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, খ্যাতিমান ছিল। বিপ্লবের পরে তাকে নতুন করে খ্যাতিমান করেছেন গালিনা উলানোভা। কারো কারো মতে পাভলোভার চেয়েও বড় শিল্পী। উলানোভার নৃত্য আমি রুশদেশের ফিল্মে দেখেছি। তুলনা করার ক্ষমতা নেই। মস্কোর বলশোয় থিয়েটারের দল দেশের বাইরে কোথাও যায় না। তার প্রথম ব্যতিক্রম হলো কয়েক বছর আগে। উলানোভা গেলেন সদলবলে ইংলণ্ড জয় করতে। এর পর নানা রাজ্য থেকে আমন্ত্রণ এলো। তারাও বিজিত হতে চায়। এবারের মতো গ্রহণ করা হলো জাপানের আমন্ত্রণ। কিন্তু দলের মধ্যমণি উলানোভা নন। ব্যালেরিনা হিসাবে তাঁর পরেই যাঁর স্থান তিনিই হলেন মধ্যমণি। অল্‌গা লেপেশিন্‌স্কায়া তাঁর নাম। শোনা গেল উলানোভা আজকাল নাচেন না, নাচ শেখান। শরীর ভালো নয়।

জাপানে প্রেরিত দলটিতে মোট জনা পঞ্চাশ শিল্পী। নাচিয়ে বাজিয়ে সাজিয়ে আঁকিয়ে সবাইকে নিয়ে ব্যালে। ব্যালে কেবল নাচিয়েদের নাচ নয়, বাজিয়েদের বাজনা, সাজিয়েদের সাজসজ্জা, আঁকিয়েদের আঁকন। এমন এক দিন গেছে যখন পিকাসো আর রোএরিখ এঁকেছেন ব্যালের জন্যে দৃশ্যপট, স্ট্রাভিন্‌স্কি আর রিচার্ড স্ট্রাউস রচনা করেছেন সঙ্গীত। ডিআগিলেভ যখন জার আমলের রাশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপে চলে আসেন সে সময়—আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে—তাঁর পরিচালিত ব্যালে সম্প্রদায় নাচিয়ে বাজিয়ে ও আঁকিয়েদের সমান মর্যাদা দিতে আরম্ভ করে। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর "তিন কোণা টুপি" নামে একটি ব্যালে সৃষ্টি হলো, তার চিত্রকর্মের কর্তা পিকাসো, সঙ্গীত-কর্মের কর্তা De Falla আর নৃত্যনাট্যের কর্তা Massine। ব্যালে বিবর্তিত হতে হতে যা হয়েছে তা নিছক নাচ নয়, তিন চারটে বড় বড় শিল্পরূপ সম্মিলিত হয়েছে তাতে। নৃত্যর সঙ্গে অভিনয়, তার সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত, তার সঙ্গে চিত্রকলা যুগপৎ বিভিন্ন শিল্পরূপের আস্বাদন দেয়।

ব্যালে রুশ বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে গভীর মতভেদ আছে। আমাদের

কালোয়াতী সঙ্গীতও ভারতীয় সঙ্গীত, আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতও ভারতীয় সঙ্গীত। তেমনি জার আমলের ইম্পিরিয়াল ব্যালে স্কুলে যা শেখানো হতো ও সেণ্ট পিটার্সবার্গের মারিন্‌স্কি থিয়েটারে তথা মস্কোর বোলশয় থিয়েটারে যা মঞ্চস্থ হতো সেও ব্যালে রুশ, আবার ফোকিন পরিকল্পিত ও ডিআগিলেভ পরিচালিত নবপর্যায়ও ব্যালে রুশ। এই সব স্বেচ্ছানির্বাসিত ব্যালে সংস্কারক পাশ্চাত্য খণ্ডে রাশিয়ার নাম রাখলেও ঘরের লোকের মন পাননি। পাভলোভা ঠিক সংস্কারক ছিলেন না। ডিআগিলেভের সম্প্রদায় থেকে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সরে যান। তাঁর সম্প্রদায়ে তিনিই ছিলেন একশ্চন্দ্রঃ। তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি গোষ্ঠীগত নয়, ব্যক্তিগত। ব্যালেকে তিনি তাঁর নিজের মাধুরী মিশিয়ে যে অপূর্ব রূপসুষমায় মণ্ডিত করেন সে সৌন্দর্য তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে লীন হয়ে যায়। তাঁর "মুমূর্ষু মরাল" অবলোকনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনিই সেই "মুমূর্ষু মরাল"। দেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত, বিদেশে মূলস্থাপনে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, অস্তগামী সমাজব্যবস্থায় বর্ধিত অথচ তার থেকে বিচ্ছিন্ন, বৈপ্লবিক সমাজদ্বন্দ্বে ভূমিকাবিরহিত শত শত "মুমূর্ষু মরালে"র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আনা পাভলোভা।

ব্যালে রুশ দেশের বাইরে গিয়ে অত যে গৌরব লাভ করল দেশ তার কতটুকু নিল? এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজলুম সেদিনকার প্রোগ্রামে। **Lepeshinskaya**র নৃত্যসাথীর নাম **Preobrazhensky.** প্রোগ্রামে লেখা ছিল লেপেশিন্‌স্কায়া ও প্রেওব্রাজেন্‌স্কির সন্ধ্যা। আমরা যাকে বলি বিশেষ রজনী। অন্যান্য দিনের প্রোগ্রামে এঁদের দু'জনের অবতরণ বার দুই মাত্র। সেদিনকার প্রোগ্রামের বিশেষত্ব উনিশটির মধ্যে আটটি নৃত্যপ্রবন্ধই এই দুই প্রখ্যাত শিল্পীর। তা বলে অপরাপর শিল্পীরা অবহেলিত হননি। কোনো একটি ব্যালের আদি অন্ত সেদিনকার প্রোগ্রামে ছিল না। পোল্‌কা ছিল, মাজুরকা ছিল, জিপ্‌সী নাচ, জর্জিয়ান নাচ, বাশকিরিয়ান নাচ, উরাল অঞ্চলের নাচ ছিল। আর ছিল কয়েকটি ফ্যানটাসি নৃত্য। চারটি ওয়াল্‌ট্‌স্ ছিল, তার মধ্যে সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক চাইকোভ্‌স্কির "Nut Cracker" থেকে একটি। আর ছিল মিন্‌কুসের সঙ্গীতযোজিত "ডন কুইকসোটে"র একাংশ। সন্ধ্যাটি নিশ্চয়ই উপভোগ্য হয়েছিল। দর্শকরা বার বার "আঁকোর" দিয়ে নর্তকদের ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনলেন ও নাচালেন। লেপেশিন্‌স্কায়াকেও এক

একটি নাচ একাধিকবার নাচতে হলো। সেসব অতি কঠিন নাচ। পায়ের আঙুলের ডগার উপর ভর দিয়ে নাচতে হয়, ঘুরতে হয় চরকীর মতো। আর তাতেই জনতার করতালির বহর। কিন্তু সব চেয়ে জনপ্রিয় হলেন গ্রাগুদ্দিন বলে এক যুবক। হাই জাম্প বিশারদ।

সব রকম রুচির কথা ভেবে প্রোগ্রাম করতে হয়। তা হলেও আমার মনে হলো ঝোঁকটা বড় বেশী টেকনিকের উপরে আর ম্যাক্রোবাটিক্সের উপরে। ব্যালের আত্মা ইউরোপীয়। কিন্তু ভ্রমণকারী বোলশোয় সম্প্রদায় এশিয়ার লোকনৃত্যকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে ইউরোপীয় বিভ্রমকে ক্ষুণ্ণ করেছেন মনে হলো। ইউরোপকে—বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপকে—আমি তেমন করে পেলুম না। জানা সঙ্গীতকারের মধ্যে চাইকোভ্স্কি, ঘোরাক ও য়োহান স্ট্রাউস। শেষের জনকেই প্রতীচ্য বলা যায়। তাঁর "ব্লু ডানিউবে"র পরশ পেয়ে পুলকিত হলুম।

অন্যান্য দিনের প্রোগ্রাম হাতের কাছে ছিল। মিলিয়ে দেখলুম যে পশ্চিম ইউরোপের প্রভাব নগণ্য নয়। জার আমলের প্রভাবও নির্মূল হয়নি। **"Swan Lake", "Dying Swan", "Coppelia", "Cinderella", "Walpurgis Night"** তার সাক্ষ্য দেয়। তা হলেও অধিকাংশ নৃত্য হয় রাশিয়ার, নয় সোভিয়েট-শাসিত এশিয়ার, নয় সোভিয়েট-অধিকৃত ইউরোপের। ব্যালের নিয়ম এই যে নৃত্য থাকলেই সঙ্গীত থাকে। কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীত। আর সেই যন্ত্রসঙ্গীতই নৃত্যের প্রেরণা দেয়। অনেক সময় সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে আগে, তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে নৃত্য। কোনো একটা প্রিয় সুরকে নৃত্যরূপ দিলে যারা শুনে মুগ্ধ তারা দেখে মুগ্ধ হয়। তবে ব্যালের প্রাণ বোধ হয় গল্পই। যে গল্প মুখের ভাষায় বলা যায় না, দেহের সর্বাঙ্গের ভাষায় বলতে হয়। নৃত্য এখানে নাচ নয়, সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি। ব্যালে শুধু পায়ের কাজ বা হাতের কাজ নয়, মুদ্রা নামক সাঙ্কেতিক ভাষা তো নয়ই। ব্যালেরিনার ও ব্যালে নর্তকের পোশাক নামমাত্র। ঈষৎ প্রচ্ছন্ন নগ্ন তনু ছন্দে ছন্দে লীলায়িত হয় কঠোর সব সূত্র মেনে। এক এক সময় মনে হয় অতি দুঃসাহসিক যৌগিক ব্যায়াম দেখছি। কিন্তু পরক্ষণেই নৃত্যের হিল্লোল ও স্ফূর্তি সে ভ্রম ভাঙিয়ে দেয়। ব্যালেরিনার নৃত্যসাথী যিনি হন তিনি বীরপুরুষ। ব্যালেরিনা দূর থেকে ছুটে এসে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে

তাঁর গায়ে এলিয়ে পড়েন আর তিনি অনায়াসে তুলে নেন ওঁর দেহ। তুলে নিয়ে তুলে ধরেন সেই গুরু ভার একটি হালকা প্রজাপতির মতো।

অভিজাত মহলে ব্যালের উৎপত্তি। বিপ্লবের পরেও সে তার অভিজাত ধারা ভঙ্গ করেনি। একবারও মনে হলো না যে প্রোলিটারিয়ান মহলে গিয়ে তার গোত্রান্তর ঘটেছে। কোথায় চাষী-মজুর, কোথায় মেহনতী জনতা, কোথায়ই বা শ্রেণীসংগ্রাম, কল কারখানা, যৌথকৃষি, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, শূন্যে ভ্রমণ! সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সমন্বয়ের একটা প্রয়াস তো সাম্যবাদ বা বিপ্লববাদ নয়। ব্যালের জগৎ যেন অপ্সরা ও গন্ধর্বদের রূপলোক সুরলোক। সেখানে জরা মৃত্যু ব্যাধি বা অত্যাচার অবিচার সংঘাত নেই। মতবাদ প্রচারের বাহন হিসাবে ব্যালে একেবারেই অকেজো। তবে রাশিয়ার উপর শ্রদ্ধা না হয়ে পারে না। পৃথিবীতে এখনো যদি নৃত্যোৎকর্ষ পরম সাধ্য হয়ে থাকে তবে তা একমাত্র রাশিয়ায়। এর তুলনায় আর সব দেশের নৃত্যকলা ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ অথবা ঐতিহ্যহীন সাধু উদ্যোগ। আর এঁদের মতো কড়া তালিম পাওয়া পরিশ্রমী শিল্পী কোথায়! গায়ে অতিরিক্ত মাংস নেই, কেউ কেউ তো বেশ কৃশকায়। যেন সার্কাসের বাঘ সিংহ। মঞ্চে যা অনায়াসসাধ্য বলে বিভ্রম জাগায় তার জন্যে দিনের পর দিন একান্তে শরীর সাধতে হয়। জিমন্যাষ্টিক করতে হয়। লেপেশিন্স্কায়া, প্রেওব্রাজেন্স্কি এঁদের প্রতিভার পনেরো আনাই কায়ক্লেশ। ব্যালে একপ্রকার তপস্যা।

কোমা থিয়েটারে এক ঘর দর্শকের মাঝখানে বসে সেদিন সন্ধ্যায় আমি তাদেরি মতো উত্তেজিত ও তন্ময়। অথচ আপনাকে নিয়ে বিব্রত। কেন, বলব? আমার যে কথা ছিল ওদিকে ওকায়ামা যাবার, ওকায়ামার কাছে কুষ্ঠাশ্রমে গিয়ে দুঃখীদের দুঃখের ভাগ নেবার। তার বদলে এ কোথায় এসেছি! এ কী করছি! সুখস্বর্গে এসে রূপভোগ! কাগ্গাই কী মনে করবেন! ভাববেন, এ কী রকম লোক! বুদ্ধের দেশের ছেলে আমি। আমার কিনা সময় হলো না কুষ্ঠরোগীদের জন্যে! কাম্য হলো অপ্সর-সান্নিধ্য!

মনকে বোঝালুম, কী করব! আমি যা আমি তাই। ভগবান আমাকে যে রকম করে গড়েছেন আমি সেই রকম। কেউ যদি বলে খারাপ লোক তবে খারাপ লোক। শিল্পী আমি। আমার টান রূপের প্রতি, সৌন্দর্যের

প্রতি। এ টান উপেক্ষা করলে হয়তো মহান হতুম, কিন্তু সে শক্তি আমার নেই। আর আমার নিয়তিও আমাকে এই দিকেই টেনেছে। শিল্পী যখন রূপভোগ করে তখন কেবল তার নিজের জন্যে করে না, করে বহুজনের তরে। আমার চোখ দিয়ে আমার পাঠকরাও দেখেন। ভোগ করেন।

পরের দিন আমাদের রাষ্ট্রদূত ভবনে লেপেশিন্স্কায়াদের মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ। এলেন তিখোমিরনোভা, প্রেওব্রাজেনস্কি প্রভৃতি জনা দশ-বারো সহযোগী। এলেন না কেবল প্রিমা ব্যালেরিনা। আট বারের উপর আরো কয়েক বার আঁকোর নেচে তাঁর নাকি গুল্‌ফ গেছে ভেঙে। হায়, হায়! কী গোঁয়ার ঐ দর্শকগুলো! দুঃখ হলো তাঁর জন্যে, পরবর্তী দর্শকদের জন্যে। আর বেশী দিন তাঁর স্থিতি নয়। আর কি কোনো দিন তাঁকে দেখতে পাব! দুঃখ হলো আমার নিজের জন্যেও। কিন্তু হয়েছিল দেখা। কবে, কোথায়, কেমন করে তা যথাকালে বলব। গুল্‌ফ ভেঙে যায়নি। পা মচকেছিল।

হ্যামলেট না থাকলে হ্যামলেট নাটক জমবে কেন? আমাদের পার্টি জমল না। তবে ভোজনের শেষে উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে আলাপ হয়ে গেল জন কয়েকের সঙ্গে। একসঙ্গে ফোটো তোলাও হলো। ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি, তিখোমিরনোভা আমার হাত ধরে ধরে হাঁটলেন। হেঁটে চললেন মুভি ক্যামেরার অভিমুখে। মোশন পিকচার উঠল তাঁর সঙ্গে আমার।

কথাপ্রসঙ্গে রুশ দূতাবাসের রোজানভ বললেন, "তৃপ্তি হতো যদি আস্ত একখানা ব্যালে দেখতেন। অমন টুকরো-টাকরা দেখে কি তৃপ্তি হয়!" আমি বললুম, "আস্ত একখানা ব্যালে দেখতে আমার তো একান্ত সাধ। কিন্তু টিকিট পাই কী করে! পেলে মিলিয়ে দেখতুম আনা পাভলোভার সঙ্গে অল্‌গা লেপেশিন্স্কায়াকে।" ভদ্রলোক বললেন, "আচ্ছা, মনে রাখব।" দ্বিতীয় বার সৌজন্য নিতে আমার কুণ্ঠা ছিল। সেইখানে ছেদ টানলুম। পরে আর তাঁকে মনে করিয়ে দিইনি।

॥ উনিশ ॥

রুশ অতিথিরা বিদায় নিলে পরে তাঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন আমাদেরি দূতাবাসের শ্রীমতী—"তাই তো! রাশিয়ানরা তো বেশ নর্মাল!"

তা শুনে হাসাহাসি পড়ে গেল। নর্মাল হবে না তো কী হবে! স্নাবনর্মাল! কিন্তু মন্তব্য যিনি করেছিলেন তিনি হাসতে হাসতে করেননি, হাসাবার জন্যে করেননি। তিনি চিন্তাশীলা। দীর্ঘকাল দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে ও আমেরিকান প্রচারণায় বিশ্বাস করে তাঁর বোধ হয় বদ্ধমূল ধারণা যে রাশিয়ানরা লাল জুজু। সাক্ষাৎ শয়তান। "যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি সকলের মূলে কমিউনিষ্টি।"

কিন্তু পাশাপাশি এক টেবিলে বসে গল্প করে খানাপিনা করে ও তার পরে উদ্যানে পায়চারি করে তাঁর সে ধারণা টলেছিল। রাশিয়ানরা আমাদেরি মতো মানুষ। কমিউনিস্ট কি না সে কথা মনেই আসে না। তা ছাড়া যারা আর্ট নিয়ে থাকে তারা আর্ট নিয়েই মশগুল। আর আর্টের জগতে আত্মপর নেই। যে সমজদার সে-ই আপনার। আমরা ওদের নৃত্য দেখে সুখী। ওরা আমাদের সুখ দেখে সুখী।

অতিথিদের মধ্যে কেবল যে শিল্পীরাই ছিলেন তা নয়। ছিলেন রুশ দূতাবাসের গণ্যমান্যরাও। আমার পার্শ্ববর্তিনী তাঁদের একজনের স্ত্রী। মহিলাটি দস্তুরমতো বুর্জোয়া। ছেলেমেয়েদের চিন্তাই তাঁর প্রধান চিন্তা। একটিকে দেশে রেখে এসেছেন। স্কুলে দিয়েছেন। আরেকটি ছোট। কাছে রেখেছেন। কথাবার্তায় অবিকল ইংরেজ গৃহিণী বা মার্কিন গৃহিণীর মতো। একটু আঁচড়ালে প্রাচ্য প্রকৃতিও ফুটে বেরোয়। আমাদের সঙ্গে খুব বনে। রাজনীতি পরিহার করলে কথাবার্তায় আর কোনো বাধাবিঘ্ন নেই। ওই যে একটা সংস্কার আছে রাশিয়ানরা নিজেদের গুপ্তচরদের ভয়ে প্রাণ খুলে কথা কয় না এটা হয়তো এক কালে সত্য ছিল। এখন জমানা বদলে গেছে। আমরা তো সমানে আড্ডা দিলুম। তবে সর্বক্ষণ সজাগ ছিলুম যাতে রাজনীতির ধারে কাছে না যাই।

সেদিন বিকেলে আমি স্থির করেছিলুম জাপানী ফিল্ম দেখতে যাব। ফিল্মের নাম "বাঙ্কা"। তার মানে শোকাত্মক কবিতা। রাস্কো হারাদার এই

নামের উপন্যাসটি এক বছরে ছ' লাখ বিক্রী হয়েছে। কিন্তু জাপানী ভাষা তো আমি বুঝব না। আমার দোভাষী হবে কে? আকিরা ওগাওয়া বলে সেই যে ছেলেটি জাপানের প্রথম সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। ছেলেটি কিন্তু "বাস্কা"র নাম শুনে বেঁকে বসল। বলল, "ওসব মেয়েলি গল্প আমার ভালো লাগে না।" তখন জানতুম না গল্পটা কী নিয়ে। একটি মেয়ে আরেকটি মেয়ের স্বামীকে ভালোবাসে, অথচ একই সঙ্গে সেই আরেকটি মেয়েকেও ভালোবাসে। 'তেমনি' করে। দ্বিতীয় মেয়েটি আত্মঘাতিনী হয়।

"বাস্কা" দেখা হলো না। তার বদলে দেখা হলো "দনজোকো"। গর্কির প্রসিদ্ধ নাটক "Lower Depths"-এর জাপানী ভাষান্তর ও রূপান্তর। কুরোসাওয়া প্রযোজিত "রাশোমন" তো দেখেছি কলকাতায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফিল্ম। তাঁরই নতুন কীর্তির আকর্ষণে চললুম চিয়োদা সিনেমায়।

মূল নাটকটির রুশ ভাষায় অভিনয় বছর ত্রিশ আগে লণ্ডনে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। যাঁরা দেখিয়েছিলেন তাঁরা মস্কো আর্ট থিয়েটারের শিল্পী। যত দূর মনে পড়ে দেশত্যাগী। সেই অভিজ্ঞতার পর এই অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর হলো না। এক ভাষাকে আরেক ভাষায় তর্জমা করা তত শক্ত নয়, যত শক্ত এক দেশকে আরেক দেশে তর্জমা করা। রাশিয়াকে জাপান করা। তাও হয়তো সম্ভব, কিন্তু কুরোসাওয়া অসাধ্যসাধনে হাত দিয়েছেন। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার আশাহীন জগদ্দল অন্ধকারকে স্থানান্তরিত ও কালান্তরিত করতে গেছেন মেইজি অভ্যুদয়পূর্ব জাপানের অনাধুনিক অন্ধকূপে। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তোকুগাওয়া শোগুনশাসিত জাপানে বিপ্লবের পূর্বাভাস বা পদধ্বনি কোথায়! পরেই বা কোথায়! দেশান্তরিত করতে হলে যা যা করা দরকার করা হয়েছে, কিন্তু কালান্তরিত করা যায় না বলে ঠিক সুরটি বাজেনি।

তা হলেও মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করলুম অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিস্ময়কর টীমওয়ার্ক। শুনলুম আট মাস ধরে তাঁরা দিনের পর দিন একসঙ্গে মিলে রিহার্সল দিয়েছেন। যে যার সুবিধামতো স্টুডিওতে এসে আপনার শুটিং দিয়ে চলে যাননি। প্রযোজকও জোড়াতালি দেননি। প্রত্যেকের জন্যে সকলে দায়ী। সকলের জন্যে প্রত্যেকে দায়ী। টীম থেকে আলাদা করে

নাম যদি কারো করতে হয় তবে একজনের নাম করি। তোশিরো মিফুনে। ইউরোপ আমেরিকায় যেসব জাপানী ফিল্ম নাম করেছে তার কয়েকটিতে ইনি অভিনয় করেছেন।

কুরোসাওয়া দুঃসাহসিক প্রযোজক। টেকনিকের দিক থেকে নিত্য নূতন পরীক্ষা করে চলেছেন। আবহসঙ্গীতকে একেবারেই বাদ দিয়েছেন। সঙ্গীত বলতে যদি কিছু থাকে তবে তা অভিনেতাদের শিস দেওয়া বা গুনগুন করা। ফোটোগ্রাফি তো আশ্চর্য স্বাভাবিক। কুরোসাওয়ার ফিল্মের অত যে আদর তার প্রধান কারণ বোধ হয় তার ছবিত্ব। নাচ নয়, গান নয়, ভাঁড়ামি নয়। এমন কি তারকাদের যৌন আবেদনও নয়।

রাষ্ট্রদূত ভবনে ফিরে দেখি মাদাম তোমি কোরা এসেছেন। গ্রামোফোনে জাপানী কোতো বাজনার রেকর্ড দিয়েছেন। আমাকে দেখানোর জন্যে তিনি এনেছিলেন গুরুদেবের জাপানপ্রবাসের ফোটোগ্রাফ ও অটোগ্রাফ। কতক কবিতা আগে পড়েছি বলে মনে হলো না। এসব জাপানের সর্বত্র ছড়ানো। অনেক দিনের অশেষ পরিশ্রমে সংগ্রহ করেছেন মাদাম। সমস্ত তিনি দান করতে চান ভারতকে। আর চান কবিগুরুর আঁকা ছবিগুলির ও শান্তিনিকেতনের প্রাচীর চিত্রগুলির রঙীন ফোটো তুলে ভাবীকালকে দান করতে।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবলে চন্দ্রশেখর বললেন, "নাঃ। এ ডিম মুখে দেওয়া যায় না। জানেন, এরা মুরগীকেও মাছ খাওয়ায়। মুরগীর ডিমেও মেছো গন্ধ।" তাই তো। জাপানের মুরগীও মৎস্যগন্ধা। তবে খুঁজলে পাওয়া যায় অন্যরকম মুরগীর ডিম, মৎস্যগন্ধ নাহি তায়। রাঁধুনীটি জাপানী, তাকে বলে দেওয়া হলো যে-মুরগীর ডিমে মাছের গন্ধ নেই সেই ডিম কিনতে। সে কী মনে করল, কে জানে! বোধ হয় ভাবল, একই খরচে ডিমও খাচ্ছিলে মাছও খাচ্ছিলে, অন্তত অর্ধভোজন করছিলে। তা তোমাদের কপালে সইবে কেন? মাছের খুশবু না হলে খাওয়া হয় কখনো! হলোই বা মুরগীর ডিম।

ওকাকুরা-সান এলেন। কথা ছিল তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করতে। সারা দিনের প্রোগ্রাম। আমি তার সঙ্গে জুড়ে দিলুম সন্ধ্যার। সিনেরামা দেখতে সাধ ছিল। দেশে তো

দেখবার জো নেই। জাপানে দেখে যাই। ঝা দম্পতি রাজী। ওকাকুরা রাজী। কিনলুম চারজনের টিকিট। সিনেমার তুলনায় বেজায় দামী। সিনেরামা তোকিয়োর একটিমাত্র থিয়েটারে দেখায়। মারুনৌচির ইম্পিরিয়াল থিয়েটার। তার পর্দা ইত্যাদি বিশেষ প্রকারের। তিন ভাইমেনসনের ফিল্মের উপযোগী।

ওকাকুরা-সান আমাকে যেখানে নিয়ে গেলেন সেটা একটা দোতলা কাঠের বাড়ী। হাত যোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে তৈরি। তাই তাকে বলে গাশিয়ো রীতির গৃহ। শুনলুম এখন মধ্য জাপানের দুটিমাত্র স্থানে সে ধরনের ভদ্রাসন দেখতে পাওয়া যায়। তাতে একান্নবর্তী পরিবারের পঞ্চাশ জনের বাস। হঠাৎ তোকিয়ো শহরে সে রকম বাড়ী বানালো কে? কেউ না। বছর দুই আগে গ্রাম ডুবে যাচ্ছে দেখে গ্রামের বাড়ীঘর সরানো হয়। সরিয়ে আনা হলো একটিকে মধ্য জাপান থেকে পূর্ব জাপানে। তোকিয়োতে এনে তাকে রেস্টোরাণ্টে পরিণত করা হলো। রেস্টোরাণ্টের নাম রাখা হলো "ফুরুসাতো"। মানে মাতৃভূমি। অতিথিরা সেখানে বিশুদ্ধ জাপানী পদ্ধতির ভোজ্য পান। আর পান মধ্যযুগের জাপানকে। বাড়ীখানার বয়স কয়েক শতাব্দী হবে। আগেকার দিনে গাশিয়ো রীতির গৃহ নির্মাণ করতে লোহার পেরেক লাগত না। তোকিয়োতে এনে অনেক অদলবদল করা হয়েছে।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন জনা চারেক বন্ধু। তাঁদের একজন দোভাষী তরুণী মিস্ এতো। আর তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে বিশিষ্ট আমার সমবয়সী কবি শিম্‌পেই কুসানো। এঁকে আমি পেন কংগ্রেসের ভোজে লক্ষ করেছিলুম। লক্ষ করবার মতো চেহারা ও পোশাক। ইনি কিমোনো পরেন। স্বাতন্ত্র্যব্যঞ্জক সহাস্য মুখ। কে লোকটা, জানতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে সময় যোগাযোগ ঘটেনি। পরে ঘটবে জানতুম না। ঘটল দেখে আনন্দিত হলুম। কুসানো-সান বেশ রসিক পুরুষ। তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য হলো— ব্যাঙ্। হাঁ, ব্যাঙ্। ব্যাঙ্ তাঁর চোখে মানুষ আর মানুষ তাঁর চোখে ব্যাঙ্। "কেন? ব্যাঙ্‌কে কি ভালোবাসা যায় না? আমি তো ঐ কিম্ভূত প্রাণীটিকে অত্যন্ত ভালোবাসি। ব্যাঙ্ খেতেও ভালো লাগে।" কবি একটি তুলি নিয়ে ব্যাঙ্ এঁকে দেখালেন। ভয়ঙ্কর জীব। এক শয়তান

ধনপতি কি রণপতি। মনে হলো কবি এঁদের সাক্ষাৎভাবে আক্রমণ না করে কার্টুন এঁকে ব্যঙ্গ করছেন। ব্যাঙ্ যেমন তাঁর ব্যঙ্গের পাত্র তেমনি সহানুভূতিরও। নিচের তলার শোষিত ও শাসিত মানুষও তাঁর দৃষ্টিতে মণ্ডূক। তাঁর ব্যাঙ্ কবিতার এক সঙ্কলন বেরোবে। আমাকে দিয়ে সেই গ্রন্থের নাম লিখিয়ে নিলেন বাংলা হরফে জাপানী তুলিতে। "ব্যাঙ্। কুসানো।"

তাঁর প্রথম বয়স কেটেছে দক্ষিণ চীনে। ক্যান্টনে। দেশে ফিরে রকমারি কাজে হাত দেন। খবরের কাগজ। মাসিকপত্র। ভোজনালয়। গোড়ায় ছিলেন নৈরাজ্যবাদী, পরে হয়ে উঠলেন বোহিমিয়ান। দেখে চেনা যায় মুক্ত পুরুষ। তাঁর সঙ্গে আহারে বসে সেদিন আর যাই খাই ব্যাঙ্ খাইনি আমরা।

"ফুরুসাতো" থেকে বেরোবার সময় চোখে পড়ল এক ঢেঁকি। ঢেঁকির পাড় দিতে মানুষ নেই। নল বেয়ে জল আসছে, পিছন দিকে জল ভরে গেলে ঢেঁকি আপনি উঠে আপনি পাড় দিচ্ছে। একে বলে "সুইসা" বা জলঢেঁকি। খুবই সোজা কৌশল।

এর পর ওকাকুরা-সান আমাকে নিয়ে চললেন দক্ষিণ থেকে উত্তরে। দোভাষী মিস্ এতোকে বললেন সঙ্গে চলতে। দেখলুম আমরা চিন্জান্সোর কাছে গাড়ী নিয়ে ঘুরছি। বাড়ী খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরতে ঘুরতে পাওয়া গেল বাড়ী। সেখানে থাকেন জাপানের বিখ্যাত কবি হারুও সাতো। কেবল কাব্যে নয় সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও এঁর মূল্যবান স্বাক্ষর। বয়স ষাটের কোঠায়। তানিজাকির সমসাময়িক। জাপানের জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকরা কেউ পেন কংগ্রেসে যোগ দিতে যাননি। বিদেশীর কাছ থেকে দূরে থাকতে চান, স্বদেশীর কাছেও আশানুরূপ সম্মান পান না। নিভৃতবাসে ব্যাঘাত ঘটবে বলে বড় একটা দেখা দেন না। বিদেশীকে তো নয়ই। আমার বেলা ব্যতিক্রম হলো।

সম্ভ্রান্ত রাজবৈদ্য বংশে সাতো মহাশয়ের জন্ম। বংশের নিয়ম ভঙ্গ করে তিনি কাব্যচর্চা করেন। তাঁর কবিতা যেমন রোমান্টিক জীবনও তেমনি। তোকিয়োর কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ। যেহেতু সেকালের একজন সেরা রোমান্টিক লেখক কাফু নাগাই সেখানে বক্তৃতা দিতেন। ডিগ্রী না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ। তার পর শহর ছেড়ে-এক গ্রামে গিয়ে বসবাস। সঙ্গে

দুটি বেড়াল, দুটি কুকুর। এবং তাঁর স্ত্রী। ভূতপূর্ব অভিনেত্রী। আনুষ্ঠানিকতা মানতেন না গ্যয়টের মতো, তাই বিবাহটা গ্যয়টের পদাঙ্ক অনুসারী। "অসুস্থ গোলাপ" নামে এক উপন্যাস লিখে সাহিত্যে উপনয়ন। গোলাপ কী সুন্দর, কিন্তু তার সৌন্দর্যে অসুখের ছোঁয়াচ লেগেছে। "হায় রে গোলাপ! তোর যে অসুখ!" এই উপলব্ধি নিয়ে লেখা হলো "পল্লী বিষাদ"। লেখাটি নাকি তাঁর অন্যান্য রচনার প্রতিনিধি। তিনি "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" তত্ত্বে বিশ্বাসবান। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবের পর এলো প্রাচীন চৈনিক প্রভাব। ক্রমেই তাঁর সেই ডেকাডেন্সের সুর মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বিশ্লেষণশীল সমালোচক হয়ে ওঠেন। ওদিকে বৌদ্ধধর্মের দিকেও মন যায়। এখন তিনি শহরে থেকেও সব কিছুর বাইরে।

পাশ্চাত্য ধরনের বসবার ঘরে চেয়ারে বসলুম আমরা। "ফুরুসাতো"র মতো মেজেতে নয়। কিন্তু কবির পরনে কিমোনো। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথা বলেন কম। মহত্বব্যঞ্জক মুখভাব। জাপানের লজ্জাকর পরাভব তাঁকে মর্যাদাভ্রষ্ট করেনি। তিনি চীনের ক্লাসিকাল সংস্কৃতির ভক্ত। কিন্তু বর্তমান চীনের সংস্কৃতির পক্ষপাতী নন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন কোন লেখকের প্রতি আমার পক্ষপাত। আমি উত্তর দিলুম. "টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, রম্যা রল্যাঁ।" তা শুনে বললেন, "এই উত্তরের আলোয় আপনাকে আমি চিনতে পারছি।"

কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের আয়োজক ছিলেন কিয়োতোয় পরিচিত আর্ট ক্রিটিক রিয়ুগেন ওগাওয়া। আমার প্রতি এঁর অহেতুক প্রীতি। শুধু যে সন্ত হোনেন সম্বন্ধে স্বরচিত পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন তাই নয়, চিঠি লিখে বলেছিলেন পরজন্মে আবার আমাদের দেখা হবে। ইহজন্মেই আবার দেখা হয়ে গেল কবি-ভবনে। জাপানীরা আমাদের মতো জন্মান্তরবাদী। দেশে ফিরে কাহুগাইর মুখে শুনি সাতো নাকি লিখেছেন আমার সঙ্গে তাঁর পূর্বজন্মের সম্পর্ক। শুনে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। জাপানে কত লোকের সঙ্গে যে আমার দর্শনমাত্র ভাব হয়ে গেল তার ব্যাখ্যা খুঁজতে হলে প্রাক্তন মানতে হয়।

কবিগৃহিণী আমাদের জাপানী মতে চা খাওয়ালেন। ভেবেছিলুম সেই শেষ। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি আমাকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিলেন যে আমি

তেম্পুরা খেতে ভালোবাসি। কথা বলতে বসে সেটা ভুলে গেছলুম। সবাই উঠছেন দেখে মনে হলো এবার আমাকে বিদায় দেওয়া হবে। তা নয়। দু'খানা বড় বড় মোটরে করে সবান্ধবে নিরুদ্দেশযাত্রা। আমরা যেখানে গেলুম সেটি একটি বনেদী তেম্পুরা রেস্টোরাণ্ট। সেখানে কেবল তেম্পুরাই ভেজে খাওয়ায়। তার নিজের একটি খাইয়ে দল আছে। ঘরানা খাইয়ে। আমি গেলুম ঘরানা খাইয়ের ঘরোয়া অতিথি রূপে। রাঁধুনীটি নাকি চিন্‌জান্‌সো থেকে আমদানি। তেম্পুরার ভিয়ান আমাদের সামনে। আমরা এক পাশে আর রাঁধুনী এক পাশে। মাঝখানে একটা জালি। জালির উপর সদ্য-ভর্জিত মৎস্য বর্ষিত হচ্ছে আর আমরা যে যার থালির উপর তুলে নিচ্ছি। কাঁচা মাছ কেমন করে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে তেম্পুরায় পরিণত হয় সে দৃশ্য আমাদের সমক্ষে। গল্প করতে করতে একটার পর একটা তেম্পুরা খেয়ে চলেছি। ভাজা মাছ বললে ঠিক বোঝা যাবে না কী জিনিস। কাঁটা বেছে পাতলা করে কাটা মাছ দিয়ে হয় তেম্পুরা। লুচির মতো ছোঁকা হয় তপ্ত তেলে। তার আগে batter-এ ডুবিয়ে। খেতে খেতে গুনতে ভুলে গেছি মোট ক'খানা হলো। এত মাছ জীবনে খাইনি। জানতে চাইনি কোনটা কী মাছ। হঠাৎ খেয়াল হলো, জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, এটা কী মাছ?" কবি বললেন, "কাটল ফিশ।"

হরি হরি! কাটল ফিশ! তার মানে অক্টোপাস। জাপানে পৌছনোর পরের দিন এক পার্টিতে অক্টোপাসের দাঁড়া দিয়েছিল, খাইনি। এখন আস্ত অক্টোপাসটাই খাব! তবে কাটল ফিশ ঠিক অক্টোপাস নয়। অক্টোপাসের অষ্ট ভুজ। কাটল ফিশের দশ ভুজ। স্বাদ নিশ্চয়ই ভিন্ন। কিন্তু সে পরীক্ষা করছে কে? আমি? আমি সোজা বলে বসলুম, খাব না। হয়তো অভদ্রতা হলো। হয়তো কেন, নিশ্চয় অভদ্রতা হলো। কিন্তু জাপানীরা বিদেশীদের ক্ষমাচক্ষে দেখে। আমি হাত গুটিয়ে বসলুম, আর আমার সহভোজীরা কাটল ফিশ আস্বাদন করলেন। জাপানীদের নৈশভোজন সারা হয় সন্ধ্যার পূর্বে। সেদিনকার তেম্পুরা পার্টি নৈশভোজনেরই বিকল্প।

কবি সেদিন তাঁর ভবনে আমাকে তাঁর কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। কবিতা, কিন্তু হাইকু নয়। তার পর স্নেহভরে উপহার

দিয়েছিলেন তাঁর লেখা মূল্যবান একখানি বই। সংখ্যাচিহ্নিত লিমিটেড এডিশন। একটি বৌদ্ধ মূর্তির ইতিহাস তথা উপন্যাস।

দেশে ফিরে একদিন এক জাপানী বন্ধুকে কথাপ্রসঙ্গে বলি, জাপানী সাহিত্যিকদের স্ত্রীভাগ্য ভালো। স্ত্রীরা কেমন যত্ন করেন স্বামীদের। আচ্ছা, তিনিই কি সেই অভিনেত্রী যাঁর কথা আছে "পল্লীবিষাদে" ?

বন্ধু বললেন, না। আপনি জানেন না বুঝি? জাপানে সবাই জানে।

গল্পটা সত্যি কি না যাচাই করিনি। ভেবেছিলুম লিখব না, কিন্তু না লিখলে জাপানকে চেনা যাবে না। আমাদের দেশের মতো জাপানেও গুরুজনের নির্বন্ধে বিবাহ করতে হতো। তানিজাকি, সাতো প্রভৃতি যুবকরা বিদ্রোহী হয়ে স্থির করলেন নতুন কিছু করবেন। একটি পার্টিতে সমবেত হলেন কয়েকটি তরুণতরুণী। একালের স্বয়ংবর সভা। না, স্বয়ংবর সভা নয়, স্বয়ংকন্যা সভা। মনোনয়নটা তরুণীদের নয়, তরুণদের। বিধি হলো, যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরই অগ্রাধিকার। তিনি যাঁকে বধূ রূপে বরণ করবেন তাঁকে আর কেউ পাবেন না। তাঁর চেয়ে যিনি বয়সে যত ছোট তাঁর মনোনয়ন তত পরে। মনোনয়নের পরিসর তত কম। তানিজাকি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি যাঁকে পছন্দ করে বেছে নিলেন সাতো তাঁকে স্বয়ংবরণের সুযোগ পেলেন না। আর যাঁরা বাকী রইলেন তাঁদেরি একজনকে নির্বাচন করলেন। এইভাবে বিয়ে হয়ে গেল তানিজাকি ও সাতো দুই বন্ধুর।

দশ বছর পরে সমুদ্রতীরে দুই দম্পতির হাওয়াবদল। জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে শোনাতে শোনাতে দুই গৃহিণী বললেন পরস্পরকে, ভাই, আমি কি ওঁকে চেয়েছি? উনিই চেয়েছিলেন আমাকে। আমাকে চাইতে দিলে আমি চাইতুম তোরটিকে। এখন জীবন বৃথা।

কর্তাদের ভুলে গৃহিণীদের জীবন বৃথা শুনে কর্তারা বললেন, বেচারিদের বাকী জীবনটা যাতে সুখের হয় তাই করা যাক। ওঁদের মনোনয়নই মেনে নেওয়া যাক।

হাওয়াবদল করতে এসে আর যা বদল হলো তা গুরুজনদের অনুমোদন নিয়ে। এমন কি সন্তানদেরও অনুমোদন নিয়ে। পুরোনো মা'র বদলে নতুন মা পাবে শুনে তারা নাকি আলাদিনের মতো আহ্লাদিত হয়েছিল। সন্তানরা মায়েদের সঙ্গে গেল না। বাপেদের সঙ্গেই রইল। এর পর সংবাদপত্রে

দুই সাহিত্যিক দিলেন বিবৃতি। দেশের লোকেরও অনুমোদন চাই। আইন অন্তরায় হলো না। স্বয়ংকন্যার ভুল শোধরাল স্বয়ংবর। নারীর ইচ্ছা। তারপর আরো ত্রিশ বছর কেটে গেছে। যা হয়েছে তা সুখেরই হয়েছে। তবে ওই যা বলেছি। কাহিনীটা সত্য কি বানানো যাচাই করা হয়নি।

ওকাকুরা আর আমি দিন ফেলেছিলুম তানিজাকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রেলপথে আতামি যাব। কিন্তু খবর এলো তানিজাকি হঠাৎ কিয়োতো চলে গেছেন। নিরাশ হতে হলো। এখন সেই নৈরাশ্যটা দ্বিগুণ মনে হচ্ছে। কারণ ওই কাহিনীটা আধখানা হয়ে রইল। বাকী দু'জন নায়ক-নায়িকার দর্শনলাভ হলো না।

সেদিন সাতো দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চললুম ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে সিনেরামা দেখতে। একটু বাদে ঝা দম্পতি এসে পৌঁছলেন। চারজনে মিলে ভিতরে গিয়ে দেখি প্রেক্ষাগৃহের মাঝামাঝি আসন পড়েছে। বইখানার নাম "জগতের সাত আশ্চর্য"। মনে করেছিলুম প্রাচীন জগতের। তা নয়। প্রাচীন তথা আধুনিক জগতের। এবং সাতের চেয়েও বেশি। আসলে ওটা পৃথিবী পরিক্রমা। জাপান দিয়ে আরম্ভ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে শেষ। যেসব বিচিত্র দৃশ্য দেখানো হলো তার মধ্যে ভারতের মহৎ দৃশ্য তাজমহল ব্যতীত একটিও ছিল না। কাঞ্চনজঙ্ঘা না দেখিয়ে দার্জিলিঙের ক্ষুদ্র রেলপথে পাগলা ইঞ্জিন ও বন্য হাতী। বন্য না আর কিছু। দিব্যি পোষ মানা হাতী। তার পর সাপের সঙ্গে বেজির লড়াই। অত খরচপত্র করে বিজ্ঞানের উন্নতির পরিচয় দিতে সিনেরামা সৃষ্টি হলো তো আর্টের অবনতির সাক্ষ্য দিল। পিছন দিক থেকে তিন-তিনটে প্রোজেকটার সর্বক্ষণ সক্রিয়। পর্দাটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি। মনে হচ্ছিল লম্বা লম্বা সারি সারি তার ঝুলছে, যেন টানা আছে, পোড়েন নেই।

সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। মঞ্চ যেন আমাকে সবলে টানছিল, সবেগে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। দর্শক আর দৃশ্য যেন এক অপরের অংশ নিচ্ছিল। ঝা'দের তো সেদিন মাথা ধরে গেল। সিনেরামা থেকে ফেরবার পথে এক জায়গায় ভিড় দেখে ভিড়ে যাই। শিন্তোদের এক মণ্ডপে নাচ চলেছে। তরুণ তরুণী দুই আছে। শিন্তোদের কী একটা পার্বণ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছিল। দিনের বেলাও চোখে পড়েছে ছেলেমেয়েদের রঙচঙে জামা,

খেলনা, হাসিমুখ। রাস্তায় রাস্তায় কাঁধে কাঁধে পাল্‌কির মতো ঘুরছে শিস্তো পীঠস্থানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

পরের দিন ওকাকুরা আমাকে নিয়ে গেলেন প্রসিদ্ধ চিত্রকর শোকিন কাৎসুতার বাড়ী। বয়স আশির কাছাকাছি। এখনো বেশ শক্ত। সৌম্য। অর্ধ শতাব্দী আগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বছর দুই বাস করে গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথদের সঙ্গে ছবি এঁকেছিলেন। সেকালের আলবাম দেখালেন। রবীন্দ্রনাথের একখানি দুষ্প্রাপ্য ফোটো দেখতে পেলুম।

কাৎসুতা-সান স্বয়ং আমাকে নিয়ে বেরোলেন। তাঁর গুরু হাশিমোতোর বহু পুরাতন চিত্রগুলি বহু স্থান থেকে সংগ্রহ করে উএনো মিউজিয়মে প্রদর্শিত হচ্ছিল। আমাকে প্রদর্শন করবেন। পথে যেতে যেতে একটি বাড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাইকানের গৃহ। তাইকান এখন সঙ্কটাপন্ন পীড়িত।" রবীন্দ্রনাথের বন্ধু সেই মহান বর্ষীয়ান্ চিত্রকর ইতিমধ্যে গতায়ু হয়েছেন।

একটি রেস্টোরাণ্টে নিয়ে গিয়ে কাৎসুতা-সান আমাকে প্রথমে মধ্যাহ্ন-ভোজন করালেন। জাপানী রীতিতে। ততক্ষণে ওকাকুরা গেছেন, ইনাজু এসেছেন। তার পর আমরা মিউজিয়মে গিয়ে হাশিমোতো কক্ষে প্রবেশ করলুম। ছবিগুলির কতক গত শতাব্দীর শেষভাগের, কতক এই শতাব্দীর আস্তভাগের। কতক সরন্ত দরজায়, কতক ঝুলন্ত পটে, কতক পর্দায়, কতক ফ্রেমে। পাশ্চাত্য প্রভাব তত দিনে ব্যাপক হয়েছে, কিন্তু হাশিমোতোর মতো শিল্পীর মনোহরণ করেনি। নতুন জাপানে পুরাতন জাপানের ধারা বহমান রেখেছে তাঁর দৃষ্টান্ত, কিন্তু ক্ষীণ হয়ে এসেছে সে ধারা। আধুনিকরা যত বেশী ঐতিহ্যসচেতন তার চেয়ে বেশী ইউরোপসচেতন।

এর পরে ইনাজু-সান আমাকে নিয়ে যান একটি আর্ট গ্যালেরিতে, সেখানে অত্যাধুনিক জার্মান চিত্রকলার নিদর্শন সজ্জিত। প্রতিলিপি নয়, আসল ছবি। এ জিনিস ভারতবর্ষে দেখবার জো নেই। এর টেকনিক, এর বক্তব্য আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য, তবে এর শক্তি অনস্বীকার্য।

ইণ্টারন্যাশনাল হাউসে সে দিন আমার সান্ধ্য আহার ও বক্তৃতা। রকফেলারের অর্থানুকূল্যে ও জাপানীদের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত এই ভবন জাপানের একজন সাংস্কৃতিক নেতার উদ্যোগের ফল। এখানে হোটেলের

চেয়ে কম খরচে হোটেলের মতো আরামে থাকতে খেতে পারা যায়। অন্যতম কর্ণধার গর্ডন বোলস-এর সঙ্গে, আলাপ হলো। গান্ধীবাদ ও আধুনিকতা নিয়ে আমাদের মনের দ্বন্দ্ব ইণ্ডিয়া স্টাডি গ্রুপের বন্ধুদের বোঝালুম। উদাহরণ দিলুম বসন্তের টীকার। বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলনের কথা বললুম। অহিংসা কত দূর যেতে পারে শ্রেণীবিবোধ এড়াতে বা মেটাতে।

তোয়ামা ৎস্যুচি নিংগিয়ো

॥ বিশ ॥

যা ভেবেছিলুম তাই। বাড়ী থেকে চিঠি এলো, আর কত দেরি করবে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তো দোসরা পারমিট ফেরৎ চাইছে। চলবে কী করে?

ঝা-দের অতিথি না হলে চলত না সেটা ঠিক। আমাকে বাধ্য হয়ে চব্বিশের প্লেনে জায়গা খুঁজতে হতো। না মিললে জাপানী বন্ধুদের কথামতো এক-একজনের সংসারে এক-এক রাত কাটাতে হতো। আর নয়তো তামাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে কয়েক রাত। চন্দ্রশেখর ও তাঁর সহধর্মিণী লক্ষ্মী দেবী আমাকে কাছে রেখে বিস্তর খরচ বাঁচিয়ে দিলেন, আর বিস্তর সময়। সময়ের সঙ্গে রেস্ দিতে হচ্ছিল, তাই সময় যাতে বাঁচে সেইটেই শ্রেয়।

মনঃস্থির করলুম যে চব্বিশে ফিরে গেলে অসময়ে ফিরে যাওয়া হবে, আটাশেই সুসময়। সেই অনুসারে প্রোগ্রাম ছকা গেল। প্রতিদিনই নতুন নতুন নিমন্ত্রণ আসছিল। কল্পনাতীত সৌভাগ্য। আমেরিকার শান্তিবাদীরা নাকি জাপানী শান্তিবাদীদের খবর দিয়েছেন যে আমি এসেছি, আমাকে দিয়ে যেন কিছু বলিয়ে নেওয়া হয়। এঁরা কমিউনিস্ট নন, কোয়েকার। সময় নেই বলে এঁদের প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সময় করে নিতে হয়।

একুশে সেপ্টেম্বর শনিবার প্রাতরাশের পর একটু য়্যাডভেঞ্চার করা গেল। একা বেরিয়ে পড়লুম পায়ে হেঁটে তাকাতানোবাবা। ভাষা জানিনে, তা সত্ত্বেও কেনা গেল শিন্‌জুকুর টিকিট। ইলেকট্রিক ট্রেনে ওঠা গেল। নামা গেল শিন্‌জুকু স্টেশনে। সামান্য পথ। একটু ঘোরাঘুরি করে কেনা গেল মিতাকার টিকিট। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছে ইলেকট্রিক ট্রেন। সেটা মিতাকা যাবে কি না জিজ্ঞাসা করার আগেই চলতে শুরু করে দিল। তখন আমিও লাফ দিয়ে উঠে বসলুম। সকালবেলা শহর থেকে শহরতলীতে যাবার সময় ট্রেনে ভিড় হয় না। নয়তো ঝুলন্ত শিকে ধরে দাঁড়াতে হতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হতো।

সঙ্গে মানচিত্র আনতে ভুলে গেছি। ট্রেনে সাধারণত একজন চিৎকারনবিশ থাকে, সে চেঁচিয়ে বলে যায় সামনের দিকের স্টেশনগুলোর নাম। দেখলুম না তাকে। লাজুক মানুষ, বোকা বনতে চাইনে সহযাত্রীর কাছে প্রশ্ন করে, "এ ট্রেন কি মিতাকার দিকে যাচ্ছে?" তিনি যে ইংরেজী বুঝবেনই এমন কী কথা

আছে! একটার পর একটা স্টেশন আসে। মিতাকার আভাস কোনোটাই বহন করে না। জাপানী রেলপথের একটা বিশেষত্ব, যে স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায় সে স্টেশনের আগের স্টেশন ও পরের স্টেশনের নামও রোমান হরফে লেখা থাকে। তা দেখে নামবার জন্যে তৈরি হতে সময় পাওয়া যায়। নয়তো কখন এক সময় মিতাকা আসত, নামটা নজরে পড়ার পূর্বেই ট্রেন ছেড়ে দিত, আর আমি ঘুরতুম গোলকধাঁধায়। যাক, আমার কপাল ভালো। যথাকালে দেখলুম সামনের স্টেশনের নাম মিতাকা, তৈরি থাকলুম, মিতাকা আসতেই সবজান্তার মতো শান্তভাবে নামলুম।

স্টেশনের বাইরে গিয়ে দেখি একখানামাত্র ট্যাক্সি। তাকে বললুম একটিমাত্র শব্দ। "কিরিস্তো।" সে একটিমাত্র কথা না বলে সটান নিয়ে পৌঁছে দিল ইণ্টারন্যাশনাল খ্রীস্টান ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে। ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড হাতে আঁকা একটা নক্শা দিয়েছিলেন। তাই দেখিয়ে ট্যাক্সিকে নিয়ে গেলুম তাঁর আস্তানার সদর দরজায়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশী দিনের নয়। পরমাণু বোমা পড়ে যখন হিরোশিমা বিধ্বস্ত হয়ে যায় তখন আমেরিকায় এক বিবেকী ধর্মযাজক তাঁর যজমানদের বলেন, এ তোমার এ আমার পাপ। এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তিনি যত টাকা চেয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা উঠল। হিরোশিমায় তাঁরা কী যেন বানিয়ে দিলেন, হাসপাতাল না কী। বাড়তি টাকাটা দিয়ে কী করা যায় হিরোশিমার লোকের উপর ছেড়ে দিতেই তারা বলল, বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রীস্টীয় বিশ্ববিদ্যালয়। হিরোশিমায় না করে রাজধানীতেই সেটা স্থাপন করা হোক।

খ্রীস্টানদের অনেকগুলো সম্প্রদায় একত্র হয়ে এটা চালাচ্ছে। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ছেলে মেয়ে দুই একসঙ্গে পড়ে। অধ্যাপকের মতো অধ্যাপিকাও আছেন। শান্তিনিকেতনের মতো। কিন্তু শান্তিনিকেতনের তুলনায় বিস্তীর্ণ ভূমি। তার একাংশ বনানী। বোধ হয় সমস্তটা পূর্বে অরণ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে হটিয়ে দিয়েছে। ঘুরে ফিরে গেলুম ভোজনশালায়। আলাপ হয়ে গেল কয়েকজন অধ্যাপক ও লেখকের সঙ্গে। এক জাপানী অধ্যাপককন্যা বললেন, "আমি ফরাসী। আমি ফরাসী।" কী রকম! বিবাহসূত্রে। বিয়ে করলে চেহারাও কি বদলে যায়! তিনি যে শুধু ফরাসী

তাই নয়। প্যারিসিয়েন। স্বামীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছেন, অবিলম্বে ফিরে যেতে হবে। কোথায় দেশভক্তি! বিবাহিত জীবনের সুখ তাঁর মুখে চোখে উছলে পড়ছিল।

ফ্রান্সেস ক্যাসার্ডের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করে আবার সেই ভাবে শিন্‌জুকু ফিরি, কিন্তু সেখান থেকে আর তাকাতানোবাবা নয়, সরাসরি তোকিয়ো স্টেশন। ভারতের চ্যান্সেলারি তার কাছেই। সেখান থেকে যেতে হবে ৎস্কিজি হোঙ্গানজি মন্দিরে। ওঁদেরি লোক এসে নিয়ে যাবে। এই মন্দিরটির বহির্দ্বার অজন্তার অনুকরণে নির্মিত।

বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিষৎ এর সঙ্গে সংযুক্ত। অধ্যাপক নাকামুরা প্রভৃতি সুধীদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে আহার করা গেল। আহার্য রক্ষিত ছিল এক-একটি ল্যাকারের বাক্সে। সুদৃশ্য। চতুষ্কোণ। আহার শেষ না হতে রাশি রাশি প্রশ্ন বর্ষিত হলো আমার উপর। একসঙ্গে উত্তর দিতে চেষ্টা করলুম। প্রশ্নগুলি ভারত সম্বন্ধে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে, জাপানের সঙ্গে আদানপ্রদান সম্বন্ধে। কয়েকটি তরুণ ছিল, "ইয়ং বুদ্ধিস্ট", তাদেরি কৌতূহল বেশী। বললুম ভারত থেকে বৌদ্ধদের কোনো দিন বিতাড়ন করা হয়নি, বৌদ্ধ ধর্ম লোপও পায়নি, প্রভাব অবশ্য হারিয়েছে, তার কারণ বিহারগুলি রাজসমর্থন হারিয়েছে, অচল হয়েছে মুসলিম আমলে।

নাট্যকার চিগিরি ছিলেন সেখানে। জাপানের চেস্‌ য়্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমাকে দিলেন এক সেট দাবাখেলার সরঞ্জাম। কেমন করে জানলেন যে আমি দাবাখেলা ভালোবাসি? কিন্তু ছোট ছেলের সঙ্গে হেরে গিয়ে অবধি আর আমি খেলিনে। আধুনিক জাপানী নাটক দেখতে যাচ্ছি শুনে চিগিরি বললেন, "আর কী দেখতে চান?" আমি বললুম, "লোকনাট্য।" তিনি বললেন, "তা হলে পল্লীগ্রামে যেতে হয়।" কিন্তু আমার দিনগুলি আগে থেকে ভরা। তা সত্ত্বেও কয়েক ঘণ্টার একটা প্রোগ্রাম করা গেল। পরে একদিন খবর পেলুম যে লোকনাট্যের আয়োজন পল্লীগ্রামে সম্ভব হলো না। আমি যেন টেলিভিসনে দেখি।

এই সব আলোচনা করতে করতে খেয়াল ছিল না যে ওদিকে চ্যান্সেলারিতে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বলেছি মিস্‌ এতোকে। তিনি আমার দোভাষী হয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন জাপানী নাটক "প্রশান্ত পর্বতমালা" দেখতে

হাইয়ুজা থিয়েটারে। হাইয়ুজা থিয়েটার হলো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের থিয়েটার। তাঁরাই মালিক আর পরিচালক। "প্রশান্ত পর্বতমালা" যাকে বলছি তার আসল নাম "শিজুকানারু য়ামায়ামা"। নাট্যকার হুনাও তোকুনাগা তখনো জীবিত ছিলেন। ইতিমধ্যে বিগত।

ছুটতে হলো আবার আমাদের চ্যান্সেলারিতে। গিয়ে দেখি গোটা নাইগাই বিল্‌ডিংটাই বন্ধ। ছ'টা বাজে। কেউ কোথাও নেই। মুশকিলে পড়লুম। চন্দ্রশেখর ও লক্ষ্মীদেবীকে নিমন্ত্রণ করেছি, তাঁরা সরাসরি থিয়েটারে যাবেন, একসঙ্গে চারখানা টিকিট কিনব। মিস্ এতোর উপর ভার ছিল তিনি যেন বিখ্যাত অভিনেতা কেন্‌জি সুসুকিতাকে আমার হয়ে টেলিফোন করেন ও আমাদের জন্যে চারটে সীট সংরক্ষণ করতে অনুরোধ জানান। সুসুকিতা হলেন রিযুগেন ওগাওয়ার আত্মীয়। ওগাওয়ার মুখে "সিস্টার-ইন-ল" শুনে আমি চমকে উঠি। তবে কি অভিনেত্রী? তিনিই সংশোধন করে বলেন, "ব্রাদার-ইন-ল।" জাপানীতে ভাবা ও ইংরেজীতে কথা বলা কী যে কঠিন ব্যাপার তা মালুম হলো যেদিন শুনলুম যে ওদের ভাষায় "আমি" আছে আট রকম, "তুমি" আছে ক'রকম ঠিক জানিনে, আর "সে" বা "তিনি" বিলকুল নেই। অর্থাৎ প্রথম পুরুষটা ব্যাকরণে অনুপস্থিত।

যা বলছিলুম। দোভাষী না নিয়ে যাই কী করে? আসন সংরক্ষিত হলো কি না জানি কী করে? আর জাপানের টেলিফোন ডাইরেক্টরি তো বর্ণানুক্রমিক নয়, বর্ণমালা বলে কোনো পদার্থই নেই, নাম খুঁজে বার করতে জাপানীরাই হিমশিম খেয়ে যায়। গাড়ীকে বললুম, আচ্ছা, ব্লকের চারদিকটা একবার চক্কর দিয়ে দেখা যাক। জাপানের বাড়ীগুলো ব্লকে ব্লকে সাজানো।

চক্কর দিতে দিতে সত্যি সত্যি দেখা হয়ে গেল। মিস্ এতো ঘুরছিলেন গাড়ীর সন্ধানে। তাঁকে তুলে নিয়ে ছুটল গাড়ী রপ্‌পঙ্গি। পথ যেন ফুরোতে চায় না। অবশেষে হাইয়ুজা থিয়েটার। দেখে আশ্বস্ত হলুম যে ঝা দম্পতি তখনো এসে পৌঁছননি। কিন্তু টিকিট কাটতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। সুসুকিতার নির্দেশ দাম নেওয়া হবে না। শুনুন কাণ্ড! দেখতে দেখতে ঝা-রা এসে পড়লেন। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো বেশ ভালো সীটে। ওদিকে অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। পিছনে নীল পাহাড়। সামনে চাষীদের

গ্রাম। মঞ্চের উপরে খড়ের ঘর। ঘরের ভিতরে মানুষ। প্রযোজনা ও অভিনয় বাস্তবধর্মী।

কাবুকি ও বুনরাকু জাপানের চিত্ত জুড়েছিল, আধুনিক নাট্য সেখানে প্রবেশ-পথ পায় পঞ্চাশ বছর আগে। এই অর্ধ শতাব্দী কাল সংগ্রাম করে এখনো সে স্বাবলম্বী হতে পারেনি। রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করে না। করলেও সে নেবে না। নিলে "প্রশান্ত পর্বতমালা"র মতো বই দেখানো যায় না। ও যে কমিউনিস্টের লেখা প্রোলিটারিয়ান নাটক। যদিও যথেষ্ট মোলায়েম। আধুনিক থিয়েটার দেখতে যারা যায় তাদের টাকা বড় কম। খরচ ওঠে না। তাই বড়লোক মালিক জোটে না। অভিনেতারা নিজেরাই কোনো রকমে চালায়। অভিনয় করে রোজগার করা দূরে থাক অন্য ভাবে রোজগার করে রোজগারের টাকা থিয়েটারে ঢালে। ফলে বেশীর ভাগ সময় যায় রেডিওতে টেলিভিসনে সিনেমায়, অল্পই থাকে থিয়েটারের জন্যে। তা সত্ত্বেও তোকিয়োতে হাইয়ুজার মতো আরো তিনটে আধুনিক থিয়েটার চলে। যদিও এইটেই সব চেয়ে বড়। সব চেয়ে বড়তেও মাত্র চার শ'টি আসন। জনা সত্তর অভিনেতা অভিনেত্রী, একটি স্টুডিও, একটি নাট্যশিক্ষা ইনস্টিটিউট। এবং অতি উন্নত প্রণালীর সাজসরঞ্জাম সমন্বিত মঞ্চ। ইনস্টিটিউটে তিন বছর কাল তালিম দেওয়া হয়। স্নাতকরা হাইয়ুজার পাঁচটি শাখা থিয়েটারে কাজ করতে যায়। অন্য তিনটি থিয়েটারেরও সংগঠন মোটামুটি এইরকম।

আমাদেরি মতো এদেরও ভাবনা, ভালো নাটক পাই কোথায়? পাশ্চাত্য নাটকের জাপানী ভাষান্তর ও রূপান্তরই এদের প্রধান সম্বল। তার পরে পাশ্চাত্য রীতিতে লেখা মৌলিক জাপানী নাটক। আমাদের ব্রিটিশ আমলের মতো জাপানের যুদ্ধপূর্ব স্বদেশী আমলেও নাট্যাভিনয়ের স্বাধীনতা সামান্যই ছিল। রাষ্ট্রের মঞ্জুরি পাওয়া সহজ ছিল না। যুদ্ধের সময় তো আধুনিক নাটুকে দলগুলো বেআইনী ঘোষিত হয়। দলের হয়ে কেউ যদি সাহস করে প্রতিরোধ করলেন তো অমনি তাঁর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড। যুদ্ধের পর জাপান যখন পরাধীন হলো তখনি জাগরণ হলো নতুন করে এই সব আধুনিক নাট্যসম্প্রদায়ের। আগেকার দিনে তো মেয়েপুরুষের একসঙ্গে অভিনয় করাটাই ছিল দোষের। এখন ভদ্রঘরের মেয়েরাও নিয়মিত অভিনয় করছেন। আমাদের দেশেও তাই। কিন্তু ঐতিহ্য একদিনে গড়ে ওঠে না। সাধনাও

সিনেমার সঙ্গে শেয়ার করে হয় না। তবু জোর পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে। আধুনিক নাটক লাভের নয় লোকসানের কারবার জেনেও ছোট ছোট দল আসরে নামছে।

প্রত্যেকটি দৃশ্যের পর পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বিরাম থাকে। মঞ্চসজ্জা ও অঙ্গসজ্জার জন্যে সময় দিতে। সেই অবকাশটা মঞ্চের দু' ধারে রক্ষিত বোর্ডে সূচিত হয়। প্রথম দৃশ্যের পর দেখি রোমান হরফে পাঁচ সংখ্যাটি জলজল করছে। তার মানে পাঁচ মিনিট বিরাম। এমনি এক বিরামের অবকাশে দোভাষী সঙ্গে নিয়ে আমি সাজঘরে চললুম সুসুকিতা-সানকে ধন্যবাদ দিয়ে আসতে। তখনো তাঁর গায়ে চাষীর সাজ, মুখে ও মাথায় আনুষঙ্গিক মেক-আপ। এর পরের দৃশ্যে যাঁকে দেখা যাবে তিনি—প্রধান অভিনেত্রী কিয়োকো সেকি—তাঁর পাশে বসেছিলেন। সাজঘর বেশ সরগরম। বহুসংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রী যে যার প্রসাধনে রত। স্থান অতি সংকীর্ণ। আমাকে তো সারা পথ কসরৎ করতে করতে শরীর সামলিয়ে চলাফেরা করতে হলো। সুসুকিতা-সান সলজ্জ হাসিমুখে বললেন, আবার আসবেন তো? আমি বললুম, হাঁ, নাটকটা হয়ে গেলে আবার আসব। ফুর্তি লাগছিল অভিনেতা অভিনেত্রীদের মঞ্চের আড়ালে দেখে। যাকে দেখি তাকে অভিবাদন করি। দু'দিকেই হাসিমুখ।

জাপানী নাটক নাকি পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে। তা হলে আমাদের রাত এগারোটা তক না খেয়ে থাকতে হয়। জাপানীদের কী! তারা তো আহারের পাট সন্ধ্যার আগেই চুকিয়ে দিয়েছে। বিরামের অবকাশে হালকা কিছু সীটে বসে বসেই খায় বা উঠে গিয়ে বাইরে খেয়ে আসে। আর আমরা বাড়ী গিয়ে ডিনার না খেলে বাঁচব না। ঘণ্টা দুই নাটক দেখে ঝা দম্পতি বললেন, ওঠা যাক। চাষীর গ্রাম থেকে মজুরের কারখানা পর্যন্ত এগিয়েছে নাটকের কাহিনী। একটা ধর্মঘটের উদ্যোগ চলছে। তাতে বাগড়া দিচ্ছে কয়েকটি দালাল প্রকৃতির লোক। মেয়ে মজুরদের কেউ কেউ ধর্মঘটের পক্ষে, কেউ বা বিপক্ষে। মজদুর ইউনিয়নের মাতব্বরদের বক্তৃতাও শোনা গেল। একটি জাপানী মেয়ে মজুর তো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ককিয়ে আমার ভুল ভাঙিয়ে দিল যে জাপানীরা কখনো কাঁদে না, কান্না পেলেও হাসে। হতে পারে পরের সাক্ষাতে হাসাটাই এটিকেট, কিন্তু থিয়েটারে তো আমরা পর

নই, আমরা ঘরের লোকের চেয়েও অন্তরঙ্গ। আড়ালে যা ঘটে তারও সাক্ষী। হাঁ, আপনার লোকের কাছে জাপানীরাও কাঁদে। কাবুকির মতো মুখোশ পরার কনভেনশন নেই বলে আধুনিক থিয়েটারে মানুষের মুখেই সব রকম ভাবের অভিব্যক্তি ফোটে, ফোটাতে হয়। আর আধুনিক থিয়েটারের এইখানে জিৎ যে এতে পুরুষকে নারী সাজতে হয় না। এতে নারীরও মান আছে। তবে বিশুদ্ধ নাটকীয়তায় কাবুকির প্রতিদ্বন্দ্বী নেই জাপানে। আধুনিক থিয়েটার আরো পঞ্চাশ বছর তপস্যা করলে পরে হয়তো কাবুকির সঙ্গে দাঁড়াতে পারবে।

সুসুকিতার সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ করা হলো না। ফুলের দোকানে গিয়ে দুটি সুন্দর তোড়া কিনে পাঠিয়ে দিলুম। একটি কেন্‌জি সুসুকিতাকে। একটি কিয়োকো সেকিকে। ভাগ্যিস মিস্ এতো সঙ্গে ছিলেন। নইলে সেদিন কী বিপত্তি হতো কল্পনা করুন। আমি তো কিনতে যাচ্ছিলুম আরো চমৎকার দুটি বাহারে তোড়া। কন্যাটি একটু-হেসে আমার কানে কানে বললেন, "ওসব ফুল দিতে হয় ফিউনেরালের সময়।"

পরের দিন রবিবার। ফ্রান্সেস ক্যাসার্ডের সারা দিন ছুটি। তিনি এসে আমাকে নিয়ে গেলেন শহরের টুকিটাকি দেখাতে। শিনজুকু স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে খুঁজে নেওয়া গেল জাপানীরা যাকে বলে সুশিয়া। ছোট একটি দোকান। সেখানে সুশি কিনতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে কাউন্টারের এ ধারে টুলে বসে সুশি খেতেও পারা যায়। কাঁচা মাছ নিয়ে ভাতের সঙ্গে মেখে চোখের সুমুখেই সুশি বানায়। আমি তো কাঁচা মাছ খাব না। একই প্রক্রিয়ায় ডিম দিয়ে সুশি তৈরি করা হলো। টুলে বসে তার স্বাদ নিলুম।

কফি খেতে নয়, কফি হাউস কেমন তা চোখে দেখতে একটি কফি হাউসে ঢুকে পড়া গেল। টেলিভিসন আছে, যাদের তাতে আগ্রহ নেই তাদের জন্যে গ্রামোফোন ও রেকর্ড। ফুল দিয়ে সাজানো ঘর। আরামের আসন। বসলুম না। এগিয়ে চললুম।

তার পর একটি জায়গায় এসে টিকিট কাটলুম। কিসের? ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড বললেন, "একে বলে য়োসে।" জাপানের সেকালের ভড্‌ভিল (Vaudeville)। মধ্য এশিয়া থেকে অতি পুরাতন কালে জাপানে আসে।

এখনো টিকে আছে। ছোট একটা থিয়েটারের মতো মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ। পাশ্চাত্য ধরনের চেয়ারও আছে, আবার দেয়ালের দিকে জাপানী রীতিতে পা মুড়ে বসবার জন্যে সমান উঁচুতে মাদুরও আছে। আমরা মাদুরের উপর পা ভাঁজ করে বসলুম।

মঞ্চের উপরে দেখি একটি যুবক হাঁটু গেড়ে বসে গল্প শোনাচ্ছে। ফ্রান্সেস বললেন, "ওর দিকে না তাকিয়ে দর্শকদের দিকে তাকান।" দর্শকদের মুখে অসীম কৌতূহল। সব রকম বয়সের লোকই ছিল তাদের মধ্যে। ছেলের মা বাপ ঠাকু'মা ঠাকুরদা। তাঁদের সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা, মাঝে মাঝে হাসানো, ক্রমে ক্রমে গল্পের টেম্পো বাড়িয়ে দেওয়া, পরিশেষে— ঠিক বুঝতে পারলুম না কখন কেমন করে সেই যুবক বা অন্য একজন যুবক ছোরা নিয়ে গোলা নিয়ে রকমারি খেলা দেখাতে লাগল। অন্যমনস্ক ছিলুম নেপথ্য সঙ্গীত শুনতে। সে অতি উন্মাদনাময় জগঝম্প বা সেইরূপ কোনো বাদ্য। কয়েকটা দৃশ্য দেখার পর মালুম হলো যে ওই সঙ্গীতটা দৃশ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

কাবুকির মতো য়োসে সকাল থেকে শুরু হয়, সমস্ত দিন চলে। যার যখন খুশি টিকিট কেটে ঢুকতে পারে, যতক্ষণ খুশি বসতে পারে। কারো কারো কোলে দেখলুম খাবারের বাক্স। ওঁরা বোধ হয় রবিবারটা ওইখানেই কাটাবেন। আমরা কি তা পারি! আমাদের উঠতে হলো। দোকান সব খোলা। আমরা গেলুম একটা স্টেশনারি দোকানে।

সেখানে দেখতে পেলুম বিচিত্র রকমের কাগজ, বিচিত্র রকমের খাম। এক এক রকমের খাম এক এক উপলক্ষে ব্যবহার করা হয়। যত রকম নিমন্ত্রণ তত রকম খাম। কাউকে যদি টাকা দিতে হয় একটি বিশেষ রকমের খামে পুরে ট্রে-তে করে দিতে হয়। তেমনি উপহার পাঠাতে হলে যেমন তেমন কাগজে মোড়া চলবে না, খোলাখুলি দেওয়া তো অসভ্যতা। কবিতা লিখে বন্ধুকে পাঠাতে হলে তার জন্যে লম্বা চৌকো সোনার বা রুপোর জল ছিটানো নানা রঙের কাগজ। চিঠি লেখার কাগজ ছাড়া আরেক জিনিস দেখা গেল। ভাঁজ করা পাখা। পাখা খুলে মনের কথা লিখে আবার ভাঁজ করে উপরে লিখতে হয় প্রাপকের নাম ঠিকানা। তারই এক কোণে ডাক টিকিট এঁটে ডাকে দিলে খাম পোস্টকার্ডের মতো সেটাও বিলি হবে। আমি

তো পরখ না করে থাকতে পারিনে। যাঁদের উপর পরীক্ষা চালানো গেল তাঁরা পেয়েছিলেন। পাখা অবশ্য যে কেউ খুলে পড়তে পারে। তাই মনের কথাটা খুলে না বলাই ভালো।

এর পর আমরা ট্রামে চড়ে ডাউন টাউন চললুম। ছেলেমানুষের মতো আমার সাধ তোকিয়োর ট্রামে চড়তে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলপথে বেড়াতে। এসব সাধ একে একে মিটল। কিন্তু ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড আমাকে সেদিন রাস্তার ধারে পুতুল খেলা দেখাতে পারলেন না। খেলা যারা দেখায় তারা পুতুল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। যে অঞ্চলে তাদের সাধারণত পাওয়া যায় সে দিকে যেতে আমাদের দেরি হয়ে গেছল। ওদিকে একটা চা পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল। কোয়েকারদের ফ্রেণ্ডস সেণ্টারে।

চা খেতে খেতে আলাপ হয়ে গেল জাপানী মার্কিন ইংরেজ প্রভৃতি নানা জাতের নানা মতের নরনারীর সঙ্গে। কিন্তু চমক লাগল যখন মার্কিন লেখিকা এলিজাবেথ ভাইনিং বললেন, "মনে পড়ছে না? সেই যে! কাবুকি থিয়েটারে!" আমি বললুম, "কী আশ্চর্য! আপনার সঙ্গে পাশাপাশি বসেছি অথচ জানিনে যে আপনিই তিনি যাঁর সঙ্গে আলাপ করতে বলা হয়েছিল আমাকে।" জাপানের যুবরাজের গৃহশিক্ষিকা ছিলেন এই কোয়েকার মহিলা। এবার ইনি এসেছেন পেন কংগ্রেসের সম্মানিত অতিথিরূপে।

ইণ্টারন্যাশনাল হাউসে সেবার গর্ডন বোল্‌সের পত্নী জেন বোল্‌সকে দখিনি। এবার সে ক্ষতির পূরণ হলো। কিন্তু হাতে আমার সময় এত কম যে আর কোনো নতুন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছিলুম না। এঁরা বহু দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। সে কারণেই হোক বা যে কারণেই হোক এঁদের সঙ্গে আমার আলাপ জমে গেল। সে আলাপ আর থামতেই চায় না। একে একে সবাই চলে গেলেন। রইলুম আমরা ক'জন। তখন এঁরা ফ্রান্সেসকে ও আমাকে এঁদের সঙ্গে মোটরে তুলে নিয়ে গেলেন ও স্কালা সিনেমায় নামিয়ে দিলেন। জাপানীরা বলে স্কালা-জা।

জাপানে ফরাসী ইতালিয়ান ও জার্মান ফিল্মও দেখায়। দেশে দেখতে পাইনে বলে ও ইনগ্রিড বার্গমানের আকর্ষণে স্কালা-জা'তে ফরাসী ফিল্ম দেখতে যাওয়া। প্রযোজকও বিখ্যাত শিল্পী। আর্ট ও টেকনোলজির এমন

উৎকর্ষ অথচ এহেন অপব্যবহার কদাচিৎ চোখে পড়ে। সভ্যতার রোগ তো এইখানে যে প্রকৃতির উপর খোদকারি করতে গিয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারাতে বসেছে। মনুষ্যত্বের অভাব পূরণ করবে কী দিয়ে! লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তবে সে লবণত্ব পাবে কার কাছে! অর্ধেকটা দেখে ফ্রান্সেসকে বললুম, "আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ ঠিক আটটায়। দূতাবাসের মালিক দম্পতির সঙ্গে।" তিনি অনুমতি দিলেন।

পরের দিন শরৎ বিষুব। জাপানের অন্যতম ন্যাশনাল হলিডে। ন্যাশনাল হলিডের সংখ্যা সারা বছরে নয়টি। নববর্ষ দিবস। সাবালকদের দিবস। বসন্ত বিষুব। সম্রাটের জন্মদিন। শাসনতন্ত্র দিবস। ছেলেমেয়েদের দিন। শরৎ বিষুব। সংস্কৃতি দিবস। শ্রমিক ধন্যবাদ দিবস। এই তালিকা থেকে ধর্ম সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। নইলে ভারতবর্ষের মতো হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান বৌদ্ধ জৈন শিখদের ছুটির দিনগুলো বছরের একটা মোটা অংশ জুড়ত। আর উৎপাদনে টান পড়ত। কাজকর্মে ছেদ পড়ত। পরে বুঝতে পারি নামকরণটা সেক্যুলার হলেও দিনগুলো ধার্মিকদের মুখ চেয়ে ধার্য করা হয়েছে। অন্তত এই দিনটি।

চাতানী মহাশয় এসে প্রাতরাশের পর আমাকে কামাকুরা নিয়ে গেলেন। মোটরে ঘণ্টা দেড়েক লাগে। রাস্তার দু'ধারে সব ভেঙেচুরে ছারখার হয়েছিল যুদ্ধে। এই বারো বছরে গড়ে উঠেছে আবার। ধ্বংসের চিহ্ন নজরে পড়ল না।

সমুদ্রের কূলে কামাকুরা নগর। পুরীর মতো কারো কাছে তীর্থস্থান, কারো কাছে হাওয়াবদলের জায়গা। আট শ' বছর আগে এটা ছিল রণপতিদের রাজধানী। এখন এর প্রসিদ্ধির হেতু অমিতাভ বুদ্ধের বিশাল বিগ্রহ। মহাবুদ্ধ বা দাইবুৎসু। নারায় যেমন বৈরোচন বুদ্ধ কামাকুরায় তেমনি অমিতাভ বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ নন এঁরা একজনও। তবু সেই রকম মূর্তি, সেই রকম পদ্মাসন, সেই রকম মুদ্রা। নারার মতো এটিও ব্রঞ্জের তৈরি, কিন্তু তত বড় নয়। উচ্চতা বিয়াল্লিশ ফুট। উপবিষ্ট অবস্থায়। মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্য সাত ফুট সাত ইঞ্চি। চোখের দৈর্ঘ্য তিন ফুট চার ইঞ্চি। কানের ছ' ফুট তিন ইঞ্চি। মুখবিবরের দু' ফুট আট ইঞ্চি। নাকের দু' ফুট ন' ইঞ্চি। দুই জানুর মাঝখানের দূরত্ব প্রায় ত্রিশ ফুট। এই বিগ্রহের মাথার উপরে ছাদ

নেই। মণ্ডপ ভেসে গেছে সমুদ্রের জোয়ারে। সাড়ে চার শ' বছর আগে। প্রতিষ্ঠা ১২৫২ সালে। পরিকল্পনা মহাশোগুন য়োরিতোমোর। কাজে পরিণত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। যাঁর চেষ্টায় হয় তিনি ছিলেন শোগুন অন্তঃপুরিকা ইদানো-নো-ৎস্বোনে। যে মন্দিরের চত্বরে এই বিগ্রহের অবস্থান তার নাম কোতোকু-ইন মন্দির। মন্দিরের সংলগ্ন মঠ। একাংশে প্রধান পুরোহিতের বাসগৃহ।

তোকুশিমা কুনিদেকো

॥ একুশ ॥

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মাংসুও সাতো একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক। সংস্কৃতও জানেন। তাঁর পত্নীও একজন বিদুষী মহিলা। স্বামীর চেয়ে ইংরেজীতে এক কাঠি সরেশ। আমরা তাঁদের বাড়ী গিয়ে দেখা করতেই সাতো বললেন, "এখনি আমাকে মন্দিরে যেতে হচ্ছে পৌরোহিত্য করতে। শরৎকালের এই অমাবস্যায় পিতৃপুরুষদের স্মরণ করতে হয়।"

তখন আমি মিলিয়ে দেখলুম যে ওই দিনটি আমাদের মহালয়া। বললুম, "আমাদেরও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করতে হয় এই দিন।" আশ্চর্য! না? কোথায় জাপান আর কোথায় ভারত! পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা হয় একই তিথিতে। জাপান সরকার ওটিকে অন্য নামে ন্যাশনাল হলিডে করেছেন।

সাতো-গৃহিণীর সঙ্গে ইংরেজীতে আলাপ করা গেল। তিনি ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত। স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে তিনি সমিতি করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "জাপানের মেয়েদের স্বাধীনতা বেশী দিনের নয়। গত মহাযুদ্ধে পুরুষেরা যখন লড়াই করতে যায় স্ত্রীরা তখন স্বাধীন হয়।"

তার আগের মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডেও তাই হয়েছিল। এর পরের মহাযুদ্ধে মধ্যপ্রাচীতেও তাই হবে। হাঁ। যুদ্ধেরও একটা ভালো দিক আছে। সংস্কারকদের লাখ কথায় যা হয় না যুদ্ধের প্রয়োজনে আপনা থেকে তা হয়। মেয়েরাই তখন আপিস আদালত স্কুল কলেজ দোকান হাট কলকারখানা ট্রেন ট্রাম চালায়। যুদ্ধের পর তাদের সবাইকে অন্দরে ফেরৎ পাঠানো যায় না। পুরুষেরা পরের দেশ জয় করে এসে দেখে নিজেদের সদর বেদখল হয়ে গেছে।

বসবার ঘরে একটি টেলিভিসন সেট ছিল। একদল কুস্তিগির পাঁয়তারা কষছে তো কষছেই। না তারা ভাঁড়? ভাঁড়ামি করছে? সাতো-গৃহিণী বললেন টেলিভিসনটি তাঁর খ্রীস্টান বান্ধবী নোবুকো য়োশিয়া উপহার দিয়েছেন। বান্ধবীটি বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক। উপন্যাস লিখে দু'দুটি টেলিভিসন যন্ত্র পুরস্কার পান, তারই একটি আমি দেখছি। নোবুকো য়োশিয়ার উপন্যাসের বাণী হলো পুরুষকেও নারীর মতো সতী হতে হবে। কায়িক অর্থে।

শুনুন। শুনুন। ক' হাজার বছর অবদমনের পরে কত বড় বেদনাকে

বাণী দেওয়া হচ্ছে! আমার যদি সাধ্য থাকত আমিও তাঁকে আরো একটা টেলিভিসন সেট পুরস্কার দিতুম। জাপানের মতো দেশে এ কথা মুখ ফুটে বলতে দুর্দান্ত সাহস লাগে। আমার তো মনে হয় নোবুকো য়োশিয়া খ্রীস্টান বলেই এ রকম অসমসাহসী। ১৯৫২ সালে আটান্ন বছর বয়সে তিনি মহিলা সাহিত্যিক প্রাইজ পান। পুরুষদের দোষগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে তিনি সিদ্ধাঙ্গুলি। পুরুষকে তিনি মানুষ না করে ছাড়বেন না। তাঁর পুরোনো একখানি উপন্যাসের নাম "আদর্শ স্বামী"। তাঁর লেখা জনগণের প্রিয়।

সেদিন সাতোদের গৃহে মধ্যাহ্নভোজনে বসা গেল তোকোনোমার সামনে। কর্তা ততক্ষণে অনুষ্ঠান সেরে ফিরে এসে আনুষ্ঠানিক সাজ ছেড়ে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। একটি মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধমূর্তি দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, "ইনি কে?" উত্তর পেলুম, "ক্ষিতিগর্ভ।" বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ। বোধিসত্ত্ব ক্ষিতিগর্ভ যত দূর জানি মধ্য এশিয়া থেকে জাপানে আমদানি। ভারতে তাঁর আদি নয়। এক পণ্ডিত মশাই ভারত থেকে জাপানে বেড়াতে গিয়ে ক্ষিতিগর্ভের মুণ্ডিতমস্তক দেখে সিদ্ধান্ত করেন তিনি শঙ্করাচার্য। জাপানে এসে আমার আর কিছু না হোক এই শিক্ষা হলো যে ইসলামের মতো বৌদ্ধধর্ম বা সদ্ধর্ম ছিল স্বদেশকে অতিক্রম করে বহু দূর দেশে প্রসারিত, জাপান চীন সাইবেরিয়া মধ্য এশিয়া কাম্বোডিয়া শ্যাম মালয় ইন্দোনেশিয়া জুড়ে বিস্তারিত ছিল তার পরিধি, আরবীর মতো সংস্কৃত ছিল তার শাস্ত্রভাষা, যদিও পালিতেই তার প্রবর্তকের অনুশাসন। আরবী নাম তো আমাদের বাঙালী মুসলমানদেরও। তা বলে কি তাঁরা আরব? তেমনি অমিতাভ, ক্ষিতিগর্ভ ইত্যাদি অনেকে ভারতীয় না হওয়াই সম্ভব।

তোকিয়োর উএনো মিউজিয়মে অনেক বৌদ্ধ মূর্তি দেখেছিলুম। নাম সংস্কৃত, অথচ কল্পনা অভারতীয়। একটি মূর্তির নিচে লেখা ছিল নীলকণ্ঠ, কিন্তু কোনো মতেই তাকে শিবমূর্তি বলা যায় না। যা কিছু আলো ঠিকরায় তাই সোনা নয়। যা কিছু সংস্কৃতনামা তাই হিন্দু নয়। তা যে ভারত থেকে আমদানি তেমন কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। কামাকুরার একটি মিউজিয়মে দেখলুম সরস্বতীর মূর্তি। জাপানী নাম বেনজাইতেন বা বেনতেন। বীণাবাদিনী নন, কোতোবাদিনী। ইনি হলেন সরস্বতী নদীর দেবীরূপ। সঙ্গীতের সঙ্গে এঁর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু বিদ্যার সঙ্গে নয়। এঁর কোনো বাহন

নেই। এঁর অধিষ্ঠান সরসীতটে। চাতানী আমাকে সেদিন নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কামাকুরার নিকটবর্তী একটি দ্বীপে অধিষ্ঠিত সরস্বতী-মূর্তি দেখতে। সাধ ছিল, কিন্তু সময় ছিল না। জলের সঙ্গে সরস্বতীর অবশ্য-সম্বন্ধ আমরা এ দেশে ভুলে গেছি। হাঁস বোধ হয় জলের ব্যঞ্জনা বহন করে।

শিন্তোদের হাচিমান-গু পীঠস্থান দেখতে গেলুম। গাড়ী রেখে অনেকটা পথ হাঁটতে হলো। অত্যন্ত জনপ্রিয় পীঠ। হাচিমানকে সাধারণত মনে করা হয় রণদেব, কিন্তু এখন ইনি জেলেদের দেবতা। সম্রাটের এক পৌরাণিক পূর্বপুরুষের নাম হিকোহোহো-দেমি। কালক্রমে তিনিই হয়ে দাঁড়ান জেলেদের ঠাকুর। পরে তাঁকেই হাচিমানের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়। তার থেকে হাচিমান হলেন জেলেদের দেবতা। হাচিমানকে আবার বিশ্বকর্মা বলেও পূজা করা হয়। কামারশালার দেবতা। হাচিমান কথাটার মানে অষ্ট পতাকা। নারা যখন রাজধানী ছিল তখন হাচিমানকে বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষক দেবতা করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি হন অমিতাভ বুদ্ধের সঙ্গে এক। কামাকুরায় যখন রণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বুদ্ধের সঙ্গে এক না হয়ে তিনি হলেন যুদ্ধের সঙ্গে এক। ইতিমধ্যে তিনি আবার শান্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন, যুদ্ধের সঙ্গে নয়।

শিন্তোদের প্রধান পীঠস্থান দেখতে হলে ইসে যেতে হয়। সে নাকি বিরাট ব্যাপার। মহা আড়ম্বরময়। সে ছাড়া শিন্তোদের আছে ৮৯টি জাতীয়, ২৭টি বিশিষ্ট জাতীয়, ৮৭টি রাষ্ট্রীয়, হাজার পঞ্চাশেক আঞ্চলিক বা গ্রাম্য, তেষট্টি হাজার গোত্রহীন পীঠ। তার উপরেও আরো হাজার হাজার পীঠ আছে যা গোত্রহীনেরও অধম। ইসের পীঠস্থান সূর্যদেবীর। অন্যান্যগুলিও তাঁর এবং অন্যান্য দেবদেবীদের, সম্রাট বা সেনাপতিদের, গ্রামদেবতার, উপদেবতার, অপদেবতার, প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের, পশুপাখীর, বিবিধ বস্তুর। মৃত সৈনিকদের পীঠও বড় কম নয়। বহু ক্ষেত্রে একই পীঠে একাধিকের আরাধনা হয়।

কাসুগা পীঠস্থানের মতো হাচিমান-গু পীঠস্থানেও লক্ষ করলুম ভেস্টাল ভার্জিন বা উৎসর্গিত কুমারী। কিন্তু নৃত্যপরা নয়। দপ্তরে দাঁড়িয়ে কর্মতৎপরা। সংলগ্ন যাদুঘর বন্ধ ছিল। সেখান থেকে যাই আধুনিক শিল্পশালায়। সেখানে নানা দেশের নানা যুগের পোর্সলিন দেখি। তারপর প্রাচীন মূর্তির মিউজিয়মে। সেখানকার সরস্বতী প্রতিমার কথা উল্লেখ করেছি। সেখানেই আমি

আবিষ্কার করলুম—বড় দেরিতেই আবিষ্কার করলুম—যে জাপানের প্রত্যেকটি মন্দিরে, মিউজিয়মে, দ্রষ্টব্যস্থলে স্বতন্ত্র শিলমোহর থাকে। বললেই অটোগ্রাফের মতো ছেপে দেয়। পরে সবাইকে দেখাতে পারা যায় অ্যালবামের মতো।

কামাকুরার ল্যাকার করা কাঠের কাজ বহুশতাব্দী ধরে প্রসিদ্ধ। তাকে বলে কামাকুরা বোরি। লালচে রঙের থালা, বাটি, পর্দা প্রভৃতির উপর মনোহর নক্‌শা থাকে। একটি দোকানে গিয়ে কেনা গেল। অকস্মাৎ শুনি চাতানী-সান বলছেন, "আপনাকে কী যে উপহার দিই ভেবে পাচ্ছিলুম না। এই নিন।"

সেদিন আমার অভিপ্রায় ছিল আতামি গিয়ে তানিজাকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, ফিরতে না পারলে আতামিতেই রাত কাটাতে। কিন্তু ইতিমধ্যে খবর পেয়েছিলুম তানিজাকি সেখানে নেই, কিয়োতো চলে গেছেন। কামাকুরা থেকে ফেরার পথে চাতানী বললেন রাশিয়ান ব্যালে তখনো জাপান ছাড়েনি, সেই সন্ধ্যায় স্পেশাল শো। এত দিন রুশ দূতাবাস থেকে দ্বিতীয় টিকিট না পেয়ে আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে ওরা চলে গেছে। পাগলের মতো ছুটলুম কোমা থিয়েটারে, দৈবকৃপায় যদি টিকিট কিনতে পাই। দেখলুম লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো দামের একখানাও টিকিট পাবার জো নেই। চাতানী-সান বললেন ব্যালে দেখবে বলে আমেরিকানরা উড়ে এসেছে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপার থেকে, টিকিটের দাম ব্ল্যাক মার্কেটে বিশ হাজার ইয়েন। তখন বুঝলুম কমপ্লিমেণ্টারি টিকিটের মূল্য কত।

পরের দিন সকালে ইনাজু মহাশয় এসে আমাকে তামাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন। তোকিয়োর শামিল, অথচ শহর থেকে অনেক দূরে নির্জন আরণ্যক পরিবেশে। বছর ত্রিশেক আগে পাহাড় কাটিয়ে জঙ্গল সাফ করিয়ে এর প্রতিষ্ঠা হয় আশ্রম বিদ্যালয়ের মতো। প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কুনিয়োশি ওবারা বন্ধুর কাছে টাকা ধার করে পোড়ো জমি কেনেন ও সহধর্মিণীর সহযোগে ছোট একটি বিদ্যালয় পত্তন করেন। এখনো প্রচুর জমি অনাবাদী পড়ে রয়েছে। কতক জমি চাষও হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ হলো কৃষিবিভাগ। ওবারা হাতে কলমে কাজ করার উপর জোর দেন। ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে পড়ে, একসঙ্গে খেলে, একসঙ্গে খাটে। কিন্তু থাকে আলাদা আলাদা আবাসে। উপাসনার জন্যে একটি খ্রীস্টীয় চ্যাপেল।

কাম্বুন যুগের নর্তকী
চিত্রকর অজ্ঞাত
(সপ্তদশ শতাব্দী)

ওবারা স্বয়ং প্রেস্‌বিটারিয়ান হলেও উপাসনাপদ্ধতি সাম্প্রদায়িক নয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সব ধর্মের কাছে উন্মুক্ত। বৌদ্ধদর্শনও শিক্ষা দেওয়া হয়। আর জেনদের মতো চা অনুষ্ঠানও করা হয়, বিশিষ্ট অতিথির খাতিরে। আমার জন্তেও চা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল, কিন্তু আমি পৌঁছলুম দেরিতে, তাই বাদ গেল।

ছোটদের বিভাগগুলি দেখতে দেখতেই আমার মধ্যাহ্নভোজনের সময় হলো, তার পরে চ্যাপেলে গিয়ে আমাকে ভাষণ দিতে হলো সমবেত ছাত্রছাত্রী শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের। তার পরে জিমন্যাসিয়মে নিয়ে গিয়ে আমাকে ব্যায়াম দেখানো হলো সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত রেখে। ডেনমার্ক থেকে ও সুইটজারল্যাণ্ডের জেনিভা থেকে ওবারা এ পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন, তার আগে সারা ইউরোপ ঘুরে সন্ধান করেছেন কোন দেশের ব্যায়াম শ্রেষ্ঠ। তেমনি লেখাপড়ার পদ্ধতি নিয়ে তিনি বাছবিচার ও পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। শিশুরা নিজেরাই নিজেদের রুটিন ঠিক করে। দেখলুম ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে একখানা বড় ছবি আঁকছে। একটি ছেলে একাই একটি মূর্তি গড়ছে। কয়েক জনকে দেখা গেল নিজের হাতে পিআনো বানাতে। একটা রেডিও ছিল, সেটা ছেলেদের হাতে গড়া। বেহালাও দেখলুম, অসমাপ্ত কাজ। বিজ্ঞানের ঘরে চলেছে এক্‌সপেরিমেণ্ট। ইংরেজী সকলেই শেখে, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম জাপানী। তামাগাওয়ার ছেলেমেয়েদের গান শেখানো হয় পাশ্চাত্য সুরে। তাতে আমি আশ্চর্য হইনি, কিন্তু তাজ্জব বনে গেলুম যখন তাদের চ্যাপেলে গিয়ে শুনলুম তাদের কণ্ঠে "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।" পরিপূর্ণ অনুকরণ।

তখন আমার ভাষণ আরম্ভ করলুম আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। তার থেকে এলো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ও আঞ্চলিক ভাষার নাম। ভাষাসমস্যা। হিন্দী বনাম ইংরেজী। এমনি কত কথা। চ্যাপেল কেবল উপাসনার জন্তে নয়। স্বয়ং কুলপতি ওবারা সেখানে নীতিশিক্ষা দেন। সেইজন্তেই তার অস্তিত্ব। চরিত্রগঠনই তামাগাওয়ার সুনামের হেতু। গত মহাযুদ্ধের সময় ওবারাকে যুদ্ধবিরোধী বলে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে ধরে রাখাও যায় না। কারারক্ষীরা সেলাম করে বলে, "মাস্টারমশাই"। আর জেনারল ও য়্যাডমিরালরাই তাঁদের ছেলে-

মেয়েদের পাঠান তাঁর বিদ্যালয়ে চরিত্রগঠনের জন্যে। মাস ছয়েক পরে তিনি খালাস।

প্রেসিডেণ্ট ওবারাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "এত বড় প্রতিষ্ঠান চালান কী করে? সরকারী সাহায্য পান নিশ্চয়।"

"সরকারী সাহায্য!" তিনি অবাক হলেন। তার পর আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, "আমি নেব সরকারী সাহায্য! নিলে তো ওরা বর্তে যায়। নিতে ওরা আমাকে বার বার সেধেছে। না, বাপু। ও রাস্তায় আমি নেই। জাপানে তিন হাজার সাত শ' প্রকাশক আছেন, তামাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ তাঁদের মধ্যে সপ্তম। বই থেকে আয় হয়, জমি থেকে আয় হয়, জমির উপর তৈরি বাড়ী থেকে আয় হয়। তার উপর ছাত্রবেতন থেকে আয়। সব ধার শোধ করে দিয়েছি। সরকারী সাহায্য কী হবে?"

ছেলেমেয়েদের জন্যে তামাগাওয়া-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাপানী ভাষায় যে বিশ্বকোষ প্রকাশ করা হয়েছে তার অনেকগুলি খণ্ড তিনি আমাকে উপহার দিলেন। চমৎকার ছবি আর ছাপা আর কাগজ। আমরা এ রকমটি পারিনে, পারবও না। আমাদের বিক্রয়সংখ্যা কম। জাপানে কাগজ ইত্যাদি বাবদ খরচও কম। ওবারা পুরোদস্তুর প্র্যাক্‌টিকাল মানুষ, সেইসঙ্গে আদর্শবাদী। তিনি যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা সরকারী চাকুরে তৈরি করে না। এ সেই বুনিয়াদী শিক্ষা যা ছাত্রছাত্রীদের স্বাবলম্বী করে, স্বাধীন করে। জীবনে শ্রী এনে দেয়। শরীর মন চরিত্র সুগঠিত ও কর্মঠ হয়। এসব মানুষ নিজের স্থান নিজে করে নেবেই। এরা মূল্যবান। দেখলুম আমাদের উত্তরপ্রদেশের একটি ছাত্র এখানে কৃষিবিদ্যা শেখে। মাস ছয়েকের মধ্যে জাপানী ভাষা চলনসই রকম আয়ত্ত করেছে। জাপানী খাদ্যও অভ্যাস করেছে। বয়স মাত্র ষোলো-সতেরো। চন্দ্রপাল সিং বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ভারতীয় বলে তার খাতির কত!

ফেরার পথে ঘুরে গিয়ে ওবারা-সান ও ইনাজু-সান আমাকে নিয়ে গেলেন মুশানোকোজির বাড়ী। জাপানের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম। বয়স সত্তরের উপর। প্রথম যৌবনে ইনি টলস্টয়ের জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। সে প্রভাব তেত্রিশ বছর বয়সে রূপ নিল "নূতন গ্রাম" পত্তনে। অভিজাত

বংশধর আত্মসুখের অন্বেষণ না করে করলেন সর্বোদয়ের ধ্যান। সবাই বাস করবে একটি আদর্শ গ্রামে, আদর্শ সমাজে। সকলেই গতর খাটাবে, মাটি চষবে, সৃষ্টি করবে, পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজবে। লোকে বলল ইউটোপিয়া। নিন্দাবাদ করল। স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে এখনো তিনি সেই "নূতন গ্রাম" পরিচালনা করছেন, কিন্তু নিজে সেখানে থাকতে পারেন না, থাকেন তোকিয়োর শহরতলীতে।

"না, আমি টলস্টয়পন্থী নই।" আমাকে বললেন মুশানোকোজি, সংক্ষেপে মুশাকোজি। "টলস্টয়ের কতকগুলি আইডিয়া সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ছিল।" বললেন জাপানীতে। দোভাষী হলেন ইনাজু।

আমি যখন গান্ধী ও বিনোবার সঙ্গে তুলনা করলুম তখন বললেন, "তাঁরা চান গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি। শত শত গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি। আমার তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। আমি চাই কয়েকটি ব্যক্তি নিজেদের অন্তর্জীবনকে আর একটু গভীর করবে, আর একটু ঋদ্ধ করবে।"

চল্লিশ বছর হলো "নূতন গ্রামে"র প্রতিষ্ঠা। এখন সেখানে থাকে এগারো জন অবিবাহিত পুরুষ ও একটি বিবাহিত দম্পতি। বাড়তে বাড়তে এমন হয়নি, কমতে কমতে হয়েছে। বিশ-পঁচিশ বছর আগে বেশ শ্রীমন্ত অবস্থা ছিল। যেমন ছিল সাবরমতী ও সেবাগ্রাম আশ্রমের। আফসোস করে কী হবে! এই রকমই হয়ে থাকে। মুশাকোজি-সানকে বললুম, "আপনার ঝঞ্ঝাট আরম্ভ হবে যখন ঐ এগারোটি পুরুষ এগারোটি বৌ ঘরে আনবে ও এগারোটি পরিবার সৃষ্টি করবে।" আরম্ভ হবে কী, অনেক আগেই হয়েছিল, এই তার পরিণাম। মুখ ফুটে বললুম না সে কথা। তিনি করুণভাবে চেয়ে রইলেন, নিরুত্তর, অসহায়।

মুশাকোজি মহাশয় প্রধানত উপন্যাস লিখতেন, দ্বিতীয়ত নাটক। ষাট বছর বয়সের পর থেকে সাহিত্য ছেড়ে চিত্রকলায় মশগুল রয়েছেন। তাও পাশ্চাত্য চিত্রকলা। আমাকে তাঁর স্বহস্তের একখানি ছবি উপহার দিলেন। তা ছাড়া কিছু তর্জমা। জিজ্ঞাসা করলুম, "আধুনিক জাপানী সাহিত্য সম্বন্ধে কী আপনার মত?" উত্তর হলো, "পড়িইনে।"

তাঁর "নূতন গ্রামে"র যখন সুদিন ছিল তখন তাঁর সাহিত্যের কাজও সমান পরিণতি ও শক্তিমত্তা লাভ করেছিল। তখন তিনি এক হাতে গ্রাম

চালাচ্ছেন, এক হাতে সাহিত্য। তার পর তিনি ইউরোপে যান। তাঁর স্বপ্নের দেশ। ইউরোপের প্রেরণায় বছর পাঁচ-সাত কাটল। তার পর জাপানের পরাভব, মুশাকোজির চিত্রলোকে অপসরণ। যুদ্ধের আদি থেকেই তিনি আপনাকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধেও তাঁর আদর্শের পরাভব। এরূপ পরিস্থিতিতে শিল্পীপ্রকৃতির মানুষ শিল্পেই ফিরে যায় ও আশ্রয় পায়। মুশাকোজি তা বলে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সাধনায় সুখী হবার পাত্র নন। তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা মহত্তর সামঞ্জস্যের আশা রাখে।

জাপানের সাহিত্যিকদের রকমারি "বাদ" অনুসারে বিভক্ত করা হয়। কেউ ন্যাচারালিস্ট, কেউ রিয়ালিস্ট, কেউ আর্ট ফর আর্টস সেক-ইস্ট। কেউ কেউ আবার সেটানিস্ট (Satanist), নিও-রোমান্টিক, নিও-সেনস্যুয়াস, প্রোলিটারিয়ান। মুশাকোজি জানতে চাইলেন আমি কোন "বাদী"। বলতে হলো, "হাইয়ার রিয়ালিস্ট"। ইনাজু বললেন, "না, আপনি আইডিয়ালিস্ট।" আমি মেনে নিলুম।

ভারতবর্ষে মুশাকোজি মহাশয় অল্প সময় ছিলেন। শিবপুরের বটানিক গার্ডন তাঁর মনে পড়ল। সেখানে তিনি একটি বাঁদর দেখেছিলেন, সেটিকেও ভোলেননি।

এই ঋষিকল্প শিল্পী যে ঘরে বসে কাজ করেন সে ঘরও দেখলুম। বলা বাহুল্য চা পান করা গেল। লক্ষ করলুম তাঁর স্ত্রীভাগ্য।

ইংলণ্ডের যেমন "অর্ডার অক মেরিট" জাপানের তেমনি "অর্ডার অফ কালচারাল মেরিট"। দেশের বাছা বাছা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিত্রকর, ভাস্কর ইত্যাদিকে দেশের সরকার এই ভাবে সম্মানিত করেন। ১৯৩৯ থেকে আরম্ভ করে আঠারো বছরে চোদ্দ জনকে এ সম্মান দেওয়া হয়েছে। মুশাকোজি তাঁদের অন্যতম। তাঁর বন্ধু শিগা আরেক জন। তানিজাকি আরো এক জন।

কিন্তু মুশাকোজি তো কেবল সাহিত্যরথী নন, তিনি গ্রামসংস্থাপক, সমাজপ্রবর্তক। কোলরিজ, সাদে প্রভৃতির "প্যান্টিসোক্রেসী" ছিল নিছক কবিকল্পনা, বাস্তবে বেশী দিন টিকল না। মুশাকোজির "নূতন গ্রাম" চল্লিশ বছর পরেও বিদ্যমান। এখনো তার সম্বন্ধে পত্রিকা বেরোয়। তিনি আমার হাতে একখানি দিয়ে বললেন, "দেখে আসতে পারেন। এমন কিছু দূর নয়।"

নিজে সেখানে থাকেন না, থাকে যারা তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, তবু তাঁর প্রত্যয় তেমনি দৃঢ়, তাঁর নিষ্ঠা তেমনি নিষ্কম্প।

দেশে ফিরে এসে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল এক জাপানী বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধু বললেন, "মুশাকোজি যখন পুনর্বার বিবাহ করেন তাঁর নববধূ তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে ওসব গ্রামে ট্রামে বসত করা তাঁর পোষাবে না। কী করবেন, স্ত্রীর ইচ্ছাই মেনে নিতে হলো।"

টলস্টয়ের জীবনেরও ট্র্যাজেডী নিহিত ছিল এইখানে। স্ত্রীর ইচ্ছা তাঁর আদর্শবাদকে ক্রমেই পরাস্ত করছিল। শেষে তো তিনি গৃহত্যাগ করে পথের ধারে এক রেলস্টেশনে দেহত্যাগই করলেন। স্ত্রী গেলেন সেবা করতে। স্বামী তাঁর মুখদর্শন করলেন না। কস্তুরবা যদি প্রতিকূল হতেন তা হলে গান্ধীজীকেও হয় নগরবাসী হতে হতো, নয় পত্নীত্যাগ করতে হতো। সেই গান্ধারী ছিলেন বলেই গান্ধীজীর আদর্শে ও বাস্তবে সামঞ্জস্য ছিল।

সেদিন আমাদের দূতাবাসের পুষ্পদাসের ওখানে আমার নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমার সঙ্গে আমার বন্ধুদেরও। তাই ওবারা-সান ও ইনাজু-সানকে নিয়ে প্রথমে গেলুম রাষ্ট্রদূত ভবনে। সেখানে সাজবদল করব। যেতেই রাষ্ট্রদূতের সারথি দিয়ে গেল এক তাড়া চিঠি। বলে গেল, "রুশ দূতাবাস থেকে টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখবেন।" কোথায় স্ত্রীর চিঠি পড়া, কোথায় সাজবদল, কোথায় কী! উভয়সঙ্কটে পড়ে উত্তেজনা চেপে আচার্য ওবারাকে বললুম, "প্রেসিডেন্ট ওবারা, আপনিই বলুন এখন আমার কর্তব্য কী। ব্যালে দেখতে যাব না ডিনার খেতে যাব?"

ওবারা-সান বয়সে অনেক বড়। আমুদে মানুষ। রঙ্গ করে বললেন, "আরে, বাবা, যে জিনিস দেখতে আমেরিকা থেকেও মানুষ উড়ে আসছে সে জিনিস পায়ে ঠেলতে আছে? গো। গো। গো ইমিডিয়েটলি। আমাদের জন্যে ভাববেন না। আমরা গিয়ে খানা খাব ঠিক। এখন শুধু একটিবার টেলিফোন করে নিমন্ত্রণকর্তার অনুমতি নিন।"

ছ'টায় আরম্ভ। আর মিনিট দশেক বাকী। তার পাঁচ মিনিট গেল টেলিফোনে। স্নান করছেন পুষ্পদাস। টেলিফোন ধরলেন তাঁর পত্নী। আমার কথা শুনে বললেন, "এক শ' বার। এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে নেই। না, আপনাকে আটটার মধ্যে উঠে আসতে হবে না। ন'টা। সাড়ে

ন'টা। দশটা। যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ দেখবেন। আমরা আপনার জন্যে খাবার নিয়ে বসে থাকব। না, এতে আমাদের একটুও অসুবিধে হবে না।"

কাছেই কোমা থিয়েটার। আমার ধারণা ছিল সেইখানে হবে। কিন্তু টিকিটের পিছনে জাপানী ভাষায় লেখা ছিল ইণ্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম। সেটা স্থমিদা নদীর ও পারে। বহু দূরে। ওবারাদের পুষ্পদাসের ওখানে দিয়ে তাঁদেরি গাড়ী নিয়ে উধাও হলুম আমি, অবশ্য তাঁদেরি পরামর্শে। নইলে ফিরে আসার সময় ট্যাক্সি পেতে কষ্ট হতো। খরচ তো বাঁচলই। কিন্তু আমার তখন বিপরীত বুদ্ধি। কেন আমাকে ট্যাক্সি করতে দিলেন না, কেন আমাকে পুষ্পদাসের বাড়ী ঘোরালেন, আগে সময় না আগে টাকা! ঘড়ির দিকে চেয়ে থাকি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট···প্রায় চল্লিশ মিনিট দেরি হলো পৌঁছতে। অথচ ওঁরা যদি না থাকতেন, জাপানী ভাষায় কী লেখা আছে যদি না বলতেন, তা হলে আমি তো কোমা থিয়েটারে গিয়ে আরো এক চক্কর ঘুরতুম, আরো দেরিতে পৌঁছতুম। কিংবা পৌঁছতুমই না আমাদের দূতাবাসের জর্জের মতো। জাপানে বাস করে জাপানী না জানার ফলে বেচারার রাশিয়ান ব্যালে দেখা হলো না, যদিও টিকিট জুটেছে আমারি মতো।

"কই, মিঃ জর্জ কোথায়!" বার বার উঠছিলেন রুশ দূতাবাসের রোজানোভ। আমার আসন তাঁরই এক পাশে। আমার আশাও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। বললেন, "আঃ! আপনার জন্যে টিকিট জোটাতে আমাকে যা করতে হয়েছে! আপনি যদি আমাকে এক মাস আগে খবর দিতেন।" আমি তখন ভারতবর্ষে শুনে অপ্রতিভ হয়ে বললেন, "ওঃ! তাই তো! কিন্তু টিকিট সব এক মাস আগে থেকে বিক্রী। কোনো মতেই আপনার জন্যে আসন মেলে না। আজ শেষ দিন। বেশী লোক দেখতে পাবে বলে স্টেডিয়ামে ব্যালে দেখানো হচ্ছে। স্টেডিয়াম কি ব্যালের উপযুক্ত! আর এইসব আসনে কি রাষ্ট্রদূতদের বসতে দেওয়া যায়! বেঁচে গেল কয়েকটা জায়গা। ভাবলুম আপনি তো ডিপ্লোম্যাট নন, লেখক মানুষ, আপনার হয়তো অপমান লাগবে না। তাই সাহস করে পাঠালুম একখানা টিকিট।"

ভাগ্যিস আমি ডিপ্লোম্যাট নই। লেখক। রোজানোভকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, "এ কিছু মন্দ আসন নয়, কিন্তু এর চেয়ে মন্দ আসনেও আমার আপত্তি ছিল না। আমরা আর্টিস্টরা সব রকম অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত। যদি সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাই। যদি সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করতে পারি। এখন আমাকে বলুন, 'সোয়ান লেক' দেখানো হয়েছে কি না।"

না। দেখায়নি। বাঁচলুম। সারা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি যে ট্যাক্‌সিভাড়া রাখতে গিয়ে আমি হয়তো "সোয়ান লেক" হারাচ্ছি। কুল রাখতে গিয়ে শ্যাম।

গুনমা মানেকিনেকো

॥ বাইশ ॥

"সোয়ান লেক" সেদিনকার প্রোগ্রামে ছিল না। যার জন্যে আমার দ্বিতীয় বার আসা। ওটা শেষ রজনীর পর শেষ অতিরিক্ত রজনী। শিল্পীরা সকলেই শ্রান্ত। আস্ত একটা ব্যালের জন্যে দম নেই। তা ছাড়া যাদের জন্যে এই শেষ অতিরিক্ত রজনী তারা রসিক দর্শক নয়, সর্বসাধারণ। তারা চায় বিচিত্র অনুষ্ঠান। তাই প্রোগ্রাম হয়েছে ভগ্নাংশের সঙ্গে ভগ্নাংশ জুড়ে। কিংবা স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডনৃত্যের পর স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডনৃত্য সাজিয়ে।

সূচীর অনেকগুলি অংশ আমার আগের বারই দেখা ছিল। সেগুলি বাদ দিলে যেগুলি থাকে তাদের মধ্যে ছিল "ডাইং সোয়ান"। মুমূর্ষু মরাল। পাভলোভার প্রিয় নৃত্য। পাভলোভা আপনি। ত্রিশ বছর পূর্বে পাভলোভাকে দেখেছিলুম নাচতে। সে নাচ যে আর কেউ নাচতে পারে তা কল্পনা করা শক্ত। নাচলেন তিখোমিরনোভা। এঁর স্থান বোলশয় থিয়েটারে লেপেশিন্‌স্কায়ার ঠিক পরে। এ নাচ এমন নাচ যে বার বার দেখেও তৃপ্তি হয় না। মৃত্যুর বিষাদ জীবনের শুভ্র কোমল পাখার উপর শান্তির মতো নেমে আসে। ঢলে পড়ে হাঁসটির গ্রীবা। ধীরে। অতি ধীরে।

এটি দেখার পর আর কিছু দেখার অভিলাষ ছিল না। বেশীর ভাগই পুনরাবৃত্তি কিংবা জনতার তুষ্টিবিধান। কিন্তু লেপেশিন্‌স্কায়াকে একবারও দর্শন না করে কেমন করে উঠি! আটটা বাজল। সাড়ে আটটা বাজল। মনে মনে সংকল্প করলুম ন'টায় গা তুলব। দর্শন হয় হবে, না হয় না হবে। কিন্তু সত্যি সত্যি ন'টা যখন বাজল অথচ দর্শন মিলল না তখন দেখি পা উঠতে চায় না। পা যদি না ওঠে গা উঠবে কী করে! ওদিকে বসে আছেন নৈশভোজনের অতিথিরা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমার দ্বারা নির্বাচিত। কী লজ্জা! কিন্তু আমার তখন লজ্জাবোধের চেয়ে প্রবল হয়েছিল জেদ। ব্যালে দেখতে এলুম, লেপেশিন্‌স্কায়াকেই দেখলুম না। হ্যামলেট দেখতে এলুম, হ্যামলেটকেই দেখা হলো না। এ কি কখনো হয়! তবে কি তিনি এখনো পা ভেঙে পড়ে আছেন? না, আমি যখন এসে পৌঁছইনি তখন নাকি তিনি একবার নেচেছিলেন। তাতে আমার খেদ শুধু বেড়ে গেল। তা হলে তিনি নৃত্যক্ষম। আমার অনুপস্থিতিতে নাচবেন আবার। দেখুন দেখি কী অন্যায়!

এমনি করে গেল কেটে পাঁচ মিনিট। লেপেশিন্স্কায়ার জন্যে আকুল প্রতীক্ষায়। অন্যদের তো আমার মতো দোটানা নেই। তারা প্রত্যেকটি দৃশ্যের পর করতালির করতাল বাজিয়ে "আঁকোর" জানাবে। আর নাচিয়ে বেচারিকে পুনর্বার নাচিয়ে ছাড়বে। হাঁস মরে গেছে, ওরা তা মানবে না। মরা হাঁসকে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে, নাচতে নাচতে মরতে হবে। সব চেয়ে কৌতুকের ব্যাপার গ্রাণ্ডদিনকেই লোকে সব চেয়ে পছন্দ করে। যেমন কোমা থিয়েটারে তেমনি স্টেডিয়ামে তাঁকেই নাচতে হলো বার বার তিন বার। বাশকির অঞ্চলের শিকারীর নাচ। শিকারীর কাণ্ড দেখে বাঁচিনে। নাচ নয় তো, মুহুর্মুহু হাই জাম্প। দুই হাত দুই পা পরিপূর্ণভাবে মেলে সোজা করে সমান্তরাল করে সে কী ওস্তাদী উল্লম্ফন! রবারের বলের মতো উঠছে আর পড়ছে। আর হাত পা ছড়িয়ে শূন্যে ভেসে থাকছে। "আঁকোর"! "আঁকোর"! তালি বাজছে তো বাজছেই। শেষ আর হয় না। ওদিকে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ন'টা বেজে যখন বিশ মিনিট, যখন আমি মরীয়া হয়ে আসন ছাড়তে উদ্যত, তখন কাকে দেখতে পেলুম, বলুন তো? প্রেওবাজেন্স্কিকে। শীত যদি আসে বসন্ত কি খুব বেশী পেছিয়ে থাকতে পারে? না, পারে না। দেখতে দেখতে প্রবেশ করলেন লেপেশিন্স্কায়া। "ডন কুইকসোটে"র একটি দৃশ্য। আস্ত একটা ব্যালে না হলেও সত্যিকার ব্যালের একাংশ। আমার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা সার্থক হলো। ভুলে গেলুম কোথায় কে আমার জন্যে বসে আছে নৈশভোজনের দলে। ভুলে গেলুম আমার নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা। এও তো একপ্রকার ভোজ। সৌন্দর্যের ভোজ। কত বার যে লেপেশিন্স্কায়া পায়ের আঙুলের ডগার উপর ভর দিয়ে ঘূর্ণিহাওয়ার মতো ঘুরলেন! কেমন অবলীলা-ক্রমে! কত বার যে তাঁর নৃত্যসহচর তাঁকে শূন্যে তুলে ধরলেন। যেন ইনি একটি হারকিউলিস আর উনি একটি পাখী! মানবদেহের সুষমা ও সৌষ্ঠব পূর্ণ প্রকট হলো। কী প্রাণচাঞ্চল্য! কী শক্তিমত্তা! কী উল্লাস! কী কুশলিতা! ওদিকে সঙ্গীত পরিচালনা করছিলেন রজ্‌ভেণ্টভেন্স্কি। আরেক জাদুকর।

ব্যালেরিনাকেই প্রশংসার ষোলো আনা দেওয়া রেওয়াজ। কিন্তু তাঁর পার্টনার যদি হন প্রেওব্রাজেন্স্কির মতো গুণী তবে প্রশংসাটাকে সমান সমান

না হোক দশ আনা ছ' আনা ভাগ করে দিতে হয়। পরে একদিন চন্দ্রশেখর বলেছিলেন, "আমার মতে প্রেওব্রাজেন্স্কি কোনো অংশে কম নন। বরং বড়।" রুশ দূতাবাসের ককটেল পার্টিতে চন্দ্রশেখর তো সোজা বলে বসলেন, "আপনার নাম প্রেওব্রাজেন্স্কি। আমাদের ভাষায় প্রিয় কথাটার মানে কী, জানেন?" মঞ্চের বাইরে কিন্তু তাঁকে হারকিউলিসের মতো বলবান মনে হয় না। অথবা তাঁর সঙ্গিনীকে বিহঙ্গের মতো লঘুভার। জাপানে এসে এই তিন সপ্তাহে তাঁর ওজন কমে গেছে বারো না চোদ্দ পাউণ্ড। বোধ হয় ব্যালেরিনার বাহন হয়ে। পরে অবগত হয়েছি তা নয়, আমার ও ধারণা ভুল। ব্যালেরিনাদের এমন স্থকৌশলে ধারণ করতে হয় যে পার্টনারদের উপর চাপ পড়ে না। আর ব্যালেরিনারা এমন স্থকৌশলে নাচেন যে চাপ পড়ে পায়ের উপর নয়, উরুর উপরে।

এ যুগের সাধারণ দর্শক সে যুগের অভিজাত নয়। ব্যালেকে যদি সেকালের একটা মরা নদী না করে একালের বহতা নদী করতে হয় তবে এ যুগের সাধারণের মুখ চেয়ে বিষয় মনোনয়ন করতে হবে। দেখলুম জাপানের সাধারণ চায় লোকনৃত্য। চায় য়্যাক্রোবাটিক্স। বোধ হয় সব দেশের সাধারণ তাই চায়। তা বলে অভিজাত ঐতিহ্য এখনো নিঃশেষ হয়নি। ব্যালের নিঃশ্বাস এখনো ক্লাসিকাল নৃত্য বা নাট্য। যা দিয়ে লেপেশিন্স্কায়ার ও প্রেওব্রাজেন্স্কির অগ্নিপরীক্ষা। এই দুই ধারার মাঝামাঝি হচ্ছে ফ্যান্টাসি নৃত্য বা নাট্য। স্বপ্নময়, ভাবময়, কল্পনাপ্রবণ। যেন পরীর রাজ্যে নিয়ে যায়। তিনটে ধারাই কম বেশী থাকে যে কোনো দিনের প্রোগ্রামে, যদি না আস্ত একটা ব্যালে মঞ্চস্থ করতে হয়। সে রকম হয়েছিল একদিন কি দু'দিন। কে আমাকে টিকিট দিচ্ছে যে দেখতে যাব!

ব্যালের জন্যে চাই অসীম স্পেস। বিপুল মঞ্চ না হলে ব্যালে জমে না। নাচতে হয় হাত পা ছড়িয়ে, প্রাণ খুলে, দলে দলে, আবর্তন করে। ব্যালে শুধু পায়ের কাজ বা হাতের কাজ নয়। সারা দেহের সকল অঙ্গের কাজ। তা ছাড়া অভিনয় তো বটেই। তাকে স্বল্পপরিসর একটি মঞ্চে সংক্ষেপিত করা যায় না। আমাদের দেশে তার উপযুক্ত মঞ্চই নেই। জাপানে আছে। জাপানীরা এসব ক্ষেত্রে কত যে অগ্রসর তা ভারতে থাকতে আমরা অনুমান করতে পারিনে। বোলশয় থিয়েটারের ব্যালে সম্প্রদায় ভারতে এলে নাচবে

কোথায়! তা সত্বেও তাঁদের আমি স্বাগত জানিয়ে এসেছি। বলেছি, আসবেন, আসবেন আমার দেশে। বলেছি সেদিন নয়, পরের দিন। হাঁ, পরের দিনও তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল। নিমন্ত্রণ ছিল সোভিয়েট দূতাবাসে। পরে বলব সে কথা।

সে রাত্রে পুষ্পদাসের ওখানে খেতে গিয়ে দেখি তখনো অতিথিরা অপেক্ষা করছেন, কিন্তু আহারের পরে। ক্ষমাপ্রার্থনা করলুম সকলের কাছে। আলাপ করব কখন! রাত তখন দশটা। একে একে প্রস্থান করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়দর্শন সুধী হাজিমে নাকামুরা। সস্ত্রীক। ভারত সম্বন্ধে গবেষণার গ্রন্থ উপহার দিয়ে বললেন, "শিবাঃ সন্তু পন্থানঃ।" সুন্দর সংস্কৃত উচ্চারণ। সময় থাকলে যাওয়া যেত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে, তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি ভারতীয় দর্শন অধ্যাপনা করেন।

আমার সুখের জন্যে ধরে রেখেছিলুম ওবারা ও ইনাজুকে। তাঁদের তো আরো দূরের পাল্লা। যেতে হবে তামাগাওয়া। কৃতজ্ঞতা জানালে যদি ক্ষতিপূরণ হতো! তার পর আমাকে ভোজনে বসিয়ে দিলেন পুষ্পদাস গৃহিণী। ফরাসী মহিলা। পুষ্পদাস স্বয়ং পণ্ডিচেরীবাসী। গল্প করা গেল রাত জেগে। তার পর ওঁরা দুজনে গাড়ী করে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিলেন। পথে যেতে যেতে এক অস্ট্রিয়ান মহিলার স্বামী জাপানী ডাক্তার বললেন, "আপনার কাওয়াবাতা য়াসুনারি, শিগা নাওইয়া ইত্যাদির যুগ গেছে। আজকের জাপানে কে এঁদের লেখা পড়ে!"

মধ্যরাত্রির দৃশ্য দেখতে দেখতে চললুম। দোকানপাট তখনো কিছু কিছু খোলা। কিন্তু নিওনের রঙীন আলোর বিজ্ঞাপন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে বা নিবে গেছে। রাস্তায় ভিড় নেই, মোটরের সংখ্যাও কম। অবশেষে এলো শিন্জুকু। শুনেছিলুম তোকিয়োর ওটি একটি লালবাতি এলাকা। ও পথ দিয়ে রাত করে পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে বারণ করেছিলেন ঝা-ঝা। একলা পদাতিক দেখলে চোর বাটপাড় যদি বা ছাড়ে ললনারা ছাড়বেন না। তোকিয়োর সমৃদ্ধির সোনার অন্তরালে দারিদ্র্যের ভয়াবহ খাদ। সেটা দিনের বেলা পুলিশের দাপটে গোপন থাকে। রাতের বেলা নরখাদক হয়। এক হাতে বিভব ও অন্য হাতে ব্যাধি বিস্তার করে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম যার অভিমুখে মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে তা সুখস্বর্গ নয়। এমন কি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত

হলেও নয়। তাই থোরো, টলস্টয়, গান্ধী, মুশাকোজি প্রভৃতি দিশারীরা বলছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ফিরে চল মাটির টানে।" কিন্তু সে ফিরে যাওয়া যেন মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া না হয়।

পরের দিন পঁচিশে সেপ্টেম্বর। আর তো বেশী দেরি নেই, এবার ফিরে চল দেশের টানে। কেনাকাটা করতে হবে। চাতানী-সান সহায় হলেন। নিয়ে গেলেন মিৎসুকোশিতে। জাপানের এইসব ডিপার্টমেণ্ট স্টোর এক একটি মহাভারত বিশেষ। যাহা নাই এখানে তাহা নাই জাপানে। যদি কেউ এক দিনে জাপান দর্শন করতে চান তা হলে তাঁকে পরামর্শ দেব মিৎসুকোশি কিংবা তাকাশিমায়া কিংবা দাইমারু ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে দিনটা কাটাতে। কিনতে যে হবেই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, নামমাত্র কিছু কিনলেও চলবে। তবে না কিনে তিনি থাকতে পারবেন না। লোভ হবে সব কিছু কিনতে। ইচ্ছা করলে গান শুনতে পারেন। ক্লাসিকাল ও আধুনিক গান। ছবি দেখতে পাবেন। সেকালের ও একালের। শিক্ষার ও বিনোদনের অকৃপণ ব্যবস্থা। কিনলুম উপহার সামগ্রী, বেশীর ভাগই পুতুল। তার পর চাতানী আমাকে এগিয়ে দিলেন। স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটা গেল কলের ভিতর মুদ্রা ফেলে। ট্রেনে উঠলুম আমি, বিদায় দিলেন তিনি। কেনা জিনিস বাড়ী পাঠানোর ভার নিল স্টোর।

ঘুরে ফিরে শিন্‌জুকু স্টেশন। স্টেশন থেকে বেরোতেই নাকামুরায়া রেস্টোরাণ্ট। সেই যার মালিক ছিলেন রাসবিহারী বসুর শ্বশুর। এই পরিবার যেমন ধনী তেমনি বদান্য। এঁদের টাকায় একটি কলেজ চলে শুনেছি। যত দূর জানি রাসবিহারী বসুর কন্যাই এখন রেস্টোরাণ্ট চালান। চলে ভালো। লিফ্‌টে চড়ে উপরের তলায় গিয়ে দেখি আমার জন্যে একটি কক্ষে অপেক্ষা করছেন হিরোশি নোমা প্রভৃতি অত্যাধুনিক লেখক আর আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন ওকাকুরা-সান। পরে তিনি ও তাঁর পত্নী যোগদান করলেন। আহার পরিপাটী হলো।

হিরোশি নোমা একখানি উপন্যাস থেকেই যা কিছু মানুষের কাম্য সব কিছু পেয়েছেন। প্রভূত যশ, প্রচুর বিত্ত, রাজধানীতে বাড়ী, সুন্দরী ভার্যা। বইখানির ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে। "Zone of Emptiness." জাপানীতে "শিন্‌কু চিতাই।" শূন্য তেপান্তর। নোমা আমাকে মূলগ্রন্থটি উপহার

দিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁকে ধরে নিয়ে সৈনিক করেছিল। সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে ঔপন্যাসিক করে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কদর্য অভিজ্ঞতা। এর পর তিনি হন কম্যিউনিস্ট ও শান্তিবাদী। তা বলে তাঁর উপন্যাসটি কম্যিউনিস্ট উপন্যাস নয়।

যুদ্ধোত্তর জাপানী কথাসাহিত্য প্রধানত যুদ্ধঘটিত, যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়ঘটিত। আমাদের দেশে যেমন একদা প্রবাদ ছিল কান্না বিনা গান নেই, তেমনি জাপানেও যুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রথা ছিল গেইশা বিনা গল্প নেই। এখন সে জমানা গেছে। সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও রণতন্ত্রের উপর নতুন জেনারেশনের অধিকাংশ লেখক বিরূপ। গেইশা তো সেই একই জীবনপরিকল্পনার অঙ্গ। সাহিত্য ক্রমে গেইশার কবল থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কোনো রকম মোহ নয়, নিদারুণ বাস্তব নিয়ে একালের সাহিত্যিকদের কাজ। নোমার চেয়ে আরো নাম করেছেন শোহেই ওওকা। পরাজিত ও ভগ্নমনোবল সৈনিকরা ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের মাংস খেতে বাধ্য হয়। ওওকা তাই শুনে "নোবি" লেখেন। তামুরা বলে এক পরিত্যক্ত সৈনিক ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর চোখে আগুন দেখছে।

নোমা-সান বললেন, "আমি কিন্তু I-novel লিখিনে।"

এর মানে কী হলো আন্দাজ করতে আমার বেশ কিছু সময় লাগল। মানে, জাপানী ঔপন্যাসিকরা সাধারণত গল্প বলান "আমি" বলে একজনকে দিয়ে। গল্পটা বলছে কে? না "আমি।" নোমা এই রীতি বর্জন করেছেন। এটাও কি যুদ্ধোত্তর পরিবর্তন? জানিনে।

সেদিন নোমা-সানকে নিয়ে আমি একটু তামাশা করলুম। বললুম, "অত টাকা নিয়ে আপনি করলেন কী না বাড়ী তৈরি! বুর্জোয়ারা যা করে!"

তিনি বললেন তিনি কিছু দানখয়রাতও করেছেন। তার পর আমাকে চমকে দিলেন এই বলে যে, "আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট তো নেহরু গবর্ণমেণ্টের মতো ভালো গবর্ণমেণ্ট নয় যে বাড়ী বানিয়ে দেবে।"

নেহরু সম্বন্ধে জাপানীদের ধারণা প্রায় হিমালয়ের মতো উচ্চ। আমার চলে আসার ঠিক পরে তিনি জাপান পরিক্রমায় যান। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর জাপান থেকে এক বন্ধু লিখলেন যে, ও-দেশের জনগণ নেহরুকে যেমন

সম্বর্ধনা করেছে তেমনটি কোনো কালে কোনো বিদেশীকে করেনি। এত শ্রদ্ধা, এত ভালোবাসা আর কোনো আগন্তুক পাননি।

সেদিনকার পার্টিতে আরো কয়েক জন লেখক ছিলেন। তাঁদের অনুরোধে আমার নিজের সাহিত্যিক আদর্শ নিয়ে দু'কথা বলি। চিরকাল আমার বিশ্বাস ছিল সত্য বলতেই হবে, সুন্দর করে বলতেই হবে। কিন্তু কিছুকাল থেকে আমার ধারণা এই যথেষ্ট নয়। অন্তঃসৌন্দর্য থাকা চাই। প্রথমে করতে হবে অন্তঃসৌন্দর্যের উপলব্ধি, তার পরে তার প্রকাশ। শুধুমাত্র অন্তঃসৌন্দর্য নয়। সার সৌন্দর্য। এসেনশিয়াল বিউটি।

গরম জলে-ভেজা তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মোছা আহারে বসার আগে একবার হয়েছিল, আহারান্তে আবার হলো। গল্প করতে করতে আমরা সময় অতিক্রম করেছিলুম। ওকাকুরা গৃহিণী উঠলেন, উঠে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন একটি উপহার, রায়গৃহিণীর জন্যে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর স্বামী আর আমি চললুম অধ্যাপক তোমোজি আবের বাড়ী। বাড়ীর নম্বর যদি দেওয়া থাকে ১৩৬৭ আর রাস্তা সম্বন্ধে যদি বলা হয়ে থাকে সেতাগায়া ২-ভাগ তা হলে খুঁজে পেতে বেশ একটু কষ্ট হয় বইকি। ট্যাক্‌সিওয়ালার মজা।

ওদিকে আবে মহাশয় আমাদের জন্যে পথ চেয়ে বসে আছেন। তাঁর ওখান থেকে যেতে হবে সোভিয়েট দূতাবাসে, সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে কতটুকুই বা কথা হতে পারে! তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হলো ইনটেলেকচুয়াল বা মননশীল। একদা তিনি নিউ আর্ট গোষ্ঠীর ধনুর্ধর ছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধজনিত মানসিক যাতনার কথা লেখেন। যুদ্ধের পরে ছাত্রদের মনের অবস্থার কথা। বিবেকবান ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে তিনি সামাজিক বিষয় নিয়েও মন্তব্য করেন। পেন কংগ্রেসে জাপানের প্রতিনিধি হয়ে এডিনবরা যান, ইউরোপ ঘুরে আসেন। দিল্লীতে যে এশিয় লেখক সম্মেলন হলো তাতে জাপানের প্রতিনিধিরূপে তিনিই পাঠিয়েছিলেন য়োশিয়ে হোত্তাকে। সেদিন যে হাইড্রোজেন বোমাবিরোধী কনফারেন্স বসল জাপানে, তার জন্যে তাঁকেও খাটতে হয়েছে। মনে হলো তিনি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন আর্টের রাজ্য থেকে কল্যাণের রাজ্যে। তাঁর বিবেক তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তৎকালীন একখানি "নিউ স্টেটসম্যান।"

একটি প্রবন্ধ ছিল, পড়তে বললেন। ভাস্কো ডা গামা যখন সমুদ্রপথে ভারত আবিষ্কার করেন তখন ভারতের জাহাজ আফ্রিকার বন্দরে বন্দরে। ভারতীয় লস্করই তাঁকে পথ দেখিয়ে ভারতে নিয়ে আসে। খাল কেটে কুমীর ডাকার পরিণাম গোয়া দখল। সে যাই হোক, আবিষ্কারক মহাশয় কিছুই আবিষ্কার করেননি। সমুদ্রের পথঘাট ভারতীয়রাই তাঁর চেয়ে ভালো জানত। আর আফ্রিকাও অসভ্য মানুষের দেশ ছিল না। ছিল বন্দরে বন্দরে আকীর্ণ।

আবে গৃহিণী চা নিয়ে এলেন। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে। আধুনিক জাপানী গৃহস্থের সংসারে দু'রকম আয়োজন থাকে। যাঁরা চেয়ার না হলে বসবেন না তাঁদের জন্যে চেয়ার, টিপয় ইত্যাদি। যাঁরা মাদুরে বসা পছন্দ করেন তাঁদের জন্যে জলচৌকির মতো উঁচু চতুষ্পদ। যাঁরা ছুরি কাঁটা চীনামাটির প্লেট না হলে খাবেন না তাঁদের জন্যে তাই। আবার যাঁরা ল্যাকারের বাসন ও চপস্টিক ভালোবাসেন তাঁদের জন্যে সে রকম। একবার ইউরোপীয় পোশাক মেনে নিলে আর সব একে একে আসে। তা বলে নিজেদের চিরাচরিত অশনবসন কেউ ছাড়তে পারে না। সে সবও থাকে। জাপানের দোটানা কেটে গেছে। সে এখন দুই সভ্যতাকেই জাতীয় জীবনের দুই অঙ্গ করে নিয়েছে। সদর ও অন্দর।

কিন্তু সহ-অবস্থান আর সামঞ্জস্য তো একই জিনিস নয়। সদরের সঙ্গে অন্দরের খুব যে একটা সামঞ্জস্য হয়েছে তা তো মনে হয় না। তার পর আধুনিকতাকে নিয়ে আমাদের যে সমস্যা জাপানেরও সেই সমস্যা। মধ্যযুগে ফিরে যেতে চাইনে, তার মানে কি এই হলো যে নীতি চাইনে, ধর্ম চাইনে? নীতি চাই, ধর্ম চাই, তার মানে কি এই হলো যে মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই? আসল কথা মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের যেমন অতিবৃদ্ধি ঘটেছে তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে নীতির বা ধর্মের সেই অনুপাতে বিকাশ বা বিবর্তন হয়নি। আধুনিক যুগের নীতিনিপুণরা তথা ধর্মাত্মারা মধ্যযুগেই রয়ে গেছেন, যে দু'চারজন যুগের সঙ্গে পদযাত্রা করছেন তাঁরাও তাঁদের যুগটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। একে বর্জন করতে পারলেই তাঁদের কাজ সোজা হতো। তা যখন সম্ভব নয় তখন সে ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। সহ-অবস্থান। সামঞ্জস্য নয়।

অধ্যাপক আবে আমার পেন কংগ্রেসের বক্তৃতা পড়েছিলেন। বললেন, "মর্মস্পর্শী হয়েছে। মোটের উপর আমাদের বেলাও প্রযোজ্য।"

আমরা যে সাম্প্রদায়িক হিংসাবাদীদের দমন করতে গিয়ে অহিংসায় অটল থাকতে পারিনি আমার এ কথা তাঁর স্মরণ ছিল। "জানেন, আমাদের এখানেও শোভিনিস্টরা সক্রিয়।"

যথাকালে লিখতে ভুলে গেছি যে ফ্রেণ্ড্‌স্ সেণ্টারে কে একজন ভদ্রলোক কি ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন, "আমরা তো ভারতের দিকে চেয়ে বসে আছি। নেতৃত্বের জন্যে।" আমি উত্তর দিয়েছিলুম, "অমন করে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবেন না। আমরা বিনম্র হতে চাই। আমাদের গৃহবিবাদেরই অন্ত হয়নি। হিংসার আশ্রয় না নিয়ে আত্মরক্ষা করতে কি পারব! আমরা আপনাদের অত বড় প্রত্যাশার যোগ্য নই।"

আমার প্রত্যাবর্তনের পর জবাহরলাল যে জাপানের বুকের উপর প্রীতির এক টাইফুন বইয়ে দিয়ে এলেন, উদ্বেল হলো তার বক্ষ, এর রহস্য কী? ভারতের কাছে নেতৃত্বের প্রত্যাশা। মানবজাতি যাতে রক্ষা পায়। যার যার গোষ্ঠীগত আত্মরক্ষা নয়, সমষ্টিগত আত্মরক্ষা।

সেদিন অধ্যাপক আবের সঙ্গে আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ছুটতে হলো রুশ দূতাবাসে। ককটেল পার্টি শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে। সময়মতো না পৌঁছলে বা দম্পতি হয়তো আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না, তখন আমাকে থান্না দম্পতির বাড়ী খানা খেতে নিয়ে যায় কে? রাস্তাঘাট কোন নম্বর জানিনে। রুশ দূতাবাসে দেখি লেপেশিন্‌স্কায়া হল-ঘরে দাঁড়িয়েছেন। কল্পতরুর মতো। তাঁর চার দিকে অটোগ্রাফপ্রার্থীদের ব্যূহ। রোজানভ আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। কী আফসোস! তিখোমিরনোভাদের অটোগ্রাফ যাতে ছিল সেই খাতাখানা সঙ্গে নেই। নোটবুকটা তাঁর হাতে দিয়ে বললুম, "মাদাম, আমার কন্যাদ্বয়ের জন্যে অটোগ্রাফ।" মাদাম ফস্‌ফস্ করে ইংরেজীতে দু'ছত্র লিখে সই করলেন দু'বার। বললেন "এক মেয়ের জন্যে ইংরেজীতে, আরেকটির জন্যে রুশভাষায়।" ক্ষিপ্র, কর্মঠ, প্র্যাকটিকাল প্রকৃতির মহিলা। কে বলবে যে ইনিই সেই ব্যালেরিনা! বরং স্ত্রেওব্রাজেনস্কিকে দেখে মনে হয় আপন-ভোলা উদাসী আর্টিস্ট।

লেপেশিন্‌স্কায়ার সঙ্গে পরে আবার কথাবার্তা হবে ভাবিনি। দূতাবাসের

মিসেস মালিক বললেন, "আমাকেও আলাপ করিয়ে দিন না।" মাদাম পাশের ঘরে বসে অন্য একজনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফাঁক পাওয়া গেল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "আসুক ঝড়, আসুক বৃষ্টি, আসুক বরফ, নাচের আমার কোনো দিন খেলাপ হবে না। এ-বেলা তিন ঘণ্টা ও-বেলা তিন ঘণ্টা প্রতিদিন আমি নাচবই। এ গেল আমার দৈনিক অভ্যাস। এ ছাড়া মঞ্চের নাচ। না, জাপানেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।"

কী অদম্য সংকল্প, অচল নিষ্ঠা! এ না হলে সাধনা! নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে লজ্জা পেলুম। আমার তো খেলাপটাই অভ্যাস, অভ্যাসটাই ব্যতিক্রম। মনে মনে বললুম, আসুক ঝড়, আসুক বৃষ্টি, আসুক পশ্চিমে হাওয়া, লেখার আমার খেলাপ হবে না, রোজ ছ'ঘণ্টা আমি লিখবই। এটা যেন লেপেশিন্স্কায়ার বাণী। আমার উদ্দেশে দেওয়া।

মাদামকে বললুম, "সেদিন আমাদের রাষ্ট্রদূতের মধ্যাহ্নভোজনে আপনি এলেন না। নিরাশ হলুম। আমার যে দেখতে ইচ্ছা ছিল আপনি কী কী খান, কত খান।"

"ওঃ! নাচতে নাচতে এক একদিন রাক্ষসের মতো খিদে পায়। কিন্তু খেলে কি রক্ষা আছে! অকেজো হয়ে পড়ব যে!" তিনি হাসতে হাসতে বললেন।

এর পর হল-ঘরে ফিরে গিয়ে চন্দ্রশেখর ও লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে দেখা। তাঁরাও চাইলেন মাদামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ইতিমধ্যে লেপেশিন্স্কায়া কী মহার্ঘ পুষ্পগুচ্ছ উপহার পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রদূত ভবনে! ধন্যবাদ দিলেন ঝা দম্পতি। তখন কথাপ্রসঙ্গে মাদাম বললেন, "আঃ! কী নাম ওঁর! রাজ। রাজ কাপুর। আমার বন্ধু। আর ওই যে ফিল্ম! 'আওয়ারা'! আহা! কী চমৎকার ওই ফিল্ম!" ভদ্রমহিলার পুলক ও উচ্ছ্বাস আন্তরিক।

মনে মনে বললুম, মাদাম, আপনার কাছে আমি আমার হৃদয়টি হারিয়েছিলুম। কিন্তু আপনার রুচি দেখে আমার হৃদয় আমি ফিরিয়ে নিলুম।

কান্না চেপে তার পর যাই খান্নাদের সঙ্গে খানা খেতে। সেখানে এক কানাডার লোকের সঙ্গে আলাপ। তিনি বললেন, "ফুজি পর্বত আমি

শতবার দর্শন করেছি। প্রতিবারেই নূতন। আছে ওর কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি।" কথাটা আমার মনে গাঁথা হয়ে গেল।

চমকে দিলেন আমাকে এক জাপানী অফিসার। সুভাষচন্দ্র যেদিন সায়গন থেকে শেষ যাত্রা করেন তখন তাঁকে প্লেনে তুলে দেবার জন্মে উপস্থিত ছিলেন ইনি। নেতাজী বলে যান তিনি জাপান থেকে চলে যাবেন সোভিয়েট রাশিয়ায়।

শুইতা কিদেকো

॥ তেইশ ॥

যাত্রার সময় আমার বড় মেয়ে আমাকে বিশেষ করে বলেছিল ফুজি পর্বত দেখে আসতে। একবার আকাশ থেকে ও একবার তোকিয়োর দূতাবাস থেকে দৃষ্টিপাত করে ফুজি দর্শন আমার দৈবাৎ ঘটেছিল। তাই ফুজি দেখে আসার জন্যে দিন ফেলিনি। যার সময় স্বল্প ও অর্থ ততোধিক অল্প তার পক্ষে দেশময় অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ঘুরে বেড়ানো সুযুক্তি নয়। আমি স্থির করে রেখেছিলুম তোকিয়োতেই শেষের দিনগুলি কাটাব ও মানুষের সঙ্গে মিশব। দেশ দেখার চেয়ে মানুষ দেখা আমার কাছে আরো লোভনীয়।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ওবারা বলে পাঠালেন যে আমার জাপান প্রবাসের শেষ রজনীটিকে চিরস্মরণীয় করতে তিনি আমার জন্যে হাকোনে হোটেলে রাত্রিবাসের আয়োজন করেছেন। আমার সহযাত্রী হবেন ইনাজু। সহযাত্রীর কাছে শুনলুম ওবারা স্বয়ং হাকোনো গিয়ে হোটেলে ঘর পছন্দ করে এসেছেন, কথাও দিয়ে ফেলেছেন। মুশকিলে পড়লুম। "না" বলি কী করে? তা শুনে চাতানী বললেন, কোথাও যদি যেতেই হয় তবে হাকোনের বদলে নিক্কো। চন্দ্রশেখরও বললেন, নিক্কো না দেখলে খেদ থেকে যাবে। কথায় বলে, "না হেরিয়া নিক্কো কহিও না কেক্কো।" জাপানী ভাষায় কেক্কো মানে সুন্দর।

তখন শেষ মুহূর্তে আমাকে ভাবতে হলো, কাঞ্চনজঙ্ঘা না তাজমহল? কোনটা দেখব, কোনটা ছাড়ব? নিক্কোতে রাত্রিবাস করলে তোকিয়ো ফিরে এয়ার ইণ্ডিয়ার আপিসে জিনিসপত্র জমা দেওয়া হয় না। সেদিন শনিবার, একটা পর্যন্ত আপিস। তা ছাড়া জমা দেওয়ার আগে গোছগাছ করাও হয় না, উপহার জমতে জমতে স্তূপাকার। বেশীর ভাগই বইকাগজ।

বৃহস্পতিবার সকালবেলাটা গোছগাছ করতে বসলুম। অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে বুঝতে পারলুম আমার সাধ্য নয়। ওজন বেশী, পরিমাণ বেশী, আয়তন বড়। কোনো মতেই দুটো ব্যাগে ও একটা সুটকেসে আঁটে না। ছাতাটা ছড়িটার মতো আলতো নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধেও কড়া নিয়ম। কেতাবগুলো জাহাজে করে পাঠাতেই হবে। ইতিমধ্যে পুষ্পদাসের পরামর্শ চাইতে গেছলুম। তিনি বললেন, সে কি সোজা ব্যাপার! তার চেয়ে এক কাজ

করুন। ধর যাচ্ছেন জলপথে। তাঁকে ধরুন। তিনি হয়তো রাজী হবেন সঙ্গে নিতে। টেলিফোনে ধরকে ধরা গেল না। দূতাবাস থেকে বেরোচ্ছি, এমন সময় দেখি এক বাঙালী ভদ্রলোক ঢুকছেন। কে? না সচ্চিদানন্দ ধর। রাজী? আনন্দের সঙ্গে রাজী। এই অপরিচিত বান্ধব আমাকে বাঁচালেন।

তবু গোছগাছ করা আমার দ্বারা হলো না। বার বার প্যাক করি, আনপ্যাক করি। যাতে ভাণ্ডের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডকে পোরা যায়। বৃথা চেষ্টা। আরো কিছু কেনাকাটা বাকী ছিল। হোকুসাইর আঁকা ফুজি পর্বতের দৃশ্য। উড ব্লক প্রিণ্ট। **Sublime**-এর পর **ridiculous**: আমার ছোট মেয়ে চেয়েছে মাথায় মাখবার তেল, যা দিয়ে জাপানী মেয়েরা খোঁপা বাঁধে। মিসেস বাবার কাছে শুনেছে, কিন্তু নাম মনে রাখেনি। মিৎসুকোশির বিকিকিনি যাদের হাতে সেই তরুণীদের নিজে সুধাতে পারিনে, কারণ জাপানী জানিনে। চাতানীকে বলেছিলুম। তিনি খবর রাখেন না, খবর নিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন। ওকাকুরা আমার সহায় হলেন। তরুণীরা এনে দিল এক রকম তেল। বলল ওই তেল ওরা নিজেরাও মাথায় মাখে।

কিন্তু ওদের সকলের বব করা চুল। খোঁপা থাকলে তো খোঁপা বাঁধবে। ইতিমধ্যে আমি আবিষ্কার করেছিলুম যে খোঁপা জিনিসটা একালের মেয়েরা বাঁধে না। এমন কি গেইশা মেয়েরাও না। তৈরি খোঁপা কিনতে পাওয়া যায়। নানান ছাঁদের। খুশিমতো কিনে নিয়ে মাথায় বসিয়ে দিলেই হলো। মাথা জোড়া খোঁপা হচ্ছে এমন এক বিলাসিতা যার জন্যে দিনে তিন ঘণ্টা খরচ করতে বিলাসিনীরাও নারাজ। যারা খেটে খায় তারা অত সময় পাবে কোথায়! নারীর কেশ ইউরোপের মতো খাটো হয়েছে। কেশতৈল হয়েছে সেই কেশের জন্যে প্রস্তুত। কবরীর জন্যে নয়। নিরাশ হলুম। কাঁকই কিনতে ভুলে গেলুম। মেয়ে চেয়েছিল কাঁকই। ঊর্ধ্ব খোঁপার থাকে থাকে কাঁকই গোঁজা থাকে মাথার উপর টানা চুলকে খাড়া রাখতে। কাঠের কাঁকই।

নারীদের মাথা থেকে বোঝা নেমে গেছে। তারা হালকা বোধ করছে। স্বদেশীর তুলনায় পাশ্চাত্য পোশাকও লঘুভার। সৌন্দর্যের দিক থেকে হয়তো কিছু কমতি পড়ল, কিন্তু সৌষ্ঠবের দিক থেকে কিছুমাত্র না। ক'জন

মনে রেখেছেন যে ভারতবর্ষের পুরুষরাও নারীদের মতো লম্বা চুল রাখত, খোঁপা বাঁধত, চুড়া বাঁধত। চীনের পুরুষরা তো বেণী বাঁধত। এখনো দক্ষিণ ভারতে তার রেশ আছে। পাশ্চাত্য পদ্ধতি যদি পুরুষদের শিরোধার্য হয়ে থাকে তবে নারীদের হওয়া বিচিত্র নয়। একদিন ভারতেও দেখা যাবে আমাদের নারীরাও তাতেই খুশি। সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি খোঁপাও বাজারে বিকোবে। তবে আমরা তা দেখে খুশি হব না। ওঃ কত বড় শক পেলুম যখন শুনলুম যে সুন্দরীদের কবরী দোকানের পণ্য! কালে কালে কত শুনব! ঘোর কলি!

বিকেলে আমার বক্তৃতা ছিল ফ্রেণ্ডস সেণ্টারে। যে প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে বক্তৃতা তার নাম ফেলোশিপ অফ রিকন্‌সিলিয়েশন। এঁদের কাজ জাতিতে জাতিতে মৈত্রী পুনঃস্থাপন। কর্মসচিব পল সেকিয়া জাপানী কোয়েকার। বাইরে মুষলধারে বর্ষণ, ভিতরে মুষ্টিমেয় শ্রোতা। সেকিয়া বলবেন, "কী আফসোস!" আমি বললুম, "একটি মানুষ না এলেও আমি বক্তৃতা দিতুম। এক মার্কিন প্রচারক যা করেছিলেন। নেপথ্যে ছিল একটি লোক। তার জীবন বদলে গেল।" আমি বর্ণনা করলুম গান্ধীজীর গত মহাযুদ্ধকালীন নীতি ও নীতি অনুযায়ী কার্যকলাপ। প্রথমত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসাবে। দ্বিতীয়ত এবং প্রধানত মানবপ্রেমিক সত্যাগ্রহী হিসাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর আগে কেউ যুদ্ধের মাঝখানে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেননি, যুদ্ধরত সরকারকে রাজত্যাগ করতে বা রাজত্বত্যাগ করতে বলেননি। প্রতিপক্ষ তাঁকে বদনাম দিয়েছে এই বলে যে তিনি তাঁদের শত্রুপক্ষের সমর্থক ও সহায়ক, একালের বিভীষণ। তাঁকে হিংসার জন্যেও দায়ী করেছে। কোনো দেশের সরকার যদি দেশের লোকের অমতে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ও তার ফলে দেশের উপর আক্রমণ আসন্ন হয় তা হলে লোকনেতার কর্তব্য সরকারকে লোকমতের সম্মুখীন হতে বাধ্য করা। আর সত্যাগ্রহীর কর্তব্য দুই যুধ্যমান শিবিরের মধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে উভয়কে শান্ত করা, অথবা উভয়ের পেষণে গুঁড়িয়ে যাওয়া। গান্ধীজী যদি ১৯৪২ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটাতে পারতেন তা হলে তাঁর চেষ্টা হতো জাপানের সঙ্গে আমেরিকার ও জার্মানীর সঙ্গে ইংলণ্ডের তথা রাশিয়ার সম্মানজনক সন্ধিসূত্র আবিষ্কার। তা হলে পরমাণু বোমা পড়ত না। মারণাস্ত্রের নব নব

উদ্‌ভাবন রহিত হতো। গান্ধীজী ক্ষমতার জন্যে ক্ষমতা চাননি। নিজের জন্যেও না।

ওদিকে গাড়ী এসে অপেক্ষা করছিল। পাঠিয়েছিলেন এশিয়া ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি প্রাচ্যবিদ্যার্ণব রবার্ট বি হল। তাঁর ওখানে নৈশ ভোজন। হল দম্পতি দীর্ঘকাল জাপানে আছেন। বাড়ীতে জাপানী প্রভাব। খানা টেবিলেও। আমেরিকার ঐতিহ্যের যা শ্রেষ্ঠ তার পরিচয় এঁদের চেহারায়, এঁদের কথাবার্তায়, এঁদের আচরণে, এঁদের বিশ্বাসে। সফল, ধনী, সামরিক, অহঙ্কারী আমেরিকার মেজাজ আমাদের চেনা। আরেক আমেরিকা আছে। তাকে না চিনলে সে দেশের মহত্ত্ব পরিমাপ করা যায় না। ছেলেবেলা থেকে আমি এই আরেক আমেরিকার কথা পড়ে এসেছি। এর অস্তিত্ব তো আমার নিজের ঘরেই। অনায়াসেই হল দম্পতি আমাকে আপনার করে নিলেন। যদিও শেরোয়ানী পরে গেছি। হলের সঙ্গে এই তৃতীয় বার দেখা। দ্বিতীয় বার তো তিনি আমাকে চমকে দিয়েছিলেন এই প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, ভারতবর্ষেও কি আত্মহত্যার হার জাপানের মতো? না জাপানের চেয়ে কম?" আত্মহত্যা জাপানীদের কাছে ছেলেখেলা। করে বেশীর ভাগ ষোলো থেকে বিশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা। আর ষাট সত্তর বছর বয়সী বুড়োবুড়ীরা। আত্মহত্যায় পাপবোধ নেই, ধর্মভয় নেই।

নৈশ ভোজনের আলাপী অধ্যাপক উইলিয়ামস বললেন, "নিক্কো দেখে মুগ্ধ হইনি। তা ছাড়া অনবরত বৃষ্টি। আপনি যদি না দেখেন এমন কিছু হারাবেন না। কিন্তু ফুজি না দেখলে হারাবেন।" এ কথা শোনার পর আমি মনঃস্থির করলুম যে তোকিয়োর বাইরেই যদি শেষ রাতটি কাটাতে হয় তো ওবারার প্রস্তাবই গ্রাহ্য।

কিন্তু পরের দিন সকালবেলা বৃষ্টির আড়ম্বর দেখে মনে হলো ফুজি দর্শনও অসম্ভবপর। শুনলুম আবার টাইফুন আসছে। বিমান চলাচল স্থগিত। হল দম্পতিও পরামর্শ দিলেন কোথাও না বেরোতে। টেলিফোনে ওবারাকে পেলুম না, ওকাকুরাকে অনুরোধ করলুম হাকোনে যাত্রা যাতে বন্ধ হয় তার উপায় করতে।

চন্দ্রশেখর আমাকে বার বার বলেছিলেন জাপান থেকেএকটা ক্যামেরা

কিনে আনতে। জাপানী ক্যামেরা এখন দুনিয়ার সেরা ক্যামেরাগুলির মধ্যে গণ্য। আমার ও শখ নেই, ভাবলুম ছোট ছেলের জন্যে কেনাই যাক ছোট দেখে একটা। কিন্তু কেনবার সময় কী কী দেখে কিনতে হয় তা তো জানিনে। সঙ্গে যদি বাৎস্যায়ন থাকতেন! বাৎস্যায়নের কথা চিন্তা করতে করতে দূতাবাসে গেলুম। জর্জের ঘরে ঢুকে দেখি জর্জ টেলিফোন ধরে আছেন। কে যেন তাঁকে কী যেন বললেন আর তিনি তার উত্তর দিলেন, "মিস্টার রায়? তিনি এইখানেই উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন? আচ্ছা, দিচ্ছি।"

কে? না বাৎস্যায়ন! অবাক কাণ্ড! তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আসতে বললুম। তিনি আসতেই দু'জনে মিলে ক্যামেরা কিনতে যাওয়া গেল। তাঁরই পছন্দ অনুসারে কেনা গেল। তার পর আমরা একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করতে মারুনৌচির এক রেস্টোরাণ্টে প্রবেশ করলুম। জাপানের রেস্টোরাণ্টের একটি উত্তম প্রথা সেদিনকার যা মেনু তা বাইরে কাঁচের শো কেসে বস্তুগতভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। কাগজে কী ছাপা আছে তা আপনাকে পড়তে হবে না, পড়ে হয়তো বুঝতে পারবেন না, বোঝাতে পারবেন না। আপনি যে সুপটি, যে মাছটি, যে মাংসটি, যে পুডিংটি শো কেসে দেখে মুগ্ধ হলেন সেটি ওয়েট্রেসকে ডেকে দেখিয়ে দিলেই সেই রকমটি আপনার টেবিলে এসে হাজির হবে। শো কেসে জিনিসের নিচে দামও লেখা থাকে। কত খরচ হবে তার হিসাব জেনে নিয়েই খেতে বসবেন। বকসিস? বকসিস শতকরা দশ ইয়েন। কিন্তু বিলের সঙ্গে যদি বকসিস আদায় করে না নেয় তা হলে গায়ে পড়ে কেউ বকসিস দেয় না। সাধারণ রেস্টোরাণ্টে চায়ও না।

এর পর বাৎস্যায়ন চলে গেলেন নিজের কাজে। আর আমি তোকিয়ো স্টেশনে গিয়ে টিকিট কলে ইয়েন মুদ্রা ফেলে শিন্‌জুকুর টিকিট পেলুম। আমার উদ্দেশ্য শিন্‌জুকু স্টেশনে ইনাজুর সঙ্গে মিলিত হয়ে বলা যে আজ আমার হাকোনে যাওয়া হলো না, আমার জন্যে হোটেলে যে ঘর সংরক্ষণ করা হয়েছে সেটি খারিজ করা যাক।

ইনাজু মহাশয়ের সঙ্গে যখন দেখা হলো তিনি বললেন, "অসম্ভব। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, তাতে আপনার ও আমার সীট রিজার্ভ করা হয়েছে, টিকিট

কাটা হয়েছে ওদাওয়ারা পর্যন্ত। তিন মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে। আসুন, ওঠা যাক।"

সর্বনাশ! আমার সঙ্গে না আছে রাতের পায়জামা, না আছে দাড়ি কামানোর ক্ষুর। একবস্ত্রে কেউ কখনো শহরের বাইরে রাত কাটাতে যায়? তা ছাড়া ঝা-দের তো বলে আসা হয়নি যে আমি হাকোনে যাচ্ছি। ইনাজু-সানের দিকে একবার তাকালুম। তিনি নাছোড়বান্দা। "সব কিছু ওখানে পাবেন। চলুন, এখুনি ছেড়ে দেবে।"

যে-আমি এসেছিলুম টেলিফোনে খবর দিতে না পেরে সাক্ষাতে খবর দিতে যে, হাকোনে যাওয়া আমার হবে না, সেই আমি প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা টেলিফোন দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে খবর দিলুম যে, হাকোনে যাচ্ছি, সে রাত্রে ফিরব না, ঝা দম্পতি যেন অপেক্ষা না করেন। তার পর ছুটতে ছুটতে লাফ দিয়ে ট্রেনে ওঠা। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের গতিবেগ অনুভব করা।

করিডোর ট্রেন। ঝকঝকে নতুন। এই লাইনটিকে বলে ওদাকিয়ু লাইন। আমাদের যেমন কর্ড লাইন। সোজা চলে গেছে ওদাওয়ারা। সাগর অভিমুখে। দক্ষিণ দিকে। তার পর মোড় ঘুরে পশ্চিমে। হ্রদ অভিমুখে। পার্বত্য অঞ্চলে। ওদাওয়ারায় নেমে আমরা বাস ধরলুম। বাস চলল পাহাড়ে রাস্তায় অরণ্যের ভিতর দিয়ে। ওর নাম জাপানের ন্যাশনাল পার্ক। জনতা যায় ছুটির দিন চড়াই বেয়ে চড়াইভাতি করতে। সেইজন্যে এক মাইল আধ মাইল অন্তর অন্তর হোটেল সরাই দোকানপাট। স্থানে স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ। স্নানের সুযোগ। ইনাজু একখানা মানচিত্র দেখতে দিলেন। ছবি আঁকা মানচিত্র। তার এক জায়গায় লেখা ছিল "প্রমোদপল্লী"। জাপানীরা যে পাশ্চাত্য নয় এই তার প্রমাণ, হলে অবস্থানটা উহ্য রাখত। না, আধুনিকও নয়। এটা প্রাচীন মানসিকতার লক্ষণ।

জাপানের বাস জাপানের রেলগাড়ীর মতো কাঁটায় কাঁটায় চলে না। বৃষ্টিও পড়ছিল। তাই সেদিন আমাদের হ্রদের জলে স্টীমার বিহার হলো না। ওবারার আইডিয়া। কথা ছিল স্টীমার ধরে আমরা হোটেলের ঘাটে উঠব। সবটা পথ বাসে করে যাব না। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে আমরা স্থলপথেই হোটেল পর্যন্ত গেলুম। হাকোনে হোটেল। আশিনোকো

শীতের জাপান
চিত্রকর সেশু
(পঞ্চদশ শতাব্দী)

হ্রদের তটে অবস্থান। ঘরের জানালা খুললেই হ্রদের জল। মনে হয় জাহাজে বসেছি।

ইনাজু-সানকে বলেছিলুম, আমি উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নান করতে চাই। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হোটেলেই স্নানের ঘরে গিয়ে সে জল পাবেন। গিয়ে দেখি চৌবাচ্চায় গরম জল, কিন্তু সে যে উষ্ণ প্রস্রবণের তা কেমন করে জানব? জলে একটু হলদের আমেজ ছিল। উত্তাপটাও অতিরিক্ত। গা মেলে দিয়ে কয়েক মিনিট পরে গা তুলতে হলো। শোবার ঘরে যখন ফিরে আসি তখন আমি সিদ্ধপুরুষ। তপ্ত শরীরকে শীতল করতে সময় লাগল। ইতিমধ্যে রাতের খাওয়া চুকিয়ে দিয়েছিলুম। পাশ্চাত্য পদ্ধতির উপাদেয় ডিনার। এর পর এক রাশ চিঠির কাগজ ও এক বোতল কালি নিয়ে বসলুম—চিঠি লিখতে নয়, "আসাহি শিম্‌বুন"-এর জন্যে প্রবন্ধ লিখতে। ভারত জাপান সংস্কৃতি বিনিময় প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গত জবাহরলাল সম্বন্ধে।

নিঃশব্দ নিশীথ। লিখতে লিখতে ক্লান্ত হই। উঠি। জানালার ধারে যাই। খুলি। বাইরে তাকাই। আকাশে কালো মেঘ। হ্রদের জল কালির মতো কালো। দূরে একটি স্টীমার আশ্রয় নিয়েছে। কালো কেশে শাদা এক গুছি চন্দ্রমল্লিকা।

জাপানে এই আমার শেষ রাত্রি। এ কি শিবরাত্রি হবে? লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় দাঁড়ি টানলুম। তার পর শুভ্র কোমল শয্যায় আপনাকে বিছিয়ে দিলুম। তার আগে একবার জানালা খুলে দেখে নিলুম কোথায় আছি। আছি দিগন্তবিসারী হ্রদের ধারে।

ভোর হলো। কে একজন আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল দরজায় টোকা মেরে। ছ'টার বাস ধরতে হবে। ট্রেন সওয়া সাতটায়। ইতিমধ্যে সেরে নিতে হবে প্রাতঃকৃত্য। মেড এসে কামাবার সরঞ্জাম দিয়ে গেল। তার পর এলো চা। ইনাজু আর আমি শেষ দিনের প্রথম পান একসঙ্গে করলুম। জাপানে আজ আমার শেষ দিন।

সবই হলো, কিন্তু যে জন্যে হাকোনে আসা তাই হলো না। ফুজি দর্শন। এদিক খুঁজি, ওদিক খুঁজি। কোথায় ফুজি? বৃষ্টি নেই, কিন্তু কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। পর্বতের নীল মুছে গেছে। আর অপেক্ষা করতে পারিনে। বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাস ছেড়ে দিল।

ইনাজু-সানের সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছি, প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করা হয়েছে, এমন সময় লক্ষ করি ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে আমসী। তিনি একবার এ পকেট হাতড়াচ্ছেন, একবার ও পকেট। ব্যাপার কী? লজ্জায় ভাঙতে চান না। কিন্তু না বললে নয়। তাড়াতাড়িতে পার্স ফেলে এসেছেন। এখন বাস ভাড়া দেবেন কী করে? একটু পরে রেলভাড়া? টাকাও বড় কম ছিল না। পার্স যেখানে রেখেছিলেন সেখানে হয়তো এখনো পড়ে আছে। হোটেলে ফিরে যাওয়াই সুবুদ্ধি। আমি কি অনুমতি দেব? অনুমতি দেব কী আমিই প্রবর্তনা দিলুম। অবশ্য ফিরবেন তিনি একাই।

মাঝ রাস্তায় বাস থামবে না। তা ছাড়া তিনিও আমাকে ট্রেনে তুলে না দিয়ে ছাড়বেন না। ওদাওয়ারা স্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ট্রেন হাজির। উঠে দেখি ইনাজুও উঠেছেন। আমাকে এক স্টেশন এগিয়ে দিতে চান। ফেলে আসা পার্সের ভাবনার চেয়ে প্রবল হয়েছে ফেলে যাওয়া অতিথির ভাবনা। ছোট একটা স্টেশনে তিনি নেমে গেলেন। সঙ্গী হতে পারলেন না, সে দুঃখ তাঁর নীরব বদনে।

এবার ওদাকিয়ু লাইন নয়। এ হলো সেই লাইন যে লাইন দিয়ে কিয়োতো যাতায়াত করেছি। কিন্তু ট্রেন তো সেই ট্রেন নয়। তার চেয়ে নিকৃষ্ট। তেমন সাফসুতরো নয়। বহু লোক শহরে যাচ্ছে আপিস করতে। দাঁড়িয়েছে দুই কামরার মাঝখানের সেতুবন্ধে কিংবা শৌচাগারের সামনে। এরা বোধ হয় বিনা টিকিটের যাত্রী। তা বলে এরা যে রেলওয়েকে ফাঁকি দেবে তা নয়। টিকিট ঘরের পাশেই একটা ঘর থাকে। সেখানে হয় রেলভাড়া হিসাবনিকাশ। "Fare adjustment." কোনো কারণে যারা টিকিট কাটতে পারেনি তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেখানে গিয়ে বকেয়া চুকিয়ে দেয়।

এই লাইন দিয়ে যেতে যেতে অফুনা স্টেশনের নিকটে দেখতে পেলুম অবলোকিতেশ্বর বা কান্নন দেবীর মূর্তি। বার বার প্রণাম করলুম। বিদায় নিলুম জাপানের বৌদ্ধ ঐতিহ্যের তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের অনির্বাণ শিখার কাছে থেকে। জাপানের শেষ দিবসে ফুজি দর্শন হলো না। তার বদলে হলো অবলোকিতেশ্বর দর্শন। বুদ্ধের ঠিক পরেই যাঁর মান। সেই বিশাল বিগ্রহটি কামাকুরা বুদ্ধের মতো আকাশের তলে গৃহহীন। পঁচিশ বছর ধরে তার নির্মাণ

চলেছে। নির্মাণ সমাপ্ত হবার পূর্বে আদি শিল্পীর মৃত্যু ঘটেছে। এই রকম শুনলুম।

ঝা-দের সঙ্গে প্রাতরাশ। লক্ষ্মীদেবী বললেন, "কাল যখন বিকেলের দিকে রোদ উঠল তখন ভাবলুম কেন আপনাকে বাদলায় শুয়ে হাকোনে যেতে দিইনি। তার পর খবর এলো আপনি হাকোনের ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন। খুশি হলুম।"

আমি বললুম, "আমিও খুশি হয়েছি হাকোনে গিয়ে। ট্রেনে ওঠার আগে পর্যন্ত অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু ট্রেনে যখন উঠলুম, ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন দেখলুম দিনটি পরিষ্কার, গাড়ীটি নতুন, যাত্রীরা প্রফুল্ল, দৃশ্যগুলি বিচিত্র, হৃদয়টি চঞ্চল। ইউরোপে আমি একটিমাত্র য়্যাটাশে কেস নিয়ে ঘুরেছি। এবার আমি একবস্ত্রে বেড়িয়ে এলুম।"

এর পরে ঘরে গেলুম তল্পিতল্পা গুটোতে। এক মাস তো আছি জাপানে। এর মধ্যেই আমার সঙ্গে আনা ব্যাগে স্যুটকেসে আঁটছে না, কিয়োতোয় কেনা ব্যাগেও না। এত কী জিনিস! কত রকম টুকিটাকি। পুতুল। খেলনা। বই। ছবি। বিবিধ উপহার। কাকে ছেড়ে কাকে রাখি! যাকে রাখি তাকে কোথায় রাখি! যাকে ছাড়ি তাকে কোন প্রাণে ছাড়ি! জায়গা বাঁচানোর জন্যে প্রত্যেকটি দ্রব্যের কার্ডবোর্ড আধার খুলে ফেলে দিলুম। কিন্তু আধার বাদ দিয়ে ঠাসাঠাসি করতে গেলে শৌখীন সামগ্রীর গায়ে আঁচড় লাগে, দূরের পাড়িতে ভেঙেও যেতে পারে। আবার সেই সব ফেলে দেওয়া বাক্স তুলে নিয়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপালুম। কোনোটার সঙ্গে কোনোটা খাপ খায় না। এমনি করে নিজের দেওয়া গিঁট নিজে খুলতেই আমার সময় যায়। কান্না পায়। কেমন করে আমি বারোটার আগে এয়ার ইণ্ডিয়ার আপিসে পৌছব। আরো আগে ভারতীয় দূতাবাসে!

মাদাম কোরা এলেন গ্রামোফোন রেকর্ড দিতে। "আহা! আমাকে বললেন না কেন! আমি এসে সাজিয়ে দিতুম!" শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি গছিয়ে দিলেন আমার ঘাড়ে সোফিয়াদির জন্যে উপহার। ঘরে ফিরে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লুম। তখনো সব এলোমেলো অগোছালো পড়ে রয়েছে মেজের উপর। খাটের উপর, সেটির উপর। পুরুষের সাধ্য নয়, নারীরও অসাধ্য। একমাত্র ভগবান ভরসা। প্রাণপণে জপতে লাগলুম,

হে প্রভু, রক্ষা কর। হে প্রভু, রক্ষা কর। সেই যে শুরু হলো জপ এক ঘণ্টার উপর চলল মুহুর্মুহু অবিরাম।

ভগবান বুদ্ধি দিলেন, আর একটা স্যুটকেস কিনতে হবে। মনে পড়ল কাছেই একটা দোকানে স্যুটকেস চোখে পড়েছিল। গিয়ে দেখি বেশীর ভাগই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। স্যুটকেস যদি বা পছন্দ হলো চাবী খুঁজে পাওয়া গেল না। চাবী! আমার প্রশ্ন শুনে দোকানদার তো অবাক! চাবী! চাবী আবার কী! চাবীর কী দরকার! লোকটাকে বোঝাতে পারিনে যে চাবী না দিলে ভিতরের জিনিস চুরি যেতে পারে। সে আমার যুক্তির মর্মভেদ করতে পারল না। বোধ হয় ভাবল কী সন্দেহশীল এই বিদেশীগুলো! চাবী না দিলে চুরি যাবে! জাপানে!

আরো কয়েকটা স্যুটকেস নাড়াচাড়া করলুম। একই ব্যাপার। চাবী নেই। বৃথা সময়ক্ষেপ। কাছে কোথাও অন্য দোকান ছিল না। কিনতে হলে অনেক দূরে যেতে হয়। ওদিকে আমার জন্যে দূতাবাসে এসে বসে থাকবেন আসাহি পত্রিকার প্রতিনিধি। সময়মতো না গেলে এয়ার ইণ্ডিয়ার আপিসও দরজা বন্ধ করবে। এই সঙ্কটে যদি ভগবানের নাম নিয়ে থাকি তবে সেটা বুদ্ধি খাটিয়ে নয়। আপনা থেকেই অন্তর বলে উঠল, "প্রভু, রক্ষা কর। প্রভু, রক্ষা কর।" মুহূর্তে মুহূর্তে ভগবানকে ডাকে কারা? যাদের প্রাণ বিপন্ন। এক্ষেত্রে আমার মান বিপন্ন। যাত্রা বিপন্ন। তা ছাড়া আর একজনকে দূতাবাসে আমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ জানিয়েছিলুম। তাঁর উত্তর পাইনি। তিনি যদি না আসেন তা হলে খেদ থেকে যাবে, যদি আসেন ও আমাকে না দেখে চলে যান তা হলে পরিতাপের সীমা থাকবে না।

ফিরে যাচ্ছিলুম। কী ভেবে দোকানে ঢুকলুম আবার। জার্মানীর মতো জাপানেও রুকসাক পাওয়া যায়। তাতে এন্তার জিনিস আঁটে। পিঠে বাঁধলে কেমন হয়? দোকানদার দুটি একটি ইংরেজী কথা জানত। রহস্য করে বলল, "কী! হিমালয়ে উঠবেন নাকি!" হিমালয়ে না উঠি, বিমানে করে বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় তো উঠব।

রুকসাক আমার সমস্যার সমাধান করল। কিন্তু তার ওজন হলো এত বেশী যে তাকে পিঠে করে বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। তাকে এয়ার

ইণ্ডিয়ার কাছে ধরে দিতেই হবে। তারা যদি সাধু হয় তা হলে কোনো জিনিস চুরি যাবে না, যদি সতর্ক হয় কোনো জিনিস খোয়া যাবে না। রুকসাক আমার নিজের মানবচরিত্রে বিশ্বাসের পরীক্ষা নিতে এসেছে। বিশ্বাস থাকে তো এয়ার ইণ্ডিয়ার হাতে গছিয়ে দিয়ে আমি খালাস। না থাকে তো ফেরিওয়ালার মতো পিঠে গাঁটরি বেঁধে আমাকে বিমানে ওঠা-নামা করতে হবে হানেদায় হংকং-এ ব্যাঙ্ককে দমদমে।

রুকসাকে আর সব আঁটল, কিন্তু বইকেতাব বাইরেই পড়ে রইল গন্ধমাদনের মতো। কী করে যে পার্সেলের মতো বাঁধি! না আছে মোটা কাগজ বা কাপড়, না আছে দড়িদড়া। বর্ষাতী ছিল। তাই দিয়ে মুড়ে নিয়ে গেলুম। দেখি যদি দূতাবাসে একটা হিল্লে হয়।

কানাগাওয়া ওকামুরা তেন্‌জিন্

॥ চব্বিশ ॥

চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে সাক্ষাতে বিদায় নেওয়া হলো না, তিনি অনেকক্ষণ চ্যান্সেলারিতে চলে গেছেন। লক্ষ্মী দেবীর কাছে বিদায় চাইলুম। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি আরো দু'চার দিন থাকি। কিন্তু আমি তো জানতুম প্রধান মন্ত্রীর জাপান পরিদর্শন নিয়ে তিনি ও তাঁর স্বামী কী পরিমাণ অন্যমনস্ক। ইতিমধ্যেই ইন্দিরা গান্ধীর উপনীত হওয়ার কথা। কলকাতায় হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী হয়ে তিনি তাঁর পিতার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ঝা দম্পতি না থাকলে আমার জাপান প্রবাসের শেষ ক'টি দিন ঘরে থাকার মতো স্বচ্ছন্দ লাগত না। অনেকটা নিঃসঙ্গ ও কতকটা নিরানন্দ মনে হতো। তাঁদের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

চ্যান্সেলারিতে গিয়ে দেখি, এ কে! আইকো সাইতো। চিত্রশিল্পী। আমাকে বিদায় দিতে এসেছেন। অভিভূত হলুম এই বোনটিকে দেখে। লজ্জিত হলুম এক ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছি। তিনি যে আসবেনই এমন কোনো কথা শুনিনি। আর শুনলেই বা আমার সাধ্য কী যে যথাকালে লটবহর নিয়ে বেরোই! আসাহি পত্রিকার প্রতিনিধিকেও এক ঘণ্টা আটকে রেখেছি। সাংবাদিকদের কত কাজ! তাঁর হাতে আমার লেখাটা পৌঁছে দিয়ে আমি দায়মুক্ত হলুম। জাপানী অনুবাদ তাঁরাই করাবেন। ছাপা হবে আমার প্রস্থানের পরে আর জবাহরলালের প্রবেশের পূর্বে। ওকাকুরার প্রস্তাবমতো নেহরু প্রসঙ্গও প্রক্ষেপ করেছি।

ওদিকে এয়ার ইণ্ডিয়া আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না। ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে মালপত্র নিয়ে। দূতাবাসে যাঁর কাছে সাহায্য পাব ভেবেছিলুম তিনি সেখানকার রেজিস্ট্রার সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় সেদিন আসতে পারেননি। তাঁরও ইনফ্লুয়েঞ্জা। বইকেতাব কি তবে অগোছালো অবস্থায় সচ্চিদানন্দ ধর মহাশয়ের জন্যে দূতাবাসেই ফেলে যাব? এদিকে এই বোনটিকে আসতে বলে তার পর বসিয়ে রেখে তার পর কাছে পেয়ে কেমন করে দু' মিনিটের মধ্যে বিদায় দিই? অভিপ্রায় ছিল আধুনিক চিত্রকলার কোনো এক প্রদর্শনীতে বা গ্যালারিতে গিয়ে তাঁর সহায়তায় আমার শিক্ষার ষোলো কলার একটি কলা পূর্ণ করব। কুমারী সাইতো বললেন তিনি দূতাবাসেই বসে

থাকবেন যতক্ষণ না আমি ফিরি। সঙ্গে আছেন তাঁর পিতা। ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরে দেখি তিনি ঠায় বসে আছেন। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি।

সেদিন আইকো সাইতো আমাকে তাঁর নিজের আঁকা ছবি দেখালেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ছবিগুলির স্লাইড আর সেগুলিকে বড় করে প্রতিফলিত করার যন্ত্র। এক এক করে প্রতিফলিত হলো দূতাবাসের প্রতীক্ষাকক্ষের প্রাচীরে। সমস্ত ছবি abstract পদ্ধতির। কতটুকু তার বুঝলুম! শুধু এইটুকু বুঝলুম যে আইকোর সাধনা অকৃত্রিম ও তিনি বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। মুখচোরা মধুরপ্রকৃতি এই কন্যাটির সুনাম সুপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু তাঁকে আমি পাশ্চাত্য পোশাকে প্রত্যাশা করিনি। শিল্পীকে মানায় না। এর চেয়ে সুন্দর দেখতে তাঁর সেই কিমোনো পরা মূর্তি।

জাপানীর মেয়েকে বেলা আড়াইটে পর্যন্ত অভুক্ত রেখে বিদায় দিই ও নিই। তার পর সনৎবাবুর বাড়ী গিয়ে দেখি বাঙালীর মেয়ে অতিথির জন্যে অভুক্ত বসে আছেন। কী লজ্জা! যাত্রার উত্তেজনায় আমার না হয় ক্ষুধাবোধ রহিত, তা বলে অপরের খিদে পাবে না? খেতে বসে দেখলুম বাঙালী মতে রান্না। কত কাল পরে মাছের ঝোল আর ভাত। গোপন থাকল না যে আমিও ক্ষুধার্ত। সনৎবাবুও সঙ্গ রাখলেন। ফরেন সার্ভিসে নাম দিয়েছেন, আমাদের যেমন এক জেলা থেকে আরেক জেলায় বদলি এঁদের তেমনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে বদলি। ছোট ছোট মেয়ে দুটিকে জাপানী বিদ্যালয়ে দিয়েছেন। নিজেরাও জাপানী শিখেছেন।

চাটুজ্যের একে অসুখ, তার উপর বাসাবদলের ঝঞ্ঝাট। তা সত্ত্বেও আমার উপদ্রব সহ্য করলেন। বর্ষাতী খুলে বইকেতাবের রাশ ঢেলে দিয়ে ভারমুক্ত হলুম। ইতিমধ্যে ব্যাগ সুটকেস সঁপে দিয়ে এসেছি এয়ার ইণ্ডিয়ার কর্মচারীদের হাতে। রুকসাকটা আমাকে পরীক্ষা করে দেখল আমি সন্দিগ্ধমনা নই, সরলবিশ্বাসী। আশ্চর্য! বিশ্বাসের জয় হলো। জিনিস একটিও চুরি গেল না, খোয়া গেল না, যদিও চাবী দেওয়া হয়নি।

বিদায় নিতে যাব, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। তোকিয়োর পুরাতনতম বাঙালী অধিবাসী শিশিরকুমার মজুমদার। তিনি যখন শুনলেন যে আমি ওখানে উপস্থিত তখন আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। এই বিশিষ্ট বাঙালীর সঙ্গে দেখা করতে আমারও বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু

একটুও ফুরসৎ পাইনি। ভুলেও গেছলুম। অপ্রত্যাশিতভাবে আমার ইচ্ছাপূরণ হলো। মজুমদার মহাশয় মোটর ছুটিয়ে এসে পড়লেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। মাঝখানে কয়েক বছর দেশে ফিরে গিয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন, কিন্তু জাপান তাঁকে আবার আকর্ষণ করল। তোকিয়োতে তাঁর প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি। স্বাধীন ব্যবসায়।

ভদ্রলোকের সঙ্গে ভালো করে ছুটো কথা কইব তার উপায় ছিল না। চারটের সময় ইম্পিরিয়াল হোটেলে ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। মার্কিনের মেয়েকে তো এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বসিয়ে রাখা যায় না। অগত্যা মজুমদার মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় ভিক্ষা করতে হলো। কী তাঁর মনে দুঃখ! আমারও কি কম! বিদেশে বাঙালীকে পেলে বাঙালী আর কিছু চায় না। প্রাণ ভরে বাংলা বলতে চায়। আমারি দুর্ভাগ্য যে আমি বাঙালীদের জন্যে আমার কর্মসূচীতে যথেষ্ট ফাঁক রাখিনি। অথচ চাটুজ্যে ও ধর এই দুই বাঙালী আমার জন্যে যা করেছেন আর কেউ তা করতেন না। আমি কৃতজ্ঞ।

ফ্রান্সেস তো আমার আশা ছেড়ে দিয়ে হোটেল থেকে নিষ্ক্রমণের চিন্তা করছিলেন। আমিও প্রথমটা তাঁকে দেখতে না পেয়ে ভাবলুম তিনি হয়তো চলে গেছেন। তাঁর সন্ধানে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি তিনি কোনখান থেকে বেরিয়ে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। বলা বাহুল্য সেটাও একপ্রকার কণ্ঠসঙ্গীত। একদা তিনি অপেরায় গেয়েছেন, এখনো মাঝে মাঝে রিসাইটাল দিয়ে বেড়ান। সঙ্গীতের অধ্যাপিকা।

"আহা! আমাকে ডাকলে না কেন! আমি গিয়ে গুছিয়ে দিতুম।" বললেন ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড যখন শুনলেন যে আমি প্রাণপণে ভগবানকে ডেকেছি।

বাস্তবিক, সমাধানটা যে এত সরল তা আমার মাথায় আসেনি। আমি ধরে নিয়েছিলুম যে ইনাজু থাকবেন আমার সঙ্গে, দরকার হলে তাঁকেই ডাকব সহায় হতে। হঠাৎ তিনি যে তাঁর পার্সের পিছনে ছুটবেন তা তো গণনায় আনিনি। তা ছাড়া ঐ ক'টা জিনিস নিয়ে অমন রাজসূয় যজ্ঞ করা কেন? যেখানে যত হিতৈষী ও হিতৈষিণী আছেন সবাইকে আহ্বান করা?

ফ্রান্সেস আমার জন্য একটি ফুরুশিকি এনেছিলেন। যা দিয়ে বইপত্র জড়িয়ে

জাপানী

চিত্রকর হারুনোবু

অষ্টাদশ শতাব্দী

বাঁধা যায়। শুধু বইপত্র নয় যত রকম টুকিটাকি জিনিস। জাপানীদের হাতে এ রকম একটি রঙীন বস্তানি দেখে আমার শখ হয়েছিল, কিন্তু বলিনি যে আমার চাই।

তার পর চললুম আমরা ইম্পিরিয়াল হোটেল থেকে তোকিয়োর শহরতলীতে। কোতো বাদন শুনতে। তাঁকে একদিন বলেছিলুম যে আমার শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে যাবে যদি জাপানে এসে কোতো বাদন না শুনি। তাঁর এক বন্ধু ছোটখাটো একটি ওস্তাদ। ওস্তাদের বাড়ী গিয়ে তানালাপ শুনতে হয়। সেইজন্যে তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন। বড় বড় ওস্তাদের দর্শন মেলা অত সহজ নয়। দর্শনী লাগে।

জাপানের রেলগাড়ী কাঁটায় কাঁটায় আসে ও ছাড়ে, কিন্তু ডাকঘর গোরুর গাড়ীর অধম। ফ্রান্সেস তাই চিঠি লেখেননি, টেলিগ্রাম করেছিলেন। আর শিগেরু কুবো তার উত্তর দিয়েছিলেন টেলিফোনে। আমাকে তিনি কোতো বাজিয়ে শোনাবেন সানন্দে। আটাশে সেপ্টেম্বর শনিবার রাত এগারোটায় আমার প্লেন। রানী অফ আগ্রা। তার ঘণ্টা দুই আগে লিমুসিন ছাড়বে ইম্পিরিয়াল হোটেল থেকে। তার ঘণ্টা দুই আগে আমার ফিরে আসা চাই ডিনার খেতে ও বিদায় দিতে আসা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে। আড়াই ঘণ্টা ফাঁক ছিল। সেটা ভরানো গেল শহরতলীতে যাতায়াতে আর সঙ্গীত শ্রবণে।

কিমোনো পরিহিত নম্র বিনয়ী যুবা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁর একখানিমাত্র কক্ষে। বাইরে ছোট একটি জাপানী পদ্ধতির বাগান। শিল্পীর পক্ষে আদর্শ পরিবেশ। একাই থাকেন, একাই বাজান, কেউ গেলে শেখান। ঐকান্তিক সাধনা ও নিষ্ঠা। ফ্রান্সেস থেকে থেকে গান গেয়ে উঠলেন তাঁর সুরেলা গলায়। আর কুবো বাজিয়ে চললেন গতের পর গৎ। প্রত্যেক বারেই নতুন করে সুর বাঁধতে হয় আর তার পদ্ধতিও বিচিত্র। তেরোটি তারের নিচে ঠেকা দেবার জন্যে অনেকগুলো ঠেকনা। প্রত্যেক বারই তাদের স্থানান্তর করতে হয়। এক একটি গতের জন্যে এক এক রকম আয়োজন। আঙুল দিয়ে বাজায়। কোতোর অন্য নাম সো। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। কান নেই।

চা খেয়ে আর উপহার পেয়ে ঋণী হয়েই ফিরলুম। ধন্যবাদ দিলে কি ঋণের

বোঝা হালকা হয় ? কেবল কুবো-সান নন, বহু জনের কাছে বহু ভাবে আমি ঋণী। সবাইকে বলি, "সায়োনারা।" তার আক্ষরিক অর্থ, যদি বিদায় নিতেই হয় তবে বিদায় নেওয়া যাক। বাচ্যার্থ, আবার দেখা হবে। কবে, কোথায়, কোন জন্মে জানিনে। হবে, এইমাত্র জানি। আমি বিশ্বাস করি যে কোনো দেখাই শেষ দেখা নয়।

ইচ্ছাপূরণ একে একে হয়েছিল, বাকী ছিল আরো কয়েকটি উড ব্লক প্রিণ্ট কেনা। কিন্তু তার জন্যে যদি দোকানে দোকানে ঘুরতে হয় দেরি হয়ে যাবে। হোটেলের ভোজনাগারে ডিনার পরিবেশন শুরু হয়ে গেছে। ফ্রান্সেস আর আমি আসন নিলুম। লক্ষ করলুম পরিবেশিকাদের পরনে কিমোনো। অথচ পাশ্চাত্য মতে আহার। ইতিমধ্যে একবার উঠে গিয়ে দেখি ওকাকুরা-সান এসে বসে আছেন। বললুম, আমার খাওয়া সারা হয়নি। ততক্ষণ আপনি কি অনুগ্রহ করে আমার জন্যে খান কয়েক উড ব্লক প্রিণ্ট কিনে আনতে পারবেন ? তা হলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

আহারের পর লবিতে এসে দেখি ইতিমধ্যে আরো কয়েক জন এসেছেন। মিস এতো। অধ্যাপক ইনাজু ও তাঁর ছাত্রছাত্রীর দল। উপহার। ফুলের তোড়া। এঁদের এই ভালোবাসা অকৃত্রিম। এ শুধু মৌখিক সৌজন্য নয়।

লবিতে এঁদের নিয়ে ঘোরাফেরা করছি, এমন সময় চোখে পড়ল এক কোণে বসে আছেন এক শাড়ী-পরা ভদ্রমহিলা, তাঁর সঙ্গে এক বিলিতী পোশাক-পরা ভদ্রলোক। ভারতীয় এখানে কোনখান থেকে এলেন ? এঁরা কারা ? চেনা চেনা ঠেকছে যে ! দেখি, দেখি ! ওমা !

তার পর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য, তবু সত্য। ওই তো আমার কমলাবোন আর ওই যে তাঁর ওসাকাপ্রবাসী ভাই ! আশ্চর্য ! কমলাবোন তো জানতুম চোদ্দ দিন আগে রওনা হয়ে গেছেন। না, তাঁর যাওয়া হয়নি। হঠাৎ ওসাকায় অসুখ করে। অসুখ সারার পর দুর্বলতা রয়ে যায়। একা ভ্রমণ করতে সাহস পান না। অপেক্ষা করেন আরো কয়েক দিন যাতে আমার সঙ্গে এক বিমানে দেশে ফিরতে পারেন। এয়ার ইণ্ডিয়ায় খোঁজ নিয়ে জানতে পান যে আমি আটাশে তারিখের প্লেন ধরছি। তাঁর ভাই তাঁকে দিতে এসেছেন তোকিয়ো পর্যন্ত এগিয়ে। চেহারায় অসুখ থেকে সদ্য ওঠার ছাপ।

আমি ভার নিলুম কমলাবোনের। আর তিনি ভার নিলেন আমার। ফ্রান্সেস বললেন তাঁকে আমার ক্যামেরার উপর লক্ষ রাখতে, যাতে পথে কোথাও হারিয়ে না বসি। অদ্ভুত ইনটুইশন নারীজাতির। পরের দিন ক্যামেরাটা সত্যি ফেলে আসছিলুম ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে। চায়ের টেবিলে। কমলাবোন মনে করিয়ে দিলেন। নইলে যখন মনে পড়ত তখন আমি আকাশে। একটা ক্যামেরা তো চাঁদপুরের জাহাজে হারিয়েছি। সেই থেকে সতেরো বছর অনভ্যাস।

উকিয়োএ পাওয়া যাবে হাতের কাছে, এই মনে করে ওকাকুরাকে পাঠানো। কিন্তু কাছের দোকানগুলো বন্ধ দেখে তাঁকে ছুটতে হলো কান্দা অঞ্চলে। সেখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন তিনি সুন্দর কয়েকটি পট। না, আমার আর কোনো খেদ নেই। তাই বা কী করে বলি? নিক্কো দেখা হলো না যে। "না হেরিয়া নিক্কো কহিয়ো না কেক্কো।" কাউকেই সুন্দর বলা চলবে না নিক্কো যতক্ষণ না দেখেছি। সেটা পরের বারের জন্যে তোলা রইল। হয়তো আসতে হবে আবার আমাকে নিক্কো দেখে কেক্কো বলতে।

ন'টা বাজল। বন্ধুদের হাতে হাত রেখে বিদায় নিলুম। সায়োনারা! সায়োনারা! লবি থেকে গেট পর্যন্ত একসঙ্গে পায়ে হেঁটে গেলুম। আরেক বার বিদায়। সায়োনারা! সায়োনারা! মোটরে উঠে বসলুম। হানেদা বিমান বন্দরের জন্যে আরো কয়েকজন সহযাত্রী ও যাত্রিণী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাউকে বিদায় দিতে এত লোক আসেনি। বোধ হয় তাঁদের কারো এমন মন কেমন করেনি। জাপানী বন্ধুদের আমি মাঝে মাঝে বলতুম, ফরেনার কথাটা আমার পছন্দ নয়। আমরা কেউ কারো কাছে ফরেন নই। দেশকেও ফরেন লাগে না। একই পৃথিবী, একই আকাশ। আর মানুষের সঙ্গে মানুষের নাড়ীর টান।

মোটর ছেড়ে দিল। আমার চোখে তো এলোই, বন্ধুদের কারো কারো চোখেও একটা করুণ ভাব এলো। হাত নেড়ে, রুমাল নেড়ে বলাবলি করা গেল, সায়োনারা! সায়োনারা! গাড়ী এবার মোড় নিল। অদৃশ্য হয়ে গেল বন্ধুজনের জনতা, অক্ষয় হয়ে রইল তাদের স্মৃতি। ভারাক্রান্ত হয়ে রইল হৃদয়। যে দেশ ছেড়ে যাচ্ছি সেই দেশই তখনকার মতো আমার

দেশ। একজনকে বলেছিলুম, জাপান যেন আমার হোম। মাত্র এক মাসের পরিচয়ে এতখানি আত্মীয়তা আমাকেই বিস্মিত করেছিল।

গত কয়েক দিন আবহাওয়ায় টাইফুনের আভাস ছিল। শোনা যাচ্ছিল টাইফুন আবার আসছে। এমন কথাও মনে হয়েছিল যে আমার প্লেন নির্দিষ্ট তারিখে ছাড়বে না। একখানি প্লেন নাকি এক দিন দেরিতে পৌঁছেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সব মেঘ কেটে গেল, দিনটির চেয়ে রাতটি হলো আরো বেশী পরিষ্কার। আমার যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক হলো। টাইফুনের মাসে টাইফুন পেলুম না, ভূমিকম্পের দেশে ভূমিকম্প পেলুম না, পেলুম কিছু বৃষ্টিবাদল, তাও এমন কিছু নয়। মোটা একটা বর্ষাতী বয়ে বেড়ানোর মতো নয় নিশ্চয়।

হানেদা বিমান বন্দরে সাথীরা কে কোথায় সরে পড়লেন। দেখি আমরা দুটি মানুষ একা। কমলাবোন আর আমি। এশিয়ার সবচেয়ে বড় এয়ার-পোর্ট। লোকে লোকারণ্য। দোকানপসারের কমতি নেই। শাস্ত্রে বলেছে গৃহীত এব কেশেষু ধর্মমাচরেৎ। মেয়েদের বেলা বলা যেতে পারে, বিমানে ওঠার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শখের জিনিস কিনবে। কমলাবোন কি মেয়েলি শাস্তর লঙ্ঘন করতে পারেন!

দশ পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর ডাক পড়ছিল, "অমুক এয়ার লাইনের যাত্রীগণ! অমুক এয়ার লাইনের যাত্রীগণ! এইবার আপনারা তৈরি হয়ে নিন। আপনাদের প্লেন অপেক্ষা করছে।" আর অমনি প্রতীক্ষাগার থেকে এক দল যাত্রী উঠে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁদের স্থান শূন্য হচ্ছিল। নতুন লোক তেমন বেশী আসছিলেন না। রাত বাড়ছিল। ক্ষীণ হয়ে আসছিল জনতা। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলুম। ভাবছিলুম বড় দেরি হচ্ছে। এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেন কি আজ ছাড়বে না? ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ লক্ষ করলুম আমাদের দলের যাত্রীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। কমলাবোন আমাকে খুঁজছেন। ডাক পড়েছে। তখন আমরা দল বেঁধে চললুম।

অভ্যন্তরে বিশ্রাম করছিলেন রানী অফ আগ্রা। কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হয় তেমনি প্রবেশ করলুম রানীর নিভৃত দরবারে। এয়ার হস্টেসঁরা আদর করে নিয়ে বসিয়ে দিলেন যার যার নির্দিষ্ট আসনে। বিমান উটপাখীর মতো কিছুক্ষণ দৌড়ল, তার পর দাঁড়াল, তার পর

গরুড়ের মতো আকাশে উঠল, উঠতে উঠতে উঠতে উঠতে এক সময় বোঝা গেল যে উড়ছে। বিমান বন্দরের লাল নীল বাতিগুলো ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো, তার পর কোথায় মিলিয়ে গেল। তোকিয়ো শহর তার আলোকমালা নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গ রেখেছিল, কিন্তু আর পারল না পাল্লা দিতে। পেছিয়ে পড়ল। অত যে আলোর বাহার তার চিহ্ন রইল না। তার পর সমুদ্র দেখা দিল। তার পর সমুদ্রই দৃষ্টি জুড়ল। জাপান এই একটু আগেও জাজ্বল্যমান সত্য ছিল। সে এখন স্মৃতি।

কমলাবোনকে একজন এসে খবর দিলেন অন্য সারির পিছনের দিকে পাশাপাশি তিনটে আসন খালি। ইচ্ছা করলে তিনি মাঝখানকার হাতগুলো নামিয়ে খাটের মতো করে গা মেলে দিয়ে আরাম করে শুতে পারেন। তিনি বেঁচে গেলেন। তখন আমিও ফাঁকতালে পাশাপাশি একজোড়া আসনের অধিকারী হয়ে মাঝখানের হাতটা নামিয়ে দিয়ে পা মুড়ে শুলুম। সেই যে ভোর পাঁচটায় হাকোনে হোটেলে বিছানা ছেড়েছি তার পর থেকে রাত এগারোটা অবধি কেবল চরকির মতো ঘুরেছি। দেহময় ক্লান্তি। এখন একটু ঘুমতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায় ঘুম! ঘুম পাচ্ছে, অথচ ঘুম আসছে না। উত্তেজনায় নয়, আশঙ্কায় নয়, সেসব নেই। বরং আছে একটা উদ্দাম আনন্দ। মানবজাতির কত কালের সাধ পাখীর মতো আসমানে উড়বে। এই তো আমি পাখীর মতো উড়ছি। এ কি কম সৌভাগ্য! নিদ্রায় অচেতন হলে তো পাখীর মতো উড়ে চলার স্বাদ পাওয়া যায় না, তা দিয়ে চেতনা ভরে নেওয়া যায় না। তার পর ধরিত্রীর কোলে স্পেস কোথায় যে স্পেসের পরিপূর্ণ স্বাদ পাব! এক যদি সাহারা মরুভূমিতে উটের পিঠে চাপি বা প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজের বুকে ভাসি। তার চেয়েও অসীম অগাধ স্পেস মহাব্যোমে। যদি পাখীর মতো ডানা মেলি, যদি গরুড়ের মতো ঊর্ধ্বে উঠি তা হলেই পাই অনন্ত অতল স্পেসের স্বাদ। চেতনা ভরে নিই।

ঘুম পাচ্ছে, অথচ ঘুম আসছে না। রাজ্যের কথা মনে পড়ছে। যে রাজ্য ছেড়ে চলেছি সেই রাজ্যের কথা। জাপানকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি। এই এক মাসে কত দেখলুম, কত শিখলুম। কত জনের সঙ্গে পরিচয় হলো। কারো কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। কে কে আমাকে ছাড়তে চায়নি।

কাকে কাকে আমি ছাড়তে চাইনি। জাপানী, ভারতীয়, মার্কিন, রাশিয়ান, ফরাসী। স্বপ্নের মতো লাগছিল সত্যঘটনকেও। তাই তো আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিলুম। যেন স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর স্বপ্নটাকে জোড়া দিয়ে টেনে দীর্ঘায়িত করছিলুম। করতে করতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। চোখ মেলে দেখি আলো হয়ে গেছে চার দিক। দেয়াল-জোড়া কাঁচের শার্সি দিয়ে দিনের আলো ভিতরে এসে ছড়িয়ে গেছে। যাত্রী-যাত্রিণীদের কতক তখনো ঘুমিয়ে।

আকাশ আর সমুদ্র ছাড়া দেখবার আর কী আছে? আছে মেঘ। মেঘনাদ নাকি মেঘের আড়াল থেকে লড়াই করত। কিন্তু সে থাকত মেঘের কাছাকাছি। আমরা মেঘের চেয়ে অনেক উঁচুতে। অত উঁচু থেকে মেঘকে দেখায় নীল জলের উপর শাদা ফেনার মতো, শাদা ধোঁয়ার মতো, শাদা ভেলার মতো। নীল? না, ঠিক নীল নয়। গাঢ় সবুজ। ঘন শ্যাম। দিগন্তেও এক একটি মেঘ দেখছি। মনে হয় বিমানের সমান উচ্চ। রঙীন মেঘও চোখে পড়ে।

কমলাবোন অন্য ধারে ছিলেন। বললেন, "দেখুন, দেখুন! রামধনু।" এত বিশাল রামধনু জীবনে দেখিনি। দুই প্রান্ত সমুদ্রে নেমে গেছে। মাঝখানে কে জানে কত শত ক্রোশ ব্যবধান। শীর্ষ বোধ হয় বিমানের সমোচ্চ। যেমন বিশাল তেমনি উজ্জ্বল। সব ক'টি রঙ্ ঝকঝক করছে। চোখ ঝলসে যায়। একটু পরে আবিষ্কার করি ওটা যুগল রামধনু। সেই সাতটি রঙ্ পিঠোপিঠি উলটো করে সাজানো। সাত নরী নয়, চোদ্দ নরী হার। হারদুটির মাঝখানে কে জানে কত যোজন ব্যবধান। রামধনু ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির অতীত হলো। তার পর কমলাবোন আবার ডাকলেন। ও কী! রামধনু না? দেখলুম সে এক আজব ব্যাপার। যে মেঘের উপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি সেই মেঘের উপর রামধনুর সাত রঙ্। মেঘের পর মেঘ। সাতরঙার পর সাতরঙা। মেঘের বিরতি। সাতরঙার বিরতি। মেঘের পুনরাগতি। সাতরঙার পুনরাগতি। অনেকক্ষণ পরে হুঁশ হলো যে এটা আমাদের বিমানেরই ছায়া সৃষ্ট বর্ণালী।

তার পর কমলাবোন বললেন, "ওটা কী জলের উপর ভাসছে? ভাসতে ভাসতে আমাদের সঙ্গে চলেছে?" প্রথমে মনে হলো কী একটা জলজন্তু। কিন্তু

এমন কোন জলজন্তু আছে যে প্লেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাইলের পর মাইল সমান দূরত্ব রক্ষা করতে পারে ? না, ওটা জলজন্তু নয়। আমাদের বিমানেরই ছায়া। তাই ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। তার পর দেখা গেল ক্ষুদে ক্ষুদে নৌকা। খেলনার মতো জাহাজ। দেখতে দেখতে আমরা হংকং বিমান বন্দরে পৌছে গেলুম। এবার আড়াই ঘণ্টা বিরাম। বাইরে যেতে পারি। ছাড়পত্র জমা দিলুম। এয়ার ইণ্ডিয়ার লোক আমাদের নিয়ে গেল কাওলুন শহর দেখাতে, হোটেলে প্রাতরাশ খাওয়াতে। প্রদর্শিকা চৈনিক তরুণী বললেন, "আজকেই প্রথম সূর্যের মুখ দেখা গেল। এই ক'দিন চলছিল টাইফুনের উৎপাত।"

হংকং দিল চীনের একটুখানি আভাস। ক্রমে সেটুকু ক্ষীণ হয়ে এলো। আবার উড়ছি সাগরের উপর দিয়ে। উড়তে উড়তে এক সময় লক্ষ করছি পর্বতমালা, উপত্যকা, নদী। মানুষের বসতি অল্পই। কেমন এক ভয়াল সৌন্দর্য এই দেশের ! যেন রূপকথার মায়ারাজ্য। অরুণ বরুণ কিরণমালার কাহিনীতে শোনা। এরই নাম ভিয়েৎনাম।

এর পর এলো বাংলার মতো সমতল সবুজ ভূমি। বড় বড় ক্যানাল চলে গেছে বহু দূরে সরল রেখা টেনে। জমি যেন ছক-কাটা শতরঞ্চ। ছকগুলো সমচতুষ্কোণ। যেন কেউ পরিকল্পনাপূর্বক দিগন্তবিস্তারী উদ্যান রচনা করেছে। ধান্যের উদ্যান। শ্যামদেশ শ্যাম দেশই বটে। ব্যাঙ্কক বিমানবন্দরে ঘণ্টা-খানেকের জন্যে থামা। তার পর শহরের উপর দিয়ে ওড়া। ছোট ছোট খাল গেছে রাস্তার মতো নকশা কেটে। খালের পাড়ে বাড়ী। অগণিত প্যাগোডা।

সমুদ্রের উপর দিয়ে আবার উড়তে উড়তে চেয়ে দেখি অরণ্য। নদীমালা। শস্যক্ষেত্র। জনপদ। সহযাত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ বললেন, রেঙ্গুন এইমাত্র ছাড়িয়ে আসা গেল। আমার লক্ষ ছিল না। দৃষ্টি নিবদ্ধ বঙ্গোপসাগরে। বঙ্গকে মনে পড়ছে অনুষঙ্গ থেকে। দেশ আমাকে নিবিড় করে টানছে। বড় আশা ছিল পূর্ববঙ্গের উপর দিয়ে উড়ব। দশ বছর পরে অবলোকন করব তার রূপ। কিন্তু বিমান সুন্দরবনের পশ্চিম ঘেঁষে ভারত-প্রবেশ করল। স্তব্ধ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করলুম সমুদ্র কেমন করে জলময় মৃত্তিকা হয়ে যায়, তার থেকে কেমন করে কাদামাটি পলিমাটি জেগে ওঠে, তার উপর

কেমন করে ঝোপঝাড় গজায়, ঝোপঝাড় কেমন করে গাছপালা হয়, গাছপালা কেমন করে গহন বন, গহন বনে কেমন নদীনালার আঁকিবুঁকি। ধীরে ধীরে আসে বিরল বসতি, ধানক্ষেত, রাস্তা। বিমান ততক্ষণে নিচু হয়ে আস্তে আস্তে উড়ছে।

আর আমি ততক্ষণে চঞ্চল থেকে চঞ্চলতর। এই প্রথম গৃহকাতর বোধ করছি। মিলন যতক্ষণ সুদূর ছিল মিলনের কথা চেতনায় আনিনি। যেই আসন্ন হলো অমনি চেতনা ছাইল। বিমান একটু একটু করে নামছে। দমদম দেখা যাচ্ছে। ঐ তো বন্দর। ওই যে কারা সব অপেক্ষা করছে। বিমান যেই ভূমিষ্ঠ হলো কমলাবোনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অবতরণ করলুম। তার পর তীরের মতো সোজা চললুম মাঠ চিরে এক লক্ষ্যে। কিন্তু যে মেয়েটিকে আমার ছোট মেয়ে মনে করে একদৃষ্টে ছুটেছিলুম সে তৃপ্তি নয়। বাঁ দিকে তাকাতেই দেখি তৃপ্তি, আর তার মা, আর দুর্গাদাসবাবু।

আমার ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা। কলকাতার ঘড়িতে বিকেল সাড়ে তিনটে। মেয়ের মা বললেন, "এসেছ?" আর মেয়ে বলল, "বাবা, আমার জন্যে কী এনেছ?"

২২শে জুলাই ১৯৫৮ সমাপ্ত

রামাগাতা কাওয়ারা নিংগিয়ো